

বিশ্ব খ্যাতি আফ্রিকান ঔপন্যাসিক

# উইলবার স্মিথ এ টাইম টু ডাই

অনুবাদ : মখদুম আহমেদ

এ টাইম টু ডাই

উইলবার স্মিথ  
এ টাইম টু ডাই  
অনুবাদ : মখদুম আহমেদ



বিনুক প্রকাশনী



এ টাইম টু ডাই

মূল : উইলবার স্মিথ

অনুবাদ : মখদুম আহমেদ

দ্বিতীয় মুদ্রণ

ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি ২০১০

স্বত্ব : অনুবাদক

প্রকাশক

মোঃ নূরুল ইসলাম

ঝিনুক প্রকাশনী

৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সেল : ০১৭১২-৫৬৭৬১৫

প্রচ্ছদ : রবিন

কম্পোজ

কলি কম্পিউটার

৪৫ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

বি.এস প্রিন্টিং প্রেস

৫২/২ টয়েনবি রোড, ঢাকা।

মূল্য : ৩৫০.০০

---

A TIME TO DIE

by : wilbur smith, Translation by Makhdum Ahmed

First Published : February 2010, Second Published : February 2011,

by Md. Nurul Islam, Jhinuk Prokashoni, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 350.00

ISBN-984-70112-0041-5

উৎসর্গ

অনুবাদ ভক্ত পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে

দু'ঘন্টার বেশি হ'লো একটুও নড়েনি মেয়েটা, নড়ে ওঠার জন্য প্রতিটি আঙুল পেশী কাঁপছে। অবশ হয়ে গেছে পেছনটা। লুকোবার আগে তাকে পরামর্শ দেয়া হলেও মূত্রথলি খালি করেনি ক্লডিয়া-পুরুষ সঙ্গীদের মাঝখানে একা একটা মেয়ে ও, অস্বস্তি বোধ করা স্বাভাবিক, তাছাড়া আফ্রিকার গহীন জঙ্গল এখনো তাকে এতোটা সমস্ত্র করে রেখেছে যে একা হেঁটে গিয়ে নিরিবিলা একটা জায়গা খুজে বসার সাহস হয়নি। তখন লজ্জা ও ভয় পাওয়ায় নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার।

মাচাটা ঘাস দিয়ে মোড়া, চিকন ফাঁক আছে দেখার জন্য, সামনে ঘন ঝোপ সম্বন্ধে কেটে একটা সুড়ঙ্গ তৈরী করেছে বন্দুকবাহকেরা-সম্বন্ধে, কারণ প্রতি সেকেন্ডে তিন হাজার ফুট গতিতে ছুটন্ত বুলেটকে খুদে নগন্য একটা ডালও দিক ভ্রান্ত করে দিতে পারে। সুড়ঙ্গটা ঘাট গজ লম্বা-মাপা, যাতে রাইফেলে লাগানো টেলিস্কোপ সাইট অ্যাডজাস্ট করতে সুবিধা হয়। শরীরটা স্থির, শুধু চোখ ঘুরিয়ে বাবার দিকে তাকাল ক্লডিয়া, মাচার ওপর তার পাশে বসে আছেন। ইংরেজি হরফ ভি আকৃতির একটা ডালে লম্বা হয়ে রয়েছে তার রাইফেল, স্টক-এর ওপর শান্ত ভাবে পরে আছে ডান হাত। গালের পাশে এনে লক্ষ্য স্থির করার জন্য মাত্র কয়েক ইঞ্চি তুলতে হবে ওটা। শারীরিক কষ্টের মধ্যে থাকলেও, রাইফেলের ওপর চোখ পড়তে রাগ হলো ক্লডিয়ার। ওই চকচকে অস্ত্রটা প্রানীনিধনের অন্যায় নেশা মেটানোর কাজে ব্যবহার করেন তার বাবা। বাবার প্রতিটি কাজ তাকে আঘাত করে, নয়তো দ্বিধায় ফেলে দেয়। কোনোনা কোনো ভাবে তার অনুভূতিতে আঘাত করবেই। তার জীবনটাকে নিয়ন্ত্রন করেন তিনি; বাবাকে সেজন্য একাধারে ঘৃণা করে ক্লডিয়া, ভালোও বাসে। বাধন ছিড়ে সব সময় পালাতে চায় মেয়ে, বাবা তাকে প্রতিবার অনায়েসে কাছে টেনে আনেন, জড়িয়ে রাখেন অদৃশ্য বাঁধনে। আসল কারণটা জানে ক্লডিয়া, ছাব্বিশ বছর বয়সে এখন অবিবাহিত সে। গর্ব করার মত রূপ যৌবন তার, কত পুরুষই না তাকে পাবার জন্য পাগল। তাদের মধ্যে অন্তত দু'জনের বেলায় মনে হয়েছিল, সে বোধহয় সত্যি প্রেমে পড়েছে। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। স্বামী পেতে বা প্রেমে পড়তে ব্যর্থ হওয়ার পিছনে তার পাশে বসা এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক দায়ী। ছাব্বিশ বছরের জীবনে আজও ক্লডিয়া এমন একজন পুরুষের সাক্ষাত পেলো না যার সাথে তার বাবার তুলনা চলে।

কর্নেল রিকার্ডো মনটেরো। রমণী মোহন পুরুষ, ইঞ্জিনিয়ার, পণ্ডিত, ধনকুবের ব্যবসায়ী, অ্যাথলেট, শিকারী, খেলোয়াড়-আর কতো ভাবেই না তার পরিচয় দেয়া যায়, কিন্তু ক্লডিয়া তাকে যেভাবে চেনে তার বর্ণনা ওগুলোর কোনোটার মধ্যেই পাওয়া যাবে না। ওগুলোর কোনোটাতেই তার কোমলতা ও বলিষ্ঠতার কথা বলা হয়নি, যেজন্যে তাকে ওলোবাসে সে; নেই নিষ্ঠুরতা ও একগুয়েমির বর্ণনা, যেজন্যে তাকে ঘৃণা করে সে। তার এ-সব পরিচয়ের মধ্যে এ-কথা বলা হয়নি কিভাবে তিনি ক্লডিয়ার মাকে শুধু তাচ্ছিল্য ও অবহেলার সাহায্যে মাদকাসক্ত একটা জড়পিণ্ডে

পরিনত করেন। ক্লডিয়া জানে সতর্ক না হলে তার জীবনটাও ধ্বংস করে দেবেন বাবা। বিপদজনক একটা মানুষ, তার প্রতি আকর্ষণবোধ করার সেটাই অন্যতম কারণ।

ক্লডিয়ার ধারণা, বাবার মতো ভোগী পুরুষ দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। দৈত্যসুলভ আকৃতি হলেও, তার মুখমন্ডল দেবতাসুলভ। সোনালি ও খয়েরি মেশানো চোখ আর ঝকঝকে দাঁত তার বংশগত ল্যাটিন বৈশিষ্ট্যের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। ভরাট কণ্ঠস্বর, গলা ছেড়ে ঘন্টার পর ঘন্টার গান গাইতে পারেন তিনি। প্লেটে যত খাবারই দেয়া হোক, এক বসায় সমস্ত সাবার করতে পারে। মিলানে জন্ম হলেও, তার বেশির ভাগটাই আমেরিকান, কারণ ক্লডিয়ার দাদা-দাদি মুসোলিনি যুগে ইটালি থেকে আমেরিকায় চলে আসেন, রিকার্ডো মনটেরো তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু।

চোখ, দাঁত আর মসৃন চকচকে ত্বক বাবার কাছ থেকে পেয়েছে ক্লডিয়া। মিলটা শুধুই শারীরিক। বাবার সমস্ত ধ্যান-ধারণা আর পছন্দের বিরোধিতা করে সে, কারণ সেগুলো তার রুচি আর বিচারবুদ্ধিও সাথে মেলে না। বাবা যেরদিকে যান, ক্লডিয়া যায় ঠিক উল্টাপথে। বাবার ভেতর আইন ভাঙার প্রবণতা লক্ষ্য করে আইন পড়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। তিনি রিপাবলিকান, রাজনীতি সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকা সত্ত্বেও ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন করে ক্লডিয়া। শতো কোটি ডলার আর বিপুল সয়সম্পত্তির মালিক তিনি, তাই বাবার দেয়া বছরে দু'লাখ ডলার বেতনের চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সে, আইন পাস করে একটা সিভিল রাইটস এজেন্সিতে কাজ নেয়, বেতন বছর চল্লিশ হাজার ডলার। ভিয়েতনামে রিকার্ডো কাজ করেছেন, কাজেই আলাস্কায় আদিবাসী ইনুইটদের পাশে দাঁড়িয়ে বাপের অসন্তোষের কারণ হয়েছে ক্লডিয়া। এখন, আফ্রিকায় এসেছে সে, জানে, প্রাণী একমাত্র উদ্দেশ্য। সরাসরি সংঘর্ষ এখনো বাধেনি বটে, তবে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

বনের সুন্দর প্রানীগুলোকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে জেনেই তার সহযাত্রী হয়েছে ক্লডিয়া, নিজের এই দ্বৈত ভূমিকা অসুস্থ করে তোলে তাকে। একমাস আগে হলেও বাবার অনুরোধ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতো সে। অনুরোধটা পাবার কয়েকদিন আগে একটা গোপন ব্যাপার জনতে পারে তোর সাথে আসতে রাজি না হয়ে উপায় ছিলনা। বাবার সাথে একা হওয়ার এটাই বোধহয় শেষ সুযোগ, আর হয়তো সময় পাওয়া যাবে না। যে নোংরা কাজে জড়িত তারা, তার চেয়ে এই

চিন্তাটাই বেশি অস্থির করে তুলেছে ক্লডিয়াকে। ‘ওহ গড!’ ভাবলো সে। ‘বাবা না থাকলে আমার কি হবে? বাবাকে ছাড়া আমি বাঁচব কিভাবে?’

প্রশ্নটা জাগতেই মাথা ঘোরাল সে, দু'ঘন্টার মধ্যে এই প্রথম নড়লো, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল পিছন দিকে। ছোট্ট মাচায়, তার ঠিক পেছনে আরেকজন পুরুষ বসে আছে। আগেও বার কয়েক এই লোকের সঙ্গী হয়েছে বাবা, তবে চারদিন আগে হারারিতে প্লেন থেকে নেমে একবারই প্রথম দেখেছে ক্লডিয়া। জিম্বাবুই- এর

রাজধানী থেকে নিজের প্লেনে তুলে নেয় শিকারী, নিয়ে আসে মৌজাম্বিক সীমান্তের কাছাকাছি বিশাল ও দুর্গম হান্টিং কনসেশনে-এ।

লোকটার নাম শন কোর্টনি। মাত্র চার দিনের পরিচয়, এরই মধ্যে লোকটাকে এত অপছন্দ করে সে, যেনো তাকে সারাজীবন ধরে চেনে। বাবার কথা ভাবতে গিয়ে নিজের অজান্তেই সে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়েছে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ আরেকটা বিপদজনক মানুষ। নিষ্ঠুর, দয়ামাহীন, কঠিন পাত্র। দেখতে এতই সুন্দর যে প্রতিটি ইন্দ্রিয় তারস্বরে চিৎকার করে সতর্ক করে দিচ্ছে ক্লডিয়াকে।

ক্লডিয়া নড়ে ওঠায় ভুড়ু কুচকে বিরক্তি প্রকাশ করলো শন। ক্লডিয়ার নিতম্বে একটা আঙ্গুল ছোঁয়াল ও, সাবধান করে দিল আর যেনো না নড়ে। মৃদু স্পর্শ, তবু ওই এক আঙ্গুলের নির্দোষ বিরক্তিসূচক ছোঁয়াতেই পুরুষালি শক্তি ও কাঠিন্য অনুভব করলো ক্লডিয়া। শুধু তাই নয়, খানিকটা অপমানও বোধ করলো; স্পর্শটা যেনো তার যৌবনে অশ্রীল একটা খোঁচা দিয়েছে। ঘাড় সোজা আর শক্ত করে আবার সামনের দিকে তাকাল সে, ঘাঁসের তৈরি দেয়ালের গায়ে ছোট্ট ফুটো দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেললো, মনে মনে রাগে ফুসছে। কি স্পর্ধা, তাকে ছোঁয়া! নিতম্বের ওই জায়গায় হু হু জ্বালা করছে, যেনো পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সিগারেটের আগুন দিয়ে।

আজ বিকেলে ক্যাম্প থেকে রওনা হবার আগে শনের নির্দেশ ছিলো, তার দেয়া গন্ধহীন সাবান দিয়ে গোসল করতে হবে সবাইকে। ক্লডিয়াকে বিশেষভাবে সাবধান করে দেয় ও, সে যেনো কোনো রকম পারফিউম ব্যবহার না করে। শাওয়ার সেরে ক্যাম্পে, নিজের কটে ফিরে সদ্য ইস্তি করা খাকি শর্টস আর শার্ট দেখতে পায় ক্লডিয়া, ক্যাম্প সার্ভেন্ট রেখে গেছে। ‘দু’মাইল দূর থেকেও মানুষের গন্ধ পায় সিংহ’ তাকে বলেছে শন। সিংহের কথা বলতে পারবে না ক্লডিয়া, ওর নিজের নাকে এতক্ষণ কোনো গন্ধ ঢোকেনি, এতো কাছাকাছি বসলেও। এখন জাম্বিজি উপত্যকার সেদ্ধ হওয়া গরমে দু ঘন্টা কাটানোর পর ওর পিছনে বসা শিকারীর গায়ের গন্ধ অস্পষ্টভাবে পেলো সে। লোকটা বসেছে এবারে তার গা ঘেঁষে, প্রায় গা ছুঁয়ে, কিন্তু ছোঁয়নি। গন্ধটা তাজা, পুরুষালি ঘামের গন্ধ। অদম্য একটা ইচ্ছে হলো ক্লডিয়ার। ক্যানভাস চেয়ারে নড়েচড়ে বসে, তবু নিজেকে বাধ্য করলো স্থির থাকতে। তারপর আবিষ্কার করলো, বড় করে শ্বাস টানছে সে, শিকারীর গায়ের গন্ধটা পেতে চাইছে আবার। পরমুহূর্তে রাগের সাথে কাজটা থেকে বিরত করলো নিজেকে, কি করছে বুঝতে পারার সাথে সাথে।

চোখ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে একটা সবুজ পাতা দুলে উঠল, লতাপাতা দিয়ে তৈরী সুড়ঙ্গের মাথা থেকে বুলছে। প্রায় সাথে সাথে সাঁঝবেলার হালকা বাতাসের প্রথম স্পর্শ পেলো ক্লডিয়া। বাতাসের সাথে ভেসে এলো নতুন একটা গন্ধ-পঁচা মাংসের গন্ধ। টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বুনো মেঘের একটা ধড়। কলো রঙের দুশো পাল থেকে ওটাকে বেছে নেয় শন। ‘বুড়ি, বাচ্চা দেয়ার সময়

অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে, কুড়িয়াকে জানিয়েছে সে। ‘কাঁধের নিচে গুলি করুন, সরাসরি হাটে,’ ওর বাবাকে পরামর্শ দিয়েছে।

এই প্রথম একটা পশুকে ঠান্ডা মাথায় খুন করতে দেখলো কুড়িয়া। ভারি রাইফেলের বিস্ফোরন কাঁপিয়ে দিয়েছে তাকে, মোষের বুক থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসা তাজা লাল রক্ত দেখে আর অসহায় পশুর যন্ত্রণাকাতর গোঙানি শুনে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। ওদের দিকে টলতে টলতে অপেক্ষারত টয়োটার ফিরে আসে, সামনের সিটে বসে ঘামতে শুরু করে, গলায় উঠে আসা বমির ভাবটা দূর করার জন্য হিমসীম খেতে থাকে- ওদিকে তখন নিহত মোষের ছাগ তুলতে ব্যস্ত শন। ‘কসাই, একটা কসাই!’ আপন মনে বিড় বিড় করে সে, শিকারীর প্রতি বিতৃষ্ণা আরো একটু বাড়ে।

টয়োটার সামনে পাওয়ার উইঞ্চ আছে, সেটার সাহায্যে বুনো একটা ডুমুর গাছের নিচু একটা ডালে ঝোলান হয়েছে ধড়টা, এতো উঁচুতে যে নাগাল পেতে হলে পূর্ণ বয়স্ক একটা সিংহকে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাড়াতে হবে।

সেটা আজ চারদিন আগের ঘটনা। ধড়টা ডালে ঝোলানোর সাথে সাথে তাজা রক্তের গন্ধ পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে ইম্পাত নীল মাছিগুলো। মাছি আর রোদের তাপ ইতিমধ্যে পঁচিয়ে ফেলেছে মাংস। দুগন্ধটা যেনো আঠাল পদার্থের মত লেস্টে গেলো কুড়িয়ার জিভ আর গলায়। মাচায় ঢোকার সময় সন্তোষ প্রকাশ করেছে শন, ‘দশ মাইলের মধ্যে কোনো। সিংহ বাবাজি এর লোভ সামলাতে পারবে না।’

প্রচণ্ড গরমে বিমুচ্ছিল পাখিরা, মৃদুমন্দ বাতাসের শীতল ভাব তাদের মধ্যে যেনো প্রাণ এনে দিলো। লতাপাতা ঢাকা নিচের ঝরনার পাড় থেকে একটা পাখি ঢেকে উঠলো, ‘কুক! কুক! কুক!’ সেই সাথে ঝাঁপটালো ছোট বড় কয়টা রঙিন পাখি। ধীরে ধীরে মাথা তুলে মন্দ্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকল কুড়িয়া, আনন্দে চকচক করছে চোখ দুটো।

কতক্ষণ ধরে পাখি দেখছে বলতে পারবে না কুড়িয়া, হঠাৎ মাচার ভেতর একটা উত্তেজনা অনুভব করল সে। তার বাবা হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছেন, রাইফেলের বাট ধরা তার হাতটা শক্ত হলো সামান্য। চিকন ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে, নিম্পলক চোখে সেদিকটা অনেক্ষণ খুঁজেও তার উত্তেজনার কারণ ধরতে পারলো না কুড়িয়া। চোখের কোনো দিয়ে সে দেখলো, ওদের মাঝখানে দিয়ে সামনে বাড়লো শন, ওর হাত সাপের মত নিঃশব্দে ও সতর্কতার সাথে এগুলো, তার বাবার কনুই ধরে চাপ দিলো মৃদু। তারপর শিকারীর নিচু কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে, বাতাসের চেয়ে কোমল। ‘ধীরে’ বললো ও।

কাজেই অপেক্ষায় থাকলো ওরা, জড় পদার্থের মতো স্থির। ধীরগতিতে পেরিয়ে যাচ্ছে মিনিটগুলো। দশ মিনিট। বিশ মিনিট।

‘বাঁ দিকে’ বিড়বিড় করে বললো শন, এতোই আকস্মিক আর অপ্রাশিতভাবে যে প্রায় চমকে উঠলো ক্লডিয়া। তার চোখ দুটো বাম দিকে ঘুরে গেলো, কিন্তু ঘাঁস ঝোপ আর ছায়া ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। পলকহীন তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে জ্বালা ধরে গেলো, পানিতে ভরে ওঠল, ঘন ঘন পলক ফেলে আবার তাকাল সে। এবার ধোয়া বা কুয়াশার মত কি যেনো নড়ে উঠতে দেখলো, রোদপোড়া ঘাসের গায়ে খয়েরি রঙের একটা ঢেউ।

তারপর অকস্মাৎ, নাটকীয়ভাবে, খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো একটা জানোয়ার, ঝুলন্ত ধড়ের ঠিক নিচে।

নিজের অজান্তে আঁতকে উঠলো ক্লডিয়া, গলায় আটকে গেলো নিঃশ্বাস। জীবনে এতো সুন্দর প্রাণী আগে কখন দেখেনি সে। বিশাল একটা বিড়াল, যতটা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক বড়-চকচকে, ঝলমলে, সোনালী। জানোয়ারটা মাথা ঘুরিয়ে সরাসরি তার দিকে তাকাল। ক্লডিয়া দেখলো, ওটার গলার রং কোমল ক্রীম, লম্বা সাদা গোঁফে প্রতিফলিত হচ্ছে রোদ। কান দুটো গোল, খাড়া হয়ে আছে, গায়ে কালো ফুটকি আছে। চোখ জোড়া হলুদ, দামী পাথরের মত চকচক করছে, কুচকে তীর চিহ্নের আকৃতি পেয়েছে পাপড়ি, সুড়ঙ্গ পথ ধরে মাচার দিকে তাকিয়ে আছে।

এখনো নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না ক্লডিয়া। নিজের সমগ্র অস্তিত্বে সিংহটার দৃষ্টি অনুভব করছে সে, সারা শরীর উত্তেজনায় অধীর। তারপর মাথা ঘুরিয়ে ঝুলন্ত মাংসের দিকে ফিরলো জানোয়ারটা, এতোক্ষণে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফেললো ক্লডিয়া। ‘মেরো না গ্লিঞ্জ ওটাকে মেরো না!’ প্রায় কঁকিয়ে উঠলো সে। স্বস্তিও সাথে লক্ষ্য করলো, তার বাবা একচুলও নড়েনি, শিকারীর হাত এখনো ধরে আছে তার কনুই।

এতক্ষণে টের পেল ওটা ক্লডিয়া, পুরুষ নয়, মেয়ে-সিংহী-কেশর নেই। ওদের আলোচনা থেকে আগেই জেনেছে সে, শুধু পূর্ববয়স্ক সিংহকে মারা হবে। ভুল করেও কোনো সিংহীকে মারা হলে মোটা অঙ্কের জরিমানা দিতে হবে, এমনকি জেলও হতে পারে। তার পেশীতে ঢিল পড়ল, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলো প্রাণীটির চোখ ঝলসানো সৌন্দর্যের দিকে।

আরো একবার নিজের চারদিকে তাকাল সিংহী, কোনো বিপদের চিহ্ন দেখতে না পেয়ে মুখ খুললো, নিচু গলায় মিউ মিউ করলো বারকয়েক। আদর করে কাকে যেনো ডাকলো।

প্রায় সাথে সাথে হুড়মুড় করে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো তার বাচ্চারা। খেলনার মত, নরম তুলতুলে, তিনটে বাচ্চা। হাটার সময় হাটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে, কারণ খুদে শরীরের তুলনায় পাগুলো বেশি লম্বা। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর, মা কোনো বাধা না দেয়ায়, পরস্পরের সাথে খুনসুটি আর কৃত্রিম মাড়ামাড়িতে মেতে উঠলো বাচ্চাগুলো। এ-ওর গায়ে ঢলে, থাবা মাড়ছে মুখে, গড়াগড়ি খাচ্ছে ঘাসের ওপর।

পেছনে পা দুটির ওপর ভর দিয়ে দাড়াল সিংহী, বুলন্ত গভীর পেটের ভেতর মাথা ঢোকাল, ভেতরে নাড়িভুড়ি না থাকায় কোনো অসুবিধা হলো না। ভোজন পর্ব শুরু হলো তার। সিংহীর স্তন যথেষ্ট চোষা হয়েছে, বোটার চারপাশের পশমগুলো বাচ্চাদের লালায় ভেজা ভেজা। এখনো সে তার বাচ্চাদের মাই ছাড়ায়নি, কাজেই তারা তার খাওয়ার বাধ সাধলো না, খেলায় মগ্ন তারা।

এরপর দ্বিতীয় একটা সিংহী বেরিয়ে এলো খোলা জায়গাটায়, পিছনে আরো একজোড়া বাচ্চা। দ্বিতীয় সিংহীর গায়ের রঙ গাঢ়, শিড়দারার কাছে প্রায় নীল, চামড়ায় পুরোন ক্ষতের অসংখ্য শুকনো দাগ তার দীর্ঘ সংগ্রামবহুল শিকারী জীবনের স্বাক্ষর বহন করছে। থাবা, শিং, নখর আর খুরের আঘাত ওগুলো। একটা কানের অর্ধেকটাই নাই, হেঁড়া চামড়ার ফাঁকে পাজর দেখা যাচ্ছে। বুড়ি হয়ে গেছে সে। সঙ্গের বাচ্চা দুটোই সম্ভবত তার শেষ সন্তান। আগামী বছর, বাচ্চা দুটো তাকে ছেড়ে গেলে, শারীরিক দুর্বলতার কারণে শিকার ধরা তার দ্বারা সম্ভব হবে না, তখন তাকেই শিকার করবে কোনো একটা হায়েনার দল। তবে এখনো সে তার চাতুর্ঘ্য আর অভিজ্ঞতার পুজি ব্যবহার করে অস্তিত্ব রক্ষা করছে।

বেশ বড় হয়েছে বাচ্চা দুটো। টোপের কাছে তাদেরই আগে যেতে দিল মা, কারণ এ ধরনের পরিস্থিতিতে দুজন সঙ্গীকে মরতে দেখেছে সে, গাছ থেকে বুলন্ত ধড়ের নিচে। কাজেই টোপটাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে সে। মাংসের লোভ সামলে ফাকা জায়গাটার চারধারে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলো, লেজটা মাঝে মধ্যে ঝাপটালো, খানিক পরপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে খোলা সুড়ঙ্গের শেষমাথা অর্থাৎ মাচার ঘাস ঢাকা দেয়ালের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকাল।

লেজের ওপর বসে তার বাচ্চা দুটো মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে মাংসের দিকে, খিদে আর হতাশায় গরগর আওয়াজ করছে, কারণ বুলন্ত মাংস তাদের নান্দ্যালের মধ্যে নেই। অবশেষে, দুটোর মধ্যে যেটা উদ্যোগী, খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে প্রস্তুতি নিলো, তারপর ছুটে এসে লাফ দিলো টোপ লক্ষ্য করে। মুখ হাঁ করে খানিকটা মাংস ছিড়ে নিতে চেষ্টা করলো সে, কিন্তু তরুণ সিংহ তাকে মাঝপথে বাধা দিলো, গর্জে উঠে থাবা মারলো। শূন্য থেকে মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়লো বাচ্চাটা, কোনো রকমে চারপায়ে দাঁড়ালো, পিছিয়ে গেলো খানিকটা।

বয়স্ক সিংহী তার বাচ্চাকে রক্ষার কোনো চেষ্টাই করলো না। দলের নিয়মই এই, পূর্ণবয়স্ক শিকারীরা, দলের যারা সবচেয়ে মূল্যবান সদস্য, সবার আগে তারাই খাদ্য গ্রহণ করবে। তাদের শক্তিই দলের রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে। তাদের খাওয়া হলে বাচ্চারা সুযোগ পায়। অনটনের সময়, যখন শিকার পাওয়া যায় না, কিংবা খোলা প্রান্তরে শিকার ধরা কঠিন হয়ে ওঠে, দুর্বল শিশুরা না খেয়ে মারা যায়। আবার প্রচুর পরিমাণে শিকার না পাওয়া পর্যন্ত সক্ষম সিংহীরা বাচ্চা নেয় না। এভাবে নিশ্চিত করা হয় দলের অস্তিত্ব।

মার ঝাণ্ডা বাচ্চাটা ভয়ে ভয়ে, এক পা দু'পা করে ঝুলন্ত মাংসের নিচে ফিরে এলো, ভোজনে মত্ত তরুনী সিংহীর অজ্ঞাতে খসে পড়া মাংসের ছোটো ছোটো টুকরোগুলোয় ভাগ বসাবার জন্যে সে তার বোনের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করলো।

দু'পায়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়, এক সময় চারপায়ে দাঁড়ালো তরুনী সিংহী। গা ঘিন ঘিন করে উঠলো ক্লডিয়া, কেচোরমত সাদা একধরনের পোকা গিজগিজ করছে সিংহীর মাথায়। মাথাটা ঘন ঘন ঝাঁকাল সে, ভাত আকৃতির পোকাগুলো বৃষ্টির ঝোটার মতো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। থাবা দিয়ে মাথা আচড়ালো ব্যস্তভাবে, মোটাসোটা পোকাগুলো তার পশম ছাওয়া কানের ফুটোয় ঢুকে যাচ্ছে। তারপর সে তার গলাটা লম্বা করে হাচি দিলো, নাকের ফুটো থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো কয়েকটা পোকা।

হাচির আওয়াজটাকে খেলার বা ঝাওয়ার আমন্তন মনে করল বাচ্চারা। দু'জন লাফ দিয়ে তার মাথায় চড়ল, ঝুলে পড়ল কান ধরে। সবচেয়ে ছোটোটা এক ছুটে ঢুকে পড়লো মায়ের পেটের তলায়, স্তনের একটা বোটা মুখে ভরে চুষতে শুরু করলো। তরুনী সিংহী এ-সব গ্রাহ্য করলো না, আবার দু'পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো সে, মাংস ছিড়ে খেতে লাগলো। স্তন ধরে ঝুলে থাকা বাচ্চাটা পড়ে গেলো মাটিতে, মায়ের দু'পায়ের ফাঁক গলে মনমরা হয়ে বেরিয়ে এলো সে, সারা গায়ে ধুলো।

মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে ফেললো ক্লডিয়া, নিজেকে সামলাতে পারলো না। তার নিচের দিকের একটা পাজরে শক্ত খোঁচা দিল শন।

দলের অন্য সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত, ক্লডিয়ার হাসার শব্দে শুধু সতর্ক হলো বয়স্কা সিংহী। পেশীতে টান ধরায় কঁকড়ে গেলো তার শরীর, খুলির সাথে সঁটে গেলো তার কান, সুড়ঙ্গ পথ ধরে সরাসরি তাকিয়ে আছে মাচার দিকে। সমগ্র

অস্তিত্বে সিংহর দৃষ্টি অনুভব করলো ক্লডিয়া, হাসির ঝোকটা উবে গেলো, নিঃশ্বাস আটকে গেলো গলায়। 'আমাকে নিশ্চই দেখতে পাচ্ছে না!' ভাবলো সে, যেনো নিরোট একটা সত্যকে অস্বীকার করতে চাইছে। 'কি করে দেখবে।'

তারপর অকস্মাৎ, ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে, বুনো ডুমুর গাছের সামনের ঝোপে অদৃশ্য হয়ে গেলো বয়স্কা সিংহী। আটকে যাওয়া নিঃশ্বাস ছাড়লো ক্লডিয়া, মুখ ঝুলে বাতাস টানলো।

সময় বয়ে চললো। ডুমুর গাছের নিচে দলের বাকি সবাই ঝাওয়া আর খেলায় ব্যস্ত। গাছগুলোর মাথা থেকে অনেক নিচে নেমে এলো সূর্য। 'ওদের সাথে যদি কোনো পুরুষ থাকে' নরম নিঃশ্বাসের সাথে বললো শন, 'এবার আসবে সে।' সিংহদের সময়ই হলো রাত, অন্ধকার ওদেরকে সাহসী আর বেরোয়া করে তোলে। দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

মাচার ঘাস মোড়া দেয়ালের পাশে কিসের যেনো একটা শব্দ শুনলো ক্লডিয়া। জঙ্গলের চারধারে এ-ধরনের আরো কতো শব্দই তো হচ্ছে, বিশেষ গুরুত্ব দিলো

না। তারপর স্পষ্ট একটা আওয়াজ ঢুকলো কানে, চিনতে ভুল হলো না। ভারি কোনো জানোয়ারের পা ফেলার শব্দ-নরম ও সতর্ক, কিন্তু খুব কাছে। ক্লডিয়া অনুভব করলো, ভয়ে পোকার মত কিলবিল করছে তার পেশী আর চামড়া, ঘাড়ের পিছনে শক্ত হয়ে যাচ্ছে চুলের গোড়া। বট করে ঘাড় ফেরাল সে।

মাচার দেয়ালে সেটে। আছে ক্লডিয়ার বাম কাধ, বেড়ার গায়ে এক ইঞ্চি চওড়া একটা ফোকর। ফুটোর সাথে একই রেখায় রয়েছে তার চোখ দুটো। সেদিকে তাকাতেই নড়াচড়া দেখতে পেল সে। কি দেখছে প্রথম বুঝতে পারলো না, তারপর ওটা আসলে তামাটে রঙের মসুন চামড়া, ফুটোর সবটুকু জুড়ে আছে, দেয়াল থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। বিক্ষোভিত চোখে তাকিয়ে থাকলো ক্লডিয়া, হৃৎপিণ্ডটাকে যেনো খামচে ধরেছে, তামাটে মসুন চামড়া সরে যাচ্ছে তার চোখের সামনে দিয়ে, এই সময় নতুন একটা শব্দ ঢুকলো তার কানে দেয়ালের উল্টোদিকের গা থেকে গন্ধ নিচ্ছে একটা জানোয়ার, শ্বাস টানার শব্দটা দীর্ঘ ও কাঁপা কাঁপা।

নিজের অজান্তেই ক্লডিয়ার হাতটা পিছন দিকে চলে গেলো, তবে ফুটো থেকে চোখ সরায়নি। তার হাত ঠান্ডা ও কঠিন একটা মুঠোর ভেতর ধরা পড়লো। যার স্পর্শে কয়েক মিনিট আগে অপমানবোধ করেছে, এই মুহূর্তে সেই একই লোকের ছোয়া দেহ মনে এতো বেশি স্বস্তি ছড়িয়ে দিলো যে ব্যাপারটা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা যায় না। নিজের অজান্তে হলেও সে যে তার বাবার নয়, শিকারীর নাগাল পাবার চেষ্টা করেছে, এতে এমনকি বিস্মিত হলো না ক্লডিয়া।

নিম্পলক চোখে ফুটোর দিকে তাকিয়ে আছে সে। তারপর হঠাৎ, দেয়ালের ওদিকে আরেকটা চোখ দেখা গেলো। বিশাল একটা গোল চোখ, যেনো মূল্যবান হলুদ রত্ন, চারদিকে দ্যুতি ছড়াচ্ছে, পলকহীন, কালো মনিটা সরাসরি ক্লডিয়ার চোখে তাক করা, মাত্র একহাত দূর থেকে।

চিৎকার করতে চাইলো ক্লডিয়া, কিন্তু গলাটা বুজে আছে সে। লাফ দিয়ে দাড়াতে চাইলো, কিন্তু পায়ে কোনো সাড়া নেই। তার ফুলে ওঠা মূত্রথলি তলপেটে পাথরের মতো ভারি হয়ে আছে-সামলাবার সময় পেলো না, অনুভব করলো উষ্ণ কয়েকটা ফোটা বেরিয়ে এসেছে। আতঙ্কের মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেলো আত্মধিকার ও গোপন লজ্জা, সেই সাথে ফিরে পেলো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা-উরু আর নিতম্ব শক্ত করলো সে, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরলো শনকে, এখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ভীতিকর হলুদ চোখটার দিকে।

আবার সশব্দে বাতাস টানলো বয়স্কা সিংহী, নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো ক্লডিয়া, মনে মনে বারবার আওড়াচ্ছে, 'চৈঁচাবো না, আওয়াজ করবো না, চৈঁচাবো...!'

সিংহীর নাকের ফুটো মানুষের গন্ধে ভরে ওঠলো, গর্জে উঠলো সে, বিক্ষোভের মতো শব্দে থর থর করে কেঁপে উঠলো, ভঙ্গুর মাচা। হাঁ করলো ক্লডিয়া, তবে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিতে পারলো, কোনো চিৎকার বেরোলো

না। ফুটো থেকে সরে গেলো হলুদ চোখ, ভারি পায়ের থপ থপ আওয়াজ হলো, মাচাটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।

মাথা ঘুরিয়ে শব্দটাকে অনুসরণ করলো ক্লডিয়া, সরাসরি শনের চোখে তাকাল। হাসছে শন। খানিক আগে আত্মসম্মানের আঘাত পেয়েছে মেয়েটা, ওর হাসিটা দ্বিতীয় আঘাত হিসেবে দেখা দিলো। সবুজ চোখ আর ঠোঁট জোড়ায় বেপরোয়া, বিদ্‌পাত্মক হাসি লেপ্টে রয়েছে। তাকে লক্ষ্য করে হাসছে শিকারী। আতঙ্ক দূর হলো, মাথাচাড়া দিলো ক্রোধ।

‘শুয়োর’ ভাবলো ক্লডিয়া। ‘কুত্তা’। সে জানে, তার মুখে রক্ত নেই, চোখ দুটো বিচ্ছোরিত হয়ে আছে ভয়ে। নিজেকে ধিক্কার সে, তার এই বেহাল অবস্থা দেখে ফেলার জন্য ঘৃণা করলো শিকারীকে।

হাতটা এক ঝাটকায় শিকারীর মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো ক্লডিয়া, কিন্তু এখনো হিংস্র জানোয়ারটার আওয়াজ পাচ্ছে বাইরে, এখনো খুব কাছে, ওদের ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। লোকটাকে তার অপছন্দ হলেও, ক্লডিয়া জানে, তাকে শব্দ মুঠোর ভেতর ধরে আছে বলেই এখনো নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে সে। কাজেই হাতটা সে ছাড়ছে না, তবে মুখটা ফিরিয়ে নিলো, মাথা ঘুরিয়ে অনুসরণ করলো ভীতিকর আওয়াজটাকে, শন যাতে তার চেহারা দেখতে না পায়।

মাচার সামনে দিয়ে হেঁটে গেলো সিংহী। ফুটো দিয়ে তার সোনালি শরীরটা দেখতে পেলো ক্লডিয়া, পলকের জন্যে। তরুণী সিংহী আর তার বাচ্চা গুলোকেও দেখতে পাচ্ছে সে, গর্জন শুনে সতর্ক হয়ে গেছে, লাফ দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে ঝোপের আড়ালে। টোপের নিচে খালি হয়ে গেছে জায়গাটা।

দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাবে। ভয়ে গিয়ে কাটা দিলো ক্লডিয়ার, অন্ধকারে না জানি কি করে জানোয়ারটা। তার কাধের ওপর দিয়ে হাত বাড়াল শন, ক্লডিয়ার ঠোঁটের ফাঁকে কি যেনো গুজে দিলো। এক সেকেন্ড বাধা দিলো ক্লডিয়া, পরস্পরের সাথে চেপে ধরলো ঠোঁটজোড়া, তারপর ফাঁক করলো, মুখের ভেতর ঢুকতে দিলো জিনিসটাকে।

‘লোকটা পাগল!’ ভাবলো ক্লডিয়া। ‘এই সময় চুইংগাম?’ তারপরই আবিষ্কার করলো, চিবাতে গিয়ে, মুখের ভেতর এক বিন্দু লাল বা থুথু নেই, শুকিয়ে খরখরে হয়ে আছে। মুখে চুইংগাম থাকায় একটু পরই ভেতরটা লালায় ভরে উঠলো, যদিও শিকারীর ওপর এতো বেশি রেগে আছে যে কোনো রকম কৃতজ্ঞতা বোধ করলো না সে।

মাচার পিছন দিকে, আধো-অন্ধকারে, গরগর করে উঠলো বয়স্কা সিংহী। এক মাইল পিছনে রেখে আসা টয়োটার কথা মনে পড়লো ক্লডিয়ার। যেনো তার ভাবনারই প্রতিধ্বনি তুললেন বাবা, কোমল সুরে, ‘গানবেয়ারারদের কখন ট্রাক আনতে বলা হয়েছে?’

‘আলো ফুরিয়ে গেলে, যখন আর গুলি করার সুযোগ থাকবে না’ নিচু গলায় জবাব দিলো শন। ‘আর পনের কি বিশ মিনিট পর।’

ওদের আওয়াজ পেয়ে আবার গর্জে উঠলো সিংহী। ‘সাক্ষাত খান্ডারণী,’ সহাস্যে মন্তব্য করলো শন।

‘শশশ, চুপ!’ হিসহিস করে বললো কুড়িয়া। ‘আমরা কোথায় আছি বুঝে ফেলবে!’

‘আগেই জেনেছে এখানে আছি আমরা,’ বললো শন, তারপর গলা চড়ালো, ‘বুড়ি বেটি, এদিকে ঘুরঘুর কোনো লাভ নেই, তুমি বাপু তোমার বাচ্চাদের কাছেই ফিরে যাও!’

এক ঝটকায় ওর মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো কুড়িয়া। ‘আশ্চর্য মানুষ তো! তুমি দেখছি আমাদের সবাইকে মারার রাস্তা করেছে।’

চড়া গলা পেয়ে সতর্ক হয়ে গেছে সিংহী, মাচার বাইরে দীর্ঘ কয়েক মিনিট আর শব্দ হলো না। দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রাখা কুৎসিতদর্শন ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা তুলে নিয়ে কোলের ওপর রাখলো শন, ৫৭৭ নাইটো এক্সপ্রেস- এর ব্রীচ খুলে চেম্বার থেকে বের করলো মোটাসোটা একজোরা ব্রাসকার্টিজ। নতুন দুটো কার্টিজ বেরুলো জ্যাকেটের বামদিকের একটা লুপ থেকে, রাইফেলের চেম্বারে ভরা হলো সেগুলো। এটাকে শননের একটা কুসংস্কার বলা যেতে পারে, শিকার অভিযানে শুরুতে কার্টিজ বদলানো। ‘গুনুন, ক্যাপো,’ বললো ও। ‘সঙ্গত কারণ ছাড়া যদি বুড়ীটাকে মারি আমরা, গেম ডিপার্টমেন্ট আমার লাইসেন্স কেড়ে নেবে। সঙ্গত কারণ হবে যদি কারো একটা হাত বগলের কাছ থেকে ছিড়ে নেয়, তার আগে নয়। বুঝতে পারছেন তো?’

‘পারছি।’ রিকার্ডো মনটেরো মাথা ঝাঁকালেন।

‘কাজেই আমরা অনুমতি ছাড়া গুলি করবেন না। যদি করেন, আপনাকে আমার হাতে মরতে হতে পারে। অনেক সাধ্য-সাধনার পর লাইসেন্সটা যোগ্য করেছি আমি।’

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আধো-অন্ধকাণ্ডে নিঃশব্দে হাসলো ওরা। দুজনেই সময়টা উপভোগ করছে, বুঝতে পেরে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের সীমা রইলো না কুড়িয়ার।

‘ট্রাক নিয়ে মাচার কাছে আসতে পারবে না জোব, নদীর শুকনো বুকে থামতে হবে ওকে। তারমানে অন্ধকারে নদী পর্যন্ত হেটে যেতে হবে আমাদের। আপনি আগে থাকবেন ক্যাপো,; আপনার আর আমার মাঝখানে কুড়িয়া। সবাই গায়ের সাথে সঁটে থাকবেন, আর ভুলেও কেউ ছুঁটবেন না। কোনো অবস্থাতেই দৌড়াবেন না।’







তলপেট কুঁচকে গেলো, শুকনো বালির ওপর পা পড়লো এলোমেলোভাবে। বিস্ফোরিত চোখে লক্ষ্য করলো, 'সিংহীর লেজ লোহার রডের মতো খাড়া হয়ে আছে। চরম আতঙ্কের মধ্যেও শনের কথাটা মনে পড়লো তার। ভাবলো, 'আমি শেষ, আমাকে মেরে ফেলেছে!'

মেয়েটা যে দৌড় দিয়েছে বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না শনের। সতর্কতার সাথে পিছু হটে, ঢাল বেয়ে, নদীর তলায় নামছিল ও, বাম হাতে টর্চ, ডান হাতে রাইফেল। রাইফেলের ব্যারেল ওর কাধের ওপর কাত হয়ে আছে, বুড়ো আঙুলটা সেফটি-ক্যাচ-এর বোতামে, নজর রাখছে বয়স্কা সিংহীর ওপর, লম্বা ঘাসের কিনারা থেকে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে। তবে শন নিশ্চিত, এটাও তার আক্রমণ করার ভান মাত্র, প্রথমবার সুবিধে করতে না পারায় দ্বিতীয়বারও হামলা করার সাহস পাবে না। তার অনেকটা পিছনে দুটো বাচ্চাকে দেখা গেলো, ঘাসের ওপর বসে বিশাল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, হামলায় অংশগ্রহণের সাহস নেই। তরুনী সিংহীটাকে হারিয়ে ফেলেছে শন, যদিও জানে সেটাই এখন ওদের জন্যে আসল হুমকি। অনুভব করলো ওর নিতম্বে ধাক্কা খেলো ক্লডিয়া, ধরে নিলো হোঁচট খেয়েছে সে, জানলো না ছোট্টার জন্যে ঘোরার সময় লেগেছে ধাক্কাটা। তরুনী সিংহীর খোঁজে লম্বা ঘাসের কিনারায় চোখ বুলাচ্ছে তখনো শন, এই সময় আলগা বালিতে ক্লডিয়ার পায়ের আওয়াজ পেলো ও। ঝট করে ফিরেই দেখলো, শুকনো নদীর বেড়ে একা রয়েছে মেয়েটা।

'ইউ, ব্লাডি ইডিয়ট!' প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ল শন। চারদিন আগে প্রথম দেখা হবার পর থেকেই মূর্তিমান একটা উপদ্রব হয়ে আছে মেয়েটা। আবারও সে ওর নির্দেশ অমান্য করেছে। মুহূর্তে বুঝে নিলো শন, এমন কি সিংহী হামলা শুরু করার আগেই, মেয়েটাকে হারাতে হবে।

কোনো ক্লায়েন্ট নিহত কিংবা আহত হলে প্রফেশনাল হান্টার হিসেবে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে শনের, দুর্নাম তো যা হবার হবেই, ওর লাইসেন্সও বাতির করা হতে পারে।

রিকার্ডোকে পাশ কাটালো ও, ঢালের ওপর এখনো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ঠিক এই সময় লম্বা ঘাসের পাচিল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো তরুনী সিংহী, মাটিতে পেট দিয়ে ওত পেতে ছিল সে।

নদীর তলদেশ টয়েটার আলোয় ভেসে যাচ্ছে, টর্চ ফেলেদিয়ে রাইফেলটা দু'হাতে ধরলো শন। কিন্তু গুলি করার কোনো উপায় নেই, সিংহী আর ওর মাঝখানে রয়েছে ক্লডিয়া। শুকনো বালির ওপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছুটছে সে, হাত ও পা ছোড়ার মধ্যে কোনো ছন্দ নেই, মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে সিংহীর দিকে।

'শোও!' চিৎকার করলো শন। 'শুয়ে পড়ো!' কিন্তু থামছে না ক্লডিয়া, গুলির পথ থেকে সরছে না। সিংহীর পায়ে যেনো ঝড়ের গতি, পেছনে বালির মেঘ উড়িয়ে

ঝড়ের গতিতে কুড়িয়ার দিকে ছুটছে, এরই মধ্যে তার হলুদ চোয়ার পুরোপুরি খুলে গেছে। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে হুকার ছাড়ছে সে, লেজটা খাড়া ও শক্ত।

হেডলাইটের আলোয় সিংহী আর মেয়েটার ছায়া সাদা বালির ওপর বিশাল আর কালো লাগলো, দ্রুত এক হতে যাচ্ছে। লাফ দেয়ার জন্যে শরীরটা কৌকড়ালো সিংহী, রাইফেল সাইটের ওপর দিয়ে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকলো শন। সিংহী আর কুড়িয়াকে আলাদা করা অসম্ভব, গুলি করলে মেয়েটাকেও লাগবে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে আছাড় খেল কুড়িয়া, পায়ে শক্তি নেই, হাটু ভেঙে ছিটকে পড়লো বালির ওপর, ভয়ে ফোঁপাচ্ছে।

চোখের পলকে সিংহীর বুক লক্ষ্য স্থিতি করলো শন নিজের ওপর বিশ্বাস আছে ওর, আস্থা আছে রাইফেলটার ওপর। এই রাইফেল দিয়ে একই সময়ে ছুড়ে দেয়া একজোড়া আধুলিকে ফুটো করতে পাও ও, সেগুলো মাটিতে পড়ার আগেই, বিশ গজ দূর থেকে। হাতের এই রাইফেলটা দিয়ে কতযে শিকার করেছে তার কোনো লেখাজোখা নেই। অনেক মানুষের এই রাইফেটায় প্রাণ হারিয়েছে। লক্ষ্যভেদে কখনো দু'বার গুলি করতে হয়নি ওকে। এই মুহূর্তে টার্গেট আর ওর মাঝখানে কোনো বাধা নেই, অন্যায়সে একটা ৭৫০ গ্রেন সফট-নোজ বুলেটকে সিংহীর বুক দিয়ে ঢুকিয়ে লেজের গোড়ায় পৌছে দিতে পারে। নিহত একটা সিংহী ডেকে নিয়ে আসবে সম্ভাব্য সব রকম সরকারী অভিশাপ। গেম ডিপার্টমেন্ট নিঘার্ত বাতিল করবেন ওর লাইসেন্স।

সারা গায়ে বালি মেখে পড়ে আছে মেয়েটা, সেজদা দেয়ার ভঙ্গিতে, পিছনে উঁচু হয়ে রয়েছে নিতম্ব। প্রায় তার ওপর চলে এসেছে সিংহী। দু'জনের মাঝখানে আর মাত্র কয়েকফুট সাদা বালি। রাইফেটা নিচু করলো শন। ভয়ংকর ঝুঁকি নিচ্ছে ও, তবে ঝুঁকি নেয়াই ওর নেশা, ঝুঁকি নিয়েই তো সারাটা জীবন আস্তিত্ব রক্ষা করছে। মেয়েটার জীবন নিয়ে জুয়া খেলছে ও, কিন্তু সে ওকে কম বিরক্ত করেনি, এখন না হয় খানিটা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করুক।

সিংহীর খোলা চোয়ালের দু'ফুট সামনে গুলি করলো শন। ভারি বুলেটের আঘাতে বিক্ষোভিত হলো বালি, নিরেট একটা সাদা ঝর্নার মতো দেখাল, তার ভেতর সম্পূর্ণ ঢাকা পড়লো দস্যুরানী। মুখের ভেতরটা বালিতে ভরে গেলো, হুকার ছাড়ার ফাঁকে শ্বাস টানার সময় ফুসফুসে ঢুকলো খানিকটা, ভেজা নাকের ফুটোয় জমা হলো, চাবুকের মতো আঘাত করলো হলুদ চোখে। অন্ধ হয়ে গেলো সিংহী, হামলার কথা ভুলে গেছে।

ছুটলো শন, দ্বিতীয় বার গুলি করার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু তার আর দরকার নেই। বালি ভরা চোখ দুটো সামনের পা দিয়ে অনবরত আঁচড়াচ্ছে সে, নিজের সাথে ধস্তাধস্তি করার ভঙ্গিতে দ্রুত পিছু হটছে। বারবার কাত হয়ে পড়ে গেলো সিংহী, গড়াগড়ি খেল, দাঁড়ালো, পিছু হটে ফিরে যাচ্ছে লম্বা ঘাসের নিরাপদ আশ্রয়ে।



মুখদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সে, তার নগ্ন শরীর শিবীশর করে কেঁপে উঠলো কেন জানি।

খুপড়ি থেকে বেরুলো ক্লডিয়া, হ্যারিকেন তার হাতে আগে আগে হাটছে মোজেজ। শাওয়ার সেরে সিঙ্ক ড্রেসিং-গাউন পরেছে সে। তাঁবুতে ফিরে থাকি শার্ট, বুট আর টি-শার্ট পরলো। তার কাদা মাখা কাপড় রোজ ধুয়ে ইত্থি করে রাখে মোজেজ। প্রচুর সময় নিয়ে চুল শুকালো সে, ব্রাশ করলো, হালকা লিপস্টিক ছোয়ালো ঠোঁটে। আয়নায় চোখ রাখার পর ভালো লাগার অনুভূতিটা বাড়লো আরো।

পুরুষরা ইতিমধ্যে ফায়ারের পাশে জড়ো হয়েছে, ক্লডিয়াকে আসতে দেখে চুপ হয়ে গেলো সবাই। ইতিমধ্যে শনও শাওয়ার সেরেছে, খাকি শার্টস আর টি-শার্ট পরে বসে আছে ক্যাম্প চেয়ারে। ক্লডিয়াকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়লো ও,। ওর এই ভদ্র আচরণে রীতিমতো অস্বস্তিবোধ করে ক্লডিয়া, কেন যেনো মনে হয় শিকারী আসলে তাকে ব্যঙ্গ করছে। ‘বসো!’ সুরে ধমকের ভাব আনার চেষ্টা করলো ক্লডিয়া। ‘আমাকে দেখলেই নিজেকে এভাবে শাস্তি দেয়ার দরকার নেই।’

সহজভাবে মৃদু হাসলো শন, কিছু বললো না। মনে মনে নিজেকে সতর্ক করে দিলো, বুঝতে দেয়া চলবে না আমার নার্ভে খোঁচা দিতে সফল হচ্ছে, তাহলে একবারে ঘাড়ে চড়ে বসবে। একটা ক্যানভাস চেয়ার টেনে আঙনের ধারে রাখলো ও, সেটায় বসে আঙনের দিকে বুটজোড়া বাড়িয়ে দিলো ক্লডিয়া, হাত দুটো ভাঁজ করলো বুকের ওপর ‘ক্লডিয়া বিবিকে এক পেগ দাও,’ মেস ওয়েটারকে নির্দেশ দিলো শন। ‘কিভাবে উনি চান তুমি জানো।’

সিলভার ট্রেতে করে ক্রিস্টাল গ্লাসটা নিয়ে এলো ওয়েটার, গ্লাসে শিভাস রিগাল হুইস্কি, পেরিয়ার ওয়াটার মেশানো, সাথে কয়েক টুকরো বরফ। তুষার ধবল আলখাল্লা পড়ে আছে স্থানীয় হিন্দু ওয়েটার, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, মাথায় লাল ফেজ, ফেজটাই প্রমান করে ওয়েটারদের হেড সে। গোটা ব্যাপারটাই ক্লডিয়ার জন্য অব্যস্তি কর, ওদের তিন জনের সেবা করার জন্য চাকরবাকর রাখা হয়েছে বিশ জন। এটা উনিশশো সাতাশি, রাজা আর সম্রাটের যুগতো কবেই শেষ হয়েছে, তাই না? তবে হুইস্কিটুকু সত্যিই দারুণ।

গ্লাসেছোট আরেকটা চুমুক দিয়ে ক্লডিয়া বললো, ‘তুমি বোধ হয় আশা করেছ প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত?’

‘না, ডাকি,’ আগেই জেনে শন, এধরণের সম্বোধন মেয়েটা পছন্দ করে না। ‘তুমি এমনকি তোমার চরম নির্বুদ্ধিতার জন্যেও যে ক্ষমা চাইবে না, আমি জানি। তোমাকে তাহলে সত্যি কথাটা বলি, সিংহীটাকে খুন করতে হয় কিনা ভেবে আমি উদ্ভিগ্ন ছিলাম আমি। সেটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার হতো।’

হালকাভাবে ঝগড়া আর কথাকাটাকাটি হলো, দু’জনেই যেনো যার যার বুদ্ধিতে শান দিচ্ছে। ক্লডিয়া আবিষ্কার করলো ব্যাপারটা উপভোগ করছে সে। শনকে

সামান্য অপ্রতিভ করতে পারলেও তার চেহারা সন্তুষ্টিও আভা ফুটে উঠেছে, কোর্টে দাঁড়িয়ে বিজয়ী হবার চেয়ে কম আনন্দের নয়। মনটা খারাপ হয়ে গেলো হঠাৎ বাধা পড়ায়। হেড ওয়েটার ঘোষণা করলো, ডাইনিং টেন্ট-এ ডিনার পরিবেশন করা হয়েছে।

মোমের কোমল আলোয় টেবিলের ওপর সাজানো নিরেট রূপোর ছুরি আর চামচ চকচক করছে। টেবিল ক্রুথের কিনারায় সূচীশিল্পের বাহারী নক্সা। প্রতিটি ফোন্সিং ক্যানভাস সাফারি চেয়ারের পিছনে আলখাল্লা পড়া লোকজন করে ওয়েটার, পরিবেশনের জন্যে তৈরী।

‘আজ রাতে কি শুনতে পছন্দ করবেন আপনি, ক্যাপো?’ জানতে চাইলো শন।

‘মোৎসার্টের পিয়ানো কনসার্টো, সতের নম্বর।’

মিউজিক সেট চালু করে নিজের চেয়াও ফিরে এল শন। মটরশুটি, পার্লবার্লি আর মোষের হাড়মজ্জা দিয়ে তৈরী হয়েছে সুপ, তার সাথে মেশান ঝাল সস। বাবার মতোই ঝাল, রসুন আর লাল ওয়াইনের ভক্ত ক্লডিয়া। এরপর পরিবেশিত হলো মোষের নাড়িভুড়ি, সাদা সসের সাথে। ক্লডিয়ার অনুরোধে খাবারটায় প্রচুর এলাচ ব্যবহার করা হয়েছে, গন্ধ দূর করার জন্যে। তার বাবা অবশ্য বিশেষ করে ওই গন্ধটারই ভক্ত, সেজন্যে শেফকে আগেই বলে দেয়া হয়, নাড়িভুড়ি পরিষ্কার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে চর্বির স্তরে যেনো কোনো আঁচড় না লাগে। গন্ধ না থাকায় ক্যাপো বললেন, ‘এ যেনো ঘাস চাবাচ্ছি।’ তৃতীয় দফায় পরিবেশিত হলো, একা শুধু ক্লডিয়ার জন্যে, হরিণের কিডনি। শেফ আর ওয়েটাররা সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে আছে, কখন একটুকরো মুখে নেবে সে। চিবাতে গুরু করে হাসলো ক্লডিয়া, অপেক্ষারত লোকগুলো আনন্দমুখর গুঞ্জন তুললো। ক্যাম্পে এসেই শনের স্টাফদের মন জয় করে নিয়েছে সে, সবাই তাকে খুশি করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকে।

কিন্তু ডিনার টেবিলে সাধারণত প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিদন্দ্বীতা করার সুযোগই পায় না ক্লডিয়া, শন আর ক্যাপো এমন সব প্রসঙ্গে আলোচনায় মেতে থাকে যে ও সব বিষয়ে না কিছু বোঝে সে, না আছে আগ্রহ। ক্যাপো বললেন, ‘একটা ৩০০ ওয়াদারবাই থেকে ১৮০ গ্রেইন বুলেট প্রতি সেকেন্ডে ৩২০০ ফুট ছোটে, তারমানে ৪০০০ ফুট পাউন্ড মাজল এনার্জি পাও যাচ্ছে...’। ‘তো কি হলো। এসবের কোনো অর্থ পায় না ক্লডিয়া। সুস্থ কোনো বুদ্ধিমান মানুষ রাইফেল বা পশুহত্যা নিয়ে ঘটনার পর ঘটনা আলাপ করতে পারে না, অথচ ডিনারে বসে ওরা ঠিক তাই করে। আরো একটা জিনিস একদম সহ্য হয়না ক্লডিয়ার, বনের প্রানী গুলোর প্রতি শনের দরদ। ব্যাপারটাকে কৃত্রিম মনে হয় তার। আদর করে অনেক প্রানীর নাম রেখেছে শন-যেমন, ওর বাবাকে ক্যাপো ডাকে, তেমনি। ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেট একটা সিংহ, ওটাকে খুন করতে চাইছে ওরা, সেজন্যে গাছের ডালে ঝোলান হয়েছে মোষের ধরটা।

‘চলতি মণ্ডুমে মাত্র দু’বার দেখেছি আমি ওকে। একজন মক্কেল একবার একটা গুলিও করেন। ভদ্রলোক এমন কাঁপছিলেন পঞ্চাশ গজ দূরে লাগে গুলিটা।’

‘ওটার সম্পর্কে সব কথা বলুন আমাকে।’ অগ্রহ আর উত্তেজনায় সামনের দিকে ঝুঁকলেন ক্যাপো।

‘বাবা, কাল রাতে তোমাকে একবার বলেছে ও। পরশু রাতেও বলেছে। তার আগের রাতেও।’ কি জবাব দেয় শোনার জন্যে একটা ভুরু সামান্য উঁচু করে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলো ক্লডিয়া।

‘বাচ্চা মেয়েরা বড়দের ব্যাপার নাক গলায় না। আমি কি তা হলে কিছুই তোমাকে শেখাইনি? আপনি আমাকে ফ্রেড সম্পর্কে বলুন, শন।’

‘লম্বায় এগারো ফুটের বেশি হবারই কথা, আর শুধু লম্বাই নয়, তার মাথাটা জলহস্তীর মতো, কেশর তো নয় যেনো কালো মেঘ। যখন হাটে, বাতাস লাগা ঝাউগাছের মতো ঢেউ ওঠে।’ রোমন্থন করছে শন। ‘চতুর?’ কৌশল? অবশ্যই। সমস্ত ছলাকলা জানা আছে তার। আমার জানা মতে তিন তিন বার তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছে। তিন মণ্ডম আগে, আয়ান পিয়ারসন-এর কনসেশনে একজন স্প্যানিয়ার্ড শিকারীর হাতে আহত হয় সে, তবে আঘাতটা সামলে নেয়। বোকা হলে এতো বড় হতে পারতো না।’

‘ওকে আমরা পাচ্ছি কিভাবে?’ জানতে চাইলেন ক্যাপো।

‘তোমরা দু’জন কি!’ শন মুখ খোলার আগেই বাধা দিলো ক্লডিয়া। ‘বাচ্চাগুলো অদ্ভুত সুন্দর, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, অথচ তোমার ওগুলোকে মেরে ফেলার কথা ভাবছো!’

‘আজ কোনো বাচ্চাকে গুলি করা হয়েছে বলে তো শুনিনি,’ বললেন ক্যাপো, ইঙ্গিতে প্লেটাটা আবার ভরে দিতে বললেন ওয়েটারকে। ‘বরং বলা যায়, ওদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছি আমরা।’

‘তুমি তোমার জীবনের পয়তাল্লিশটা দিন হাতি আর সিংহ মারার একক উদ্দেশ্যে অপব্যয় করছো!’ ঝাঁঝের সাথে জবাব দিলো ক্লডিয়া। ‘কাজেই আমাকে নীতিকথা শোনাতে এসো না, রিকার্ডো।’

‘নিজেরা যাদেও পশু প্রেমিক মনে করে, তাদের অপরিশ্রুত চিন্তাধারা আমাকে বিস্মিত করে,’ বললো শন, সাথে সাথে মারমুখো হয়ে ওর দিকে ফিরলো ক্লডিয়া, কোমর বেঁধে ঝগড়া করার জন্যে প্রস্তুত।

‘আমার অভিযোগটা স্পষ্ট। এখানে তোমার পশু হত্যা করছো।’

‘একজন কৃষক যে-কারণে বা যেভাবে পশু হত্যা করে,’ একমত হলো শন।

‘স্বাস্থ্যবান একটা পালের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্যে। পালটা যাতে টিকে থাকার মতো একটা অনুকূল পরিবেশ পায়, সেজন্যে।’

‘তুমি কৃষক নও।’

‘কে বললো নই, অবশ্যই আমি একজন কৃষক। এক অর্থে সবাই আমরা কৃষক, সবাই আমরা কিছু না কিছু ফলাই বা চাষ করি।

আমার পূর্ব পুরুষ কৃষক ছিলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে আমিও তাই। পার্থক্যটুকু এখানে, আমি পশু হত্যা করি রেঞ্জে, কসাইখানায় নয়। তবে যে কোনো কৃষকের মতো আমারও প্রধান উদ্বেগের বিষয় আমি যাদের লালনপালন করি তাদের নিরাপদ অস্তিত্ব।’

‘ওরা তোমার গৃহপালিত পশু নয়,’ প্রতিবাদ করলো ক্লডিয়া। ‘ওগুলো সুন্দর বন্য প্রাণী।’

‘সুন্দর? বন্য? অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলছো কেন? আজকের আধুনিক যুগে আর সব কিছুর মতো, টিকে থাকতে হলে আফ্রিকার বন্য প্রাণীকুলকেও মূল্য দিতে হবে। একটা হাতি বা একটা সিংহ শিকার করার জন্যে ক্যাপো পনের-বিশ হাজার ডলার খরচা করছেন। গবাদিপশুর চেয়ে অনেক বেশি আর্থিক মূল্য দেয়া হচ্ছে ওই প্রাণীগুলোর জন্যে, ফলে স্বাধীন সরকার কয়েক মিলিয়ন একর বনভূমি কনসেশন হিসেবে ছেড়ে দিতে উৎসাহী হয়েছে, যেখানে বন্য প্রাণীদের অস্তিত্ব সুরক্ষিত থাকবে। অনেক কনসেশন-এর একটা ভাড়া করেছেি আমি। আমার কাজ পোচারদের কবল থেকে ওদের বাঁচান। সংখ্যায় যাতে ওগুলো বাড়ে সেদিকটাও লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের, তা না হলে আমার শিকারী ক্লায়েন্টদের ফিরতে হবে খালি হাতে। তুমি জানো না, ডাকি, বৈধ সাফারি হলো আফ্রিকার বন্য প্রাণীগুলোকে রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার।’

‘তুমি কি চাইবে, ভোতা ছোরা দিয়ে জবাই করা হোক? তুমি বুদ্ধিমতি মেয়ে, মাথা খাটাও, মনের ব্যাকুলতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। আমরা যে সিংহটাকে শিকার করতে চাইছি তার বয়স বারো, আগামী বা তার পরের বছর এমনিতেই স্বাভাবিক মৃত্যু হবে তার। নির্দিষ্ট একটা প্রাণির কোনো মূল্য নেই, অমূল্য হলো গোটা প্রজাতির অস্তিত্ব। গুলি খেয়ে ওটার মৃত্যু হলে নগদ দশ হাজার ডলার আয় হবে, সেই টাকা ব্যয় হবে তারই বাচ্চাকাচ্চাদের নিরাপদ আশ্রয় তৈরির পেছনে। খবর রাখো, কনসেশন প্রথা চালু হবার পর আফ্রিকায় পোচাদের উপদ্রব আগের চেয়ে কত কমে গেছে? যেভাবে ছাল ছাড়াবার হিরিক লেগেছিল, এতেদিনে আফ্রিকা থেকে বন্যপ্রাণি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।’

রিকার্ডো, শন আর ক্লডিয়ার তর্ক ভালোই জমলো সে রাতে।

\*\*\*

কাপ-শিরিচের টুংটাং আর মোজেজের নরম কাশির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলো ক্লডিয়ার। তাঁবুর ভেতর এখনো গাঢ় অন্ধকার আর কনকনে ঠান্ডা। ওর ধারণা ছিলো না আফ্রিকায় এতো শীত পড়তে পারে। নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো মোজেজ, ক্লডিয়ার জন্যে বেড টি এনেছে।

ক্যাম্প-বেডে বসে পড়লো মোজেজ। ওয়াশ বেসিনের পাশে এক বালতি পানি রাখলো সে, রশিতে ঝোলাল পরিস্কার তোয়ালে, টিউব টিপে ব্রাশের ওপর টুথপেস্ট বের করলো, সবশেষে তাঁবুর মাঝখানে নামিয়ে রাখলো কাঠকয়লার গনগনে আগুন সহ একটা মালসা। ‘আজ খুব ঠান্ডা পড়েছে, ডোন্ না।’

‘আজও বুঝি অন্ধকার থাকতে বেরুবো আমরা, মোজেজ?’

‘জী, ডোন্ না। কাল রাতে সিংহের ডাক শুনেছেন?’

মুখের সামনে হাত তুলে হাই তুললো ক্লডিয়া। ‘দূর, ঘুমালে আমি মড়া।’ খালি বিছানায় কাপড়চোপড় সাজিয়ে বিদায় নিলো মোজেজ, যাবার সময় বলে গেলো, ‘কিছু দরকার হলেই আমাকে ডাকবেন, ডোন্ না।’

মোজেজ বেরিয়ে যেতেই লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলো ক্লডিয়া, পড়ার আগে আগুনে সেকে নিলো কাপড়গুলো। তারু থেকে বেরিয়ে দেখলো আকাশে এখনো তারা ফুটে রয়েছে।

‘ছোটবেলার অভ্যেস এখনো তোর বদলায়নি,’ ক্যাম্প ফায়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন ক্যাপো। মনে আছে, স্কুলে যাবার জন্য বিছানা ছাড়াতে কি ধকল পোহাতে হতো আমাকে রোজ?’ একজন ওয়েটার দ্বিতীয় কাপ চা এনে দিলো ক্লডিয়াকে।

শিস দিলো শন, সাথে সাথে স্টাট দিয়ে গাড়িটা ক্যাম্প ফায়ারের সামনে নিয়ে এলো জোব। রওনা হবার পর ক্লডিয়া দেখলো, রাইফেলগুলো র্যাকে সাজানো রয়েছে। ট্রাকের পিছনে দাড়িয়ে, দুই মেটাবেল জোব আর শেডরাখ মাঝখানে, স্বর্বকার নধোরোবো ট্রাকের মাতাউ। শুধু দৈহিক কাঠামো নয়, মাতাউর চেহারাটাও বাচ্চা ছেলের মতো, সরল ও নিম্পাপ। লম্বায় টেনেটুনে ক্লডিয়ার বগল পর্যন্ত। নিঃশব্দ হাসিতে সারাফন ভাঁজ খেয়ে আছে তার মুখ, নিজের বোধয় তার ওই হাসির মধ্যে কি জাদু আছে, কেউ একবার দেখলে অন্তর থেকে তাকে ভালো না বেসে পারবে না। বর্নবৈষম্যের ঘোর বিরোধী ক্লডিয়া, সম্ভবত সেজন্যেই শনের কালো স্টাফদের মন এতো সহজে জয় করতে পেরেছে সে, তবে ওদের একজনই জয় করতে পেরেছে ক্লডিয়ার মন, সে হলো ওই মাতাউ। ক্লডিয়াকে রীতিমত তার ভক্তই বলা যায়। আর্মি-সারপ্লাস গ্রেটকোট পড়ে আছে ওরা তিনজন, মাথায় কালো ক্যাপ। এক এক করে সবার নাম ধরে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া, উত্তরে অন্ধকারে সাদা হাসি উপহার দিলো তারা।

গাড়ি চালাচ্ছে শন, ওর আর ক্যাপোর মাঝখানে সামনের সিটে বসেছে ক্লডিয়া। উইন্ডস্ক্রীনের পিছনে মাথা নিচু করে শরীরটা কুঁকড়ে রেখেছে সে, বাবার

বুকের ওপর ঢলে পড়েছে খানিটা উষ্ণতা পাবার লোভে। দৈনিক অভিযানের গুরুটা বেশ ভালোই লাগে তার।

ঝাঁকি খেতে খেতে আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগুলো ট্রাক, ভোরের আলো ফোটার পর হেডলাইট অফ করে দিলো শন। এবার সোজা হলো ক্রুডিয়া, লম্বা ঘাসা আর ঝোপগুলোয় ব্যাকুলদৃষ্টিতে খুঁজতে লাগলো যদি কোনো সুন্দর প্রাণি দেখতে পায়। কিন্তু প্রতিবারই হয় শন নয়তো তার বাবা বিড়বিড় করে ওঠে, ‘বা দিকে হরিন’ বা ‘ওটা রীড-বাক’। মাঝে মধ্যে পিছন থেকে বুকে টোকা দিলো মাতাউ, তার লম্বা খুদে হাত অনুসরণ করে ক্রুডিয়া দেখতে পেলো দুর্লভ কোনো প্রাণি বা দৃশ্য।

ধুলোর ওপর পশুদের পায়ের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে, গত রাতে পার হয়েছে এই পথ। একবার ওরা সদ্য ত্যাগ করা হাতির বিষ্ঠা সামনে থামলো, ঠাণ্ডা ভোরে এখনো সেটা থেকে বাষ্প উঠছে। হাঁটু পর্যন্ত উচু একটা স্থপ, পরীক্ষা করার জন্যে সবাই নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। প্রথম দিকে মল পরীক্ষা করার এই বিপুল আগ্রহ দেখে বিরক্ত হতো ক্রুডিয়া, এখনো ব্যাপারটা সয়ে গেছে ওর।

‘একেবারে অর্থব বুড়ো,’ বললো শন। ‘দাঁত নেই বললেই চলে।’

‘কি করে জানলে তুমি? চ্যালেঞ্জ করলো ক্রুডিয়া।

‘খবার চিবাতে পারে না,’ বললো শন। স্থপটার মধ্যে সরু ডাল আর পাতাগুলো দেখছো, প্রায় অক্ষত।’

উবু হয়ে বসে হাতির পায়ের ছাপ পরীক্ষা করছে মাতাউ।

‘লক্ষ্য করছো, পায়ের মাংস কেমন ফাঁটা?’ ক্রুডিয়াকে বললো শন। ‘গাড়ির পুরোনো টায়ারের মতো ক্ষয়ে গেছে। বিশাল শরীর, অনেক বয়স।’

‘এটাই কি?’ ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ক্যাপো, সিটের পিছনে র্যাকে সাজান ৪১৬ রিগবি রাইফেলটার দিকে চট করে একবার তাকালেন।

‘মাতাউ বলবে,’ কাঁধ ঝাকাল শন। খুদে নদোরোবো মাতাউ ধুলোর ওপর থো থো করে থু থু ছোটাল, সোজা হবার সময় এমন ভাবে মাথা নাড়াল যেনো শোকে কাতর, তারপর সোয়াহিলি ভাষায় শনের সাথে কথা বললো। ‘এটা সেটা নয়। মাতাউ এই মন্দাটাকে চেনে,’ ভাষান্তর করলো শন। ‘গতবছর এটাকে নদীর কিনারায় দেখেছে সে। এটার একটা দাঁত ঠোঁটের কাছে ভেঙে গেছে, আরেকটা ক্ষয়ে ছোটো হয়ে গেছে।’

‘তারমানে? তুমি বলতে চাও শুধু পায়ের ছাপ দেখে নির্দিষ্ট একটা হাতিকে চিনতে পারে মাতাউ?’ ক্রুডিয়ার সুরে অবিশ্বাস।

‘পাঁচশো মোষের পালের ওপর শুধু একবার চোখ বুলিয়ে নিজের চেনা মোষটাকে করে, বললো শন। ‘মাতাউ ট্রাকার নয়, জাদুকর। দু’বছর পর শুধু ওটার পায়ের ছাপ দেখে চিনতে পারবে,’ ক্রুডিয়াকে সামান্য একটু বাড়িয়ে বললো শন।

চলার পথে ছোট ছোট সব সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়লো। সাঁাৎ করে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিলো একটা পুরুষ কুড়ু, ভূতের মতো ধূসর তার রঙ, পিঠে কুঁজ আর কেশর, ফুর প্যাচ-এর মতো বাঁকা শিং ছায়ার ভেতরও চকচক করছে। রাত্রি কালীন টহল থেকে ফেরার পথে ওদের চোখে ধরা পড়ে গেলো একটা গন্ধনকুল বা ঝটাশ, সোনালি গায়ে ফোটা ফোটা দাগ, ঠিক যেনো চিতাবাঘের খুদে সংস্করন, ঝয়েরি ঘাসের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, চোখ ভরা কৌতূহল আর বিস্ময়। টয়োটার আগে আগে অনবরত লাফ দিয়ে ছুটছে একটা ক্যান্ডারু র্যাট। ঝাঁক ঝাঁক মোরগ, মাথায় হলুদ ঝুঁটি, টয়োটার পাশে ঘাসবনের ভেতর ছুটোছুটি করছে। এটা কি ওটা কি বলে কাউকে বিরক্ত করছে না ক্লডিয়া, পশুপাখি গুলোকে চিনতে পারছে সে, সেই সাথে তার আনন্দের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে বহুগুন। সূর্য ওঠার সামান্য আগে পাথুরে একটা পাহাড়ের গোড়ায় গাড়ি থামালো শন। বনভূমির মাঝখান থেকে হঠাৎ মাতাচাড়া দিয়েছে পাহারটা। ভারি কাপড়চোপড় খুলে খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো ওরা। তিনশো ফুট উঁচু, কোথাও একবার থামলো না কেউ, হাঁপানোর শব্দটা গোপন করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেলো ক্লডিয়া।

সময়ের চুলচেরা হিসেব করা আছে শনের, পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছলো ওরা, আর সেই সাথে দূর বনভূমি থেকে লাফ দিয়ে উঠে এলো সূর্য, নাটকীয় রঙ আর উজ্জলতায় ভাসিয়ে দিলো চারদিক।

আদিগন্ত বিশাল সবুজ বনভূমি, এখানে সেখানে সোনালি ঘাস মোড়া ফাঁকা মাঠ, দুর্গ আকৃতির পাহাড়, সব একসাথে ধরা পড়লো ওদের চোখে, সূর্যের প্রথম আলোয় উদ্ভাসিত।

গায়ের সোয়েটার খুললো ওরা, পাহাড় চূড়ার কিনারায় বসলো, চোখে বাইনোকুলার তুলে তাকালো নিচের বনভূমির দিকে। ওদের পিছনে ঝাবারের বাস্তু খুলে নিজের কাজে মন দিলো জোব, বাস্তুটা সে কাঁধে করে বয়ে এনেছে। এক মিনিটের মধ্যে আগুন জেলে ফেললো, বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো ডিম আর মটরশুটির গন্ধ, জিতে পানি এসে গেলো ক্লডিয়ার।

ব্রেকফাস্টের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা, এই ফাঁকে আঙ্গুল তুলে দেখাল শন। 'ওদিকে মোজাম্বিক সীমান্ত, দ্বিতীয় পাহাড়টার খানিক সামনে, এখান থেকে সাত কি আট মাইল।

'মোজাম্বিক,' বিড়বিড় করলো ক্লডিয়া, চোখে বাইনোকুলার। 'শব্দটার মধ্যে অদ্ভুত একটা ছন্দ আছে, তাই না? ঝারি রোমান্টিক লাগে আমার।'

'দেশটার অবস্থা জানলে একথা বলতে না। দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক হাঙ্গামা, ক্ষমতার কোন্দল, অর্থনীতি নিয়ে অহেতুক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অযোগ্যতা-তৃতীয় বিশ্বের আর সব দেশের মতো মোজাম্বিকের ধ্বংসের পথে এনে ফেলেছে।

মহামারী আর গৃহযুদ্ধ নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেছে। আগামী পাঁচ বছরে শুধু এইডসেই মারা পড়বে আরো দশ লাখ মানুষ।

‘ব্রেকফাস্টের আগে এমন কিছু শুনতে চাইনা যাতে মন খারাপ হয়,’ বললো ক্লডিয়া। ‘আর কত দেরি জোব?’

প্রত্যেক হাতে একটা করে পেট ধরিয়ে দিলো জোব, তাতে সেন্দ্র মটরশুটি, ডিম আর ফ্রেঞ্চ ব্রেড। সবশেষে মগভর্তি কড়া কফি। খাওয়ার ফাঁকে বনভূমির ওপর চোখ বুলানো চলছে। ‘কুক হিসেবেও তুমি মন্দ নও, পেটা শরীর, চাঁদ আকৃতির মুখে বংশগত ম্যাটিবেল বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। জোব।’

‘ধন্যবাদ, ডেন না,’ শান্ত গলায় জবাব দিলো জোব। উচ্চারণে সামান্য ত্রুটি থাকলেও ভালোই ইংরেজি বলে সে। লম্বা-চওড়া শরীর।

‘তুমি ইংরেজি শিখলে কোথেকে?’

জবাব দেয়ার আগে ইতস্তত ভঙ্গিতে শনের দিকে একবার তাকালো জোব। ‘আর্মিতে থাকতে, ম্যাম।’

‘স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যালানটিন্ স্কাউট সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ছিলো ও, আমার সাথে’ বললো শন।

‘ক্যাপ্টেন!’ বিস্মিত হলো ক্লডিয়া। ‘আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...’ তাড়াতাড়ি থামলো সে, চেহারায়ে অপ্রতিভ ভাব।

‘বুঝতে পারছো না সেনাবাহিনীর একজন সাবেক ক্যাপ্টেন কেন আমার কনসেশনে কাজ করছে। এই তো?’ মৃদু হাসলো শন। ‘কারগটা আর কিছুই নয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় পরস্পরের প্রতি ঋণী হয়ে পড়ি আমরা।’

শেডরাখ, দ্বিতীয় বন্দুকবাহক, ওদের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে বসে আছে। ওখান থেকে উত্তরদিকটা ভালো দেখতে পাচ্ছে সে। হঠাৎ শিস দিয়ে একটা হাত তুললো শেডরাখ। ডিম মাখানো রুটির শেষ টুকরোটা মুখে পুরে খালি পেটটা জোবের হাতে ধরিয়ে দিলো শন, বললো, ‘ধন্যবাদ জোব।’ শেডরাখের পাশে চলে এলোও। নিচের বনভূমির দিকে তাকাল ওরা।

‘কি?’ ওদের পেছনে অধৈর্য হয়ে উঠলেন ক্যাপো।

‘হাতি,’ বললো শন, বাপ-মেয়ে দু’জনেই লাফিয়ে উঠলো, ছুটে এলো ওদের দিকে।

‘কোথায়? কোথায়?’ জানতে চাইলো ক্লডিয়া। ‘বড়?’ প্রশ্ন করলেন ক্যাপো। ‘দাঁতগুলো দেখতে পাচ্ছেন? সেটাই কি?’

‘অনেক দূরে প্রায় দু’মাইল ওটা কিনা বলা মুশকিল।’ হাত তুলে দেখালো শন, গাছপালার মধ্যে অস্পষ্ট ও ধূসর একটা ভাব ছাড়া দেখার কিছুই নেই।

হাতির মতো বিশাল একটা প্রাণী দেখতে পাওয়া এতো কঠিন? মনে মনে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল ক্লডিয়া। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর, হাতিটা যখন সামান্য নড়লো, আকৃতিটা অস্পষ্টভাবে চিনতে পারলোস।

‘আপনার কি ধারণা? জানতে চাইলেন ক্যাপো। ‘ওটা আমাদের তুকুটেলো হতে পারে?’  
‘হতে যে পারে না, তা নয়,’ বললো শন। ‘তবে সম্ভাবনা কম।’

তুকুটেলো। শিকারীর দেয়া নাম। ক্যাম্প-ফায়ারের ধারে বসে ওদের কথা শুনেছে ক্লডিয়া। গোটা আফ্রিকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ জুড়ে হাতে গোনা অল্প যে ক’টা কিংবদন্তীতুল্য প্রাণী এখনো বেঁচে আছে, তাদের মধ্যে তুকুটেলো অন্যতম। একটা পুরুষ হাতি, এককটা গজদন্তের ওজন একশো পাউন্ডের বেশি। শেষ বারের মতো তার বাবার আফ্রিকায় আসার পিছনে তুকুটেলোই প্রধান কারণ। একবার, মাত্র একবারই তুকুটেলোকে নিজের চোখে দেখেছেন তিনি। তিন বছর আগের কথা, সে-সময় আফ্রিকার এদিকটায় কনসেশন ভাড়া নিয়ে সৌখিন শিকারীদের সহায়তা করছিল শন কোটনি। রিকার্ডোকে নিয়ে পাঁচদিন অনুসরণ করে ও হাতিটাকে। শরের ছাপ ধরে ওদেরকে একশো মাইল হাঁটিয়ে আনে মাতাউ, তারপর ওরা হাতিটার দেখা পায়। ঝোপের ভেতর চুপিসারে এগোয় দলটা, প্রকাশ দেহী তুকুটেলোর বিশ গজের মধ্যে চলে আসে। প্রাচীন বৃড়োটা গুড় দিয়ে মারুলা গাছের ঝল ছিড়ে খাচ্ছিল। আড়াল থেকে তারা ছিন্ন ভিন্ন দেহের প্রতিটি ভাঁজ পরীক্ষা করে দেখলো, এতো কাছ থেকে যে লেজের অবশিষ্ট সামান্য ক’টা লোম, ইচ্ছে করলে স্পন্দনা যেতো। কারো মুখে কথা ছিলো না, তুকুটেলোর দাঁত জোড়ার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল ওরা।

তুকুটেলোর ওই দাঁত বা আইভরি নিজের ট্রফি হিসেবে পাবার বিনিময়ে যে কোনো মূল্য দিতে রাজি ছিলেন ক্যাপো। ফিসফিস করে শনকে প্রশ্ন করেন তিনি, ‘ওটাকে পাবার কোনো উপায় কি নেই?’ লক্ষ্য করলেন, মাথা নাড়ার আগে ইতস্তত করলো শন।

‘না, ক্যাপো। তুকুটেলোকে আমরা ছুঁতে পারি না।’

তুকুটেলোকে ছোঁয়া সম্ভব নয়, কারণটা জানতেন ক্যাপোও। তুকুটেলোর গলায় একটা নাইলন পরানো আছে, হেভী ডিউটি ট্রাক-টায়ারের মতো শক্ত, কলারের মত ঝলছে একটা ট্রান্সমিটার। সরকারী হাতি গবেষণা প্রজেক্টের তরফ থেকে একদল লোক হেলিকপ্টার নিয়ে ধাওয়া করে তুকুটেলোকে, তাকে অজ্ঞান করার পর কলারটা পরিয়ে দেয়া হয় গলায়। সেই সাথে গবেষনার জন্যে মনোনীত করা প্রাণীদের তালিকায় স্থান পায় সে। এতে করে বৈধ শিকারীদের নাগালের বাইরে চলে আসে সে। আইভরি পোচারদের হুমকি আগের মতোই থেকে গেছে বটে, কিন্তু লাইসেন্সধারী কোনো শিকারী আইনত তুকুটেলোকে শিকার করতে পারবে না।

ওষুধের প্রভাবে তুকুটেলো যখন অজ্ঞান, সরকারী পশু-চিকিৎসক ডা. গ্লিন জোসেফ তার দাঁত জোড়ার মাপ নেন। রিপোর্টটা বাইরে প্রকাশ পাবার কথা নয়, কিন্তু ডা. জোসেফের তরুণী সেক্রেটারির সাথে শনের সুসম্পর্ক থাকায় তথ্যটা জানতে কোনো অসুবিধা হয়নি ওর। রিপোর্টের একটা কপি শনের জন্যে ডুপ্লিকেট করে সে। প্রাচীন বৃড়োর ওপর চোখ রেখে ফিসফিস করে বিকার্ডো জানায় শন, ‘ডা. জোসেফের হিসাব

মতে একেটা দাতের ওজন হবে একশো ত্রিশ পাউন্ড, অপরটা কয়েক পাউন্ড হালকা।' ক্ষুধার্ত চোখে, একদৃষ্টে, তুকুটেলার দাঁতগুলো দেখছে ক্যাপো। ঠোঁটের কাছে ওগুলো শনের উরুর সমান মোটা, কোথাও টোল খায়নি বা ডেবে যায়নি।

লতাপাতার রস লেগে দাঁত দুটো প্রায় কালো হয়ে গেছে। দাঁতের ডগা গোল ও নিটোল, ডা. জোসের ভাষ্য অনুসারে। বাম দাঁতটা আট ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা, ডান দিকেরটা আট ফুট সোয়া ছয় ইঞ্চি-ডগা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত। শেষে তুকুটেলাকে জঙ্গলে এক রেখে ফিরে আসে ওরা।

এরপর একদিন, ডা. জোসের স্বর্ণকেশী সেক্রেটারীর সঙ্গে একান্তে রাত যাপনের এক পর্যায়ে মেয়েটা শনকে জানালো, 'জানো কি, তুকুটেলা তার কলার ছিঁড়ে ফেলেছে?'

বিছানায় নগ্ন শুয়ে ছিলো শন। ঝট করে উঠে বসে বললো, 'ঠিক জানো?'

'রেডিও ডিরেকসন ফাইণ্ডার সহ কলারটা পাওয়া গেছে একটা মেসাসা গাছের ডালে।'

শন পরদিনই টেলিগ্রাম করে আলাস্কায়।

হারারেতে পৌঁছে আলাস্কা থেকে রিকার্ডো মনটেরোর উত্তর পায় শন। ক্যাপো জানান, 'আমি আসছি। আমার জন্যে পুরোদস্তুর একটা সাফারি বুক করুন। পয়লা জুলাই থেকে পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত। ওই দানবটাকে আমি চাই। ক্যাপো।'

এই মুহূর্তে, পাহাড়চূড়ার কিনারায় দাঁড়িয়ে, দূর বনভূমির গায়ে ধূসর হাতির অস্পষ্ট নড়াচড়া দেখে, উত্তেজনায় কাঁপছেন তিনি।

অবাক বিস্ময়ে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে ক্লডিয়া। কে এই ভদ্রলোক, একে তো ক্লডিয়া চেনে না। দ্রুত ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্লডিয়া তাকে রাতারাতি দশ মিলিয়ন ডলার লাভ করতে দেখেছে, দেখেছে লাস ভেগাসের জুয়ার টেবিলে বসে এক ঘন্টার ভেতর পাঁচ মিলিয়ন ডলার হারতে, একফোঁটা উত্তেজিত হননি। কিন্তু এখানে তিনি রীতিমতো কাঁপছেন, যেনো একটা স্কুল ছাত্র কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেয়ার পর আজই পথম তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে নিভৃত দেখা করতে যাবে। অকস্মাৎ একরাশ ভালোবাসা আর মায়া উথরে উঠলো ক্লডিয়ার বুকে। এতোদিনে বুঝতে পারছে সে, এই শিকার অভিযান বাবার জন্যে কি অর্থ বহন করছে। তার মনে হলো, সে বোধ হয় একটু কঠিন আচরণই করে ফেলেছে। এটাই তাঁর জীবনের শেষ চাওয়া, পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে। ক্লডিয়ার ইচ্ছে হলো বাবাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, তার বুকে মুখ ঘষে, কানে কানে বলে, 'আমি দুঃখিত বাবা! তোমাকে তোমার শেষ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চাইছিলাম বলে সত্যি আমি দুঃখিত।'

রিকার্ডো মনটেরো এমনকি মেয়ের উপস্থিতি সম্পর্কেও সচেতন নন এই মুহূর্তে। 'ওটা তুকুটেলা হতে পারে,' কথাটা আবার বললেন তিনি, আশঙ্কা মনে, যেনো চেষ্টা করছেন তাঁর আশটাকে মন্ত্রবলে বাস্তবে পরিণত করার।

কিছু মাথা নাড়লো শন। ‘আমার চারজন ট্র্যাকার নদীর ওপর চোখ রাখছে। তুকুটোলা নদী পেরুলে ভাদের চোখে ধরা পড়বে। তাছাড়া, এখনো তার আসার সময় হয়নি। পানির গর্তগুলো না শুকানো পর্যন্ত উপত্যকা ছেড়ে নড়বে না সে। আরো ধরুন এক সপ্তা বা দশ দিন।’

ট্র্যাকারদের হয়তো বোকা বানিয়েছে,’ শনের ব্যাখ্যা মানলেন না ক্যাপো। ‘নিচের গুটা তুকুটোলা হওয়া অসম্ভব নয়।’

‘নিচে নেমে আমরা তো একবার দেখবোই,’ বললো শন। রিকার্ডোর ব্যাকুলতা তার মেয়েকে বিস্মিত করলেও, শন বিস্মিত হলো না। এই আবেগ ওর পরিচিত, এর অর্থ ওর জানা আছে, ক্যাপোর মতো আরো বহু লোকের মধ্যে লক্ষ্য করেছে জিনিসটা-তারা সবাই ক্যাপোর মতোই ক্ষমতাবান, আক্রমণাত্মক, জীবনযুদ্ধে সফল মানুষ, যারা তাঁদের সহজাত প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার বা গোপন রাখার চেষ্টা করেন না। শিকার করার জরুরী প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি মানুষ তার আত্মা থেকে উপলব্ধি করে, কেউ কেউ ব্যাপারটা চেপে রাখে বা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, কিছু লোক রক্তপাতের বিকল্প হিসেবে বেছে নেয় ক্রিকেট বা টেনিস বলকে, আর রিকার্ডো মনটোরের মতো ব্যক্তিরা তাঁদের ঝোঁকটাকে লাগামছাড়া হতে দেন, ধাওয়া ও হত্যা করার চরম পুলক ছাড়া আর কিছুতে সন্তুষ্ট হন না।

‘শেডরাখ, ক্যাপো সাহেবের .৪১৬ রাইফেলটা আনো,’ নির্দেশ দিলো শন। ‘জোব, পানির বোতল নিতে ভুলো না। মাতাউ, চলো।’

পাহাড় থেকে নেমে মন্থরবেগে ছুটন্ত একটা ঝাঁককে পরিণত হলো দলটা, পায়ের ছাপ বোজার জন্যে সবার আগে রয়েছে মাতাউ, মাতাউর পিছনে জোব আর শন, ওরা দু’জনেই প্রায় অলৌকিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারি, সামনের বনভূমির ওপর চোখ বুলাবে। নিয়ম অনুসারে ক্রায়েন্টরা রয়েছে ঝাঁকের মাঝখানে, তাদের ঠিক পিছনে শেডরাখ, হাতে রিগবি, প্রয়োজনে সময় ক্যাপোর হাতে তুলে দেবে সেটা। ছুটলেও, বিরাট থালা আকৃতির পায়ের ছাপ খুঁজে বের করতে প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেলো মাতাউর। আশপাশে বহু গাছপালার ডাল ভাঙা দেখলো ওরা, এই পথ দিয়ে খেতে খেতে এগিয়েছে হাতিটা। ছাপটার সামনে দাঁড়ালো মাতাউ, হঠাৎ পিছন ফিরলো, আকাশের দিকে মুখ তুলে কোটরের ভেতর চোখের মণি ঘোরালো, তারপর বাঁশীর মতো তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার ছাড়লো একটা। এটা তার হতাশার বহিঃপ্রকাশ।

‘তুকুটোলা নয়। গুটা এক দাঁতঅলা একটা পুরুষ,’ ওদেরকে জানালো শন। ‘আজ সকালে আমরা তার পায়ের ছাপ দেখেছি। ঘুরে এদিকে চলে এসেছে।’

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো ক্লডিয়ার। আশাভঙ্গের বেদনায় বোকা বোকা লাগছে তাঁকে।

টয়োটার কাছে ফেরার পথে কেউ কোনো কথা বললো না। ফেরার পর নরম প্লায় শন বললো, ‘আপনি জানেন ব্যাপারটা এতো সহজ নয়, তাই না, ক্যাপো?’ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলো দু’জন।

ক্যাপো বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ধাওয়াটাই তো আসল। শিকার করার পর শুধুই মাংস ওটা।'

'তুকুটেলা আসবে,' তাঁকে কথা দিলো শন। 'এটা তার রুটিন টহল। নতুন চাঁদ ওঠার আগেই আসবে সে। তবে তার আগে সিংহটা রয়েছে। চলুন টোপের কাছে যাই, দেখে আসি মহাশয় আমাদেরকে বাধিত করবেন কিনা।'

আরো বিশ মিনিট গাড়ি চালিয়ে মাচা আর টোপের নিচে, শুকনো নদীর তলায় থামলো ওরা। সাদা বালির ওপর টম্বোটা রেখেপায়ে হেঁটে এগোলো, পাড় বেয়ে ওপরে ওঠার সময় কাল রাতের কথামনে পড়ে যাওয়ায় শিউরে উঠলো কুডিয়া। মাচার পিছনে সিংহীদের পায়ে চাপ দেখতে পেলো সে। পরমুহূর্তে শন আর গানবেয়ারাররা ভীষণ উত্তেজিত ভাবে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি শুরু করলো, চড়ুই পাখির মতো অনবরত কিচিরমিচির করছে মাতাউ।

'কি ব্যাপার?' জানতেচাইলো কুডিয়া, কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিলো না। দলের সাথে তাকার জন্যে রীতিমতো ছুটতে হলো তাকে, পুরুষরা সবাই জঙ্গল কেটে তৈরি করা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে হন হন করে এগোচ্ছে, সামনেই বুনা, ডুমুর গাছ থেকে ঝুলছে মোষের ধড়টা।

'কি ঘটছে আমাকে বলবে কেউ?' আবেদন জানালো কুডিয়া, টোপটির কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে থাকলো সে। পচামাংসের গন্ধে পেট থেকে বাড়িভুঁড়ি স্রব বেরিয়ে আসার গোগাড় হয়েছে। তবে পুরুষরা ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যই করলো না, অবশিষ্ট ধড়ের নিচে জড়ো হলো সবাই। দূর থেকেও পার্থক্যটুকু নজরগড়ালো না। কুডিয়ার, টোপ থেকে মাংসের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। প্রায় অর্ধেকটাই নেই।

ধড়টা পরীক্ষা করছে শন আর গানবেয়ারাররা, ওদিকে ডুমুর গাছের গোড়ায় কি যেনো খুঁজছে মাতাউ। শিকারী হাউণ্ডের মতো সে যেনো মাটি ঝঁকছে বলে মনে হলো কুডিয়ার। মুখ থেকে দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে আসছে, যেনো আনন্দমুখর একটা শিশু। ঝুলন্ত মোষের পাজরের কাছে ঝালরের মতো ফাঙ্কি ফালি হচ্ছে আছে মাংস, এটা ফালি থেকে দু'আঙুলে কি যেনো তুলে নিলো শন, জিনিসটা দেখালো রিকার্ডো, তারপর দু'জনেই পরম সন্তুষ্টির সাথে হাসতে শুরু করলো।

'কেউ তোমরা আমার সাথে কথা বলবে?' রাগে মজ্জিতে পা ঠুকলো কুডিয়া।

তার দিকে ফিরে হাসলো শন। 'কাছে এসো তাহলে, দূরে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নাটকীয় ভঙ্গিতে দু'আঙুলে নাক টিপে, ধীরে ধীরে এগোলো কুডিয়া। ডান হাতটা উঁচু করে ধরলো শন, কাছে এসে ওর হাতের তালুতে একটা চুল দেখতে পেলো কুডিয়া, প্রায় ওর মাথার চুলের মতোই লম্বা আর কালো।

'কি ওটা?'

শনের, হাতের তালু থেকে চুলটা নিলেন রিকার্ডো, দু'হাতের চারটে আঙুল দিয়ে চুলটাকে লম্বা করে ধরলেন। কুডিয়া লক্ষ্য করলো, উত্তেজনায় তার বাবার হাতের

রোম দাঁড়িয়ে পেছে, পাচ ইটালিয়ান, চোখে অদ্ভুত একটা আলো বিক করে উঠলো উত্তর দেয়ার সময়। ‘কেশরের চুল!’ খপ করে মেয়ের হাত ধরলেন তিনি ডুমুর গাছের গোড়ায় টেনে নিয়ে এলেন ভাকে। ‘দেখ, মাতাউ কি খুঁজে পেয়েছে।’

সাম্বল্যের গর্বে দু’কান পযন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে খুদে ট্র্যাকারের নিঃশব্দ হাসি, ক্ষতবিক্ষত মাটির দিকে একটা আঙুলতাক করলো সে। পাঁচটা বাচ্চা আর দুটা সিংহীর এলোমেলো হাঁটাচলায় মিহি দুলায় পরিণত হয়েছে মাটি, তাদের পায়ের ছাপ আলাদা করে চেনার উপায় নেই, কিন্তু তারপরও একজোড়া নিখুঁত ছাপ স্পষ্টভাবে চেনা গেলো। অন্যান্য অস্পষ্ট দাগগুলোর চেয়ে আকারে দ্বিগুণ সেটা, দেখামাত্র আবার আতঙ্কের হিমশীতল ছোঁয়া অনুভব করলো ক্লডিয়া। যার পায়ের ছাপ এতো বড় হতে পারে সেটা একটা দানব না হয়ে যায় না।

‘কাল রাতে, সিংহীরা আমাদের তাড়া করার পর, এসেছিল সে। চাঁদ না ডোবা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে, এসেছে রাতের সবচেয়ে অন্ধকার সময়টায়,’ ব্যাখ্যা করলো শন। ‘চলেও গেছে ভোর হবার আগে। তবে যাওয়ার আগে পেট ভরে মাংস কেথে ভোলেনি। আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম, আমাদের দানব ভারি ধূর্ত।’

‘সিংহ?’ জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া।

‘সিংহ, তবে সাধারণ কোনো সিংহ নয়,’ মাথা নাড়লেন রিকার্ডো মনটেরো। ‘ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেট সত্যি তাহলে এসেছিল।’

ঘুরলো শন, নিজের লোকদের ইঙ্গিতে ডাকলো। একটা বৃন্ত রচনা করে ওকে ঘিরে ধরলো জোব, শেডরাখ আর মাতাউ; শিকার অভিযানের প্ল্যান করার সময় বেমালুম ভুলে যাওয়া হলো ক্যাপো আর ক্লডিয়ার উপস্থিতি। বিশদভাবে আলোচনা করলো ওরা, সিদ্ধান্ত নিলো কি কি কৌশল অবলম্বন করা হবে, প্রতিটি সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামালো। প্রায় এক ঘন্টা পর দাঁড়ালো শন, ছায়ায় বসে থাকা ক্যাপো আর ক্লডিয়ার কাছে হেঁটে এলো। দু’জনের মাঝখানে বসলো ও, অভিযানের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলো। পুরনো মাচাটা ভেঙে গেছে, ওটাকে সন্দেহের চোখে দেখবে। নতুন মাচা আর নতুন টোপ দরকার হবে। তবে দিনের বেলা ভাকে টোপের কাছে টেনে আনা প্রায় অসম্ভব। শুকনো একটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে মাটিতে আঁকিবুঁকি আঁকলো শন, কথা বলার সময় ক্যাপোর দিকে তাকালো না। ‘বন্ধুত্বের খাতিরে খানিকটা নিয়ম ভাঙতে রাজি আছে আমি, ক্যাপো।’

‘বলুন, আমি শুনছি।’

‘ওটাকে পাবার বোধহয় একটাই উপায় আছে,’ নিচু গলায় বললো শন। ‘জ্যাক-লাইট।’

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। জ্যাক-লাইট মানে কি না জানলেও, ক্লডিয়া বুঝতে পারলো শিকারী তার বাবাকে বেআইনী কোনো কাজে প্ররোচিত করছে। শনের ওপর রাগ হলো তার, কিন্তু নাক গলানোর সাহস পেলো না। মনে মনে প্রবলভাবে কামনা করলো, শিকারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন বাবা।

অবশেষে মাথা নাড়লেন ক্যাপো। 'না, কাজটা আমরা নিয়ম ধরেই করি, আসুন।'

'চেষ্টা করা যেতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকালো শন। 'কিন্তু টোপের কাছে গুলি খেয়ে একবার আহত হয়েছে সে। কাজটা সহজ হবে না।' আবার নিস্তব্ধতা নেমে এলো। এক মিনিট পর আবার মুখ খুললো শন। 'সিংহ নিশাচর প্রাণি। তার সময়ই হলো রাত। আপনি সত্যি যদি ওটাকে চান, গুলি করার সুযোগ পাবেন শুধু রাতেই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন ক্যাপো। 'ওটাকে আমার পেতেই হবে, পাওয়াটা সত্যি খুব জরুরী, তবে এতো জরুরী নয় যে অশ্রদ্ধার সাথে খুন করতে হবে।'

দাঁড়ালো শন। 'এটা আপনার সাফারি, ক্যাপো,' শান্তভাবে একমত হলো। 'আমি চাই আপনি জানুন, নিয়ম ভাঙার যে-প্রস্তাবটা দিয়েছি সেটা একা শুধু আপনাকে ছাড়া দুনিয়ার আর কাউকে আমি দেবোনা।'

'আমি জানি,' রিকার্ডো মনটেরো নরম সুরে বললেন। 'ধন্যবাদ, শন।' ডুমুর গাছের কাছে ফিরে গেলো শন, সহকারীদের সাহায্য নিয়ে টোপটা খানিক নিচে নামাতে হবে, পশুগুলো যাতে নাগাল পায়।

'জ্যাক-লাইট কি, বাবা?' শন সরে যেতেই জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া।

'স্পটলাইটের আলো ফেলে কোনো পশুকে শিকার করা। কাজটা বেআইনী।'

'বাস্টার্ড! তিভ্জকঠে বললো ক্লডিয়া।

মাথা নাড়লেন ক্যাপো, নরম সুরে বললে 'ওকে তুই ভুল বুঝছিস। ওর প্রস্তাবটা অর্থ হলো, আমাকে ভালোবাসে, আমার জন্যে সহজ করে দিতে চায় কাজটা। শুধু আমার জন্যে নিজের লাইসেন্স হারবার খুঁকিও নিতে চাইছে, স্বেচ্ছায়।'

'তুমি প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করার আমার গর্ব হচ্ছে, বাবা; কিন্তু যে একটা বাস্টার্ড তাকে কোনো সন্দেহ নেই।'

'তুই বুঝবি না,' ক্যাপো বললেন। 'তোর বোঝার কথাও নয়।' দাঁড়ালেন তিনি, দূরে সরে গেলেন, তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে অপরাধবোধের একটা খোঁচা অনুভব করলো ক্লডিয়া। সে বোঝে। বোঝে এটাই বাবার জীবনের শেষ সিংহ, এবং মেয়ে হয়ে সে তার আনন্দটুকু নষ্ট করে দেয়ার ভূমিকা নিতে চাইছে। বিষম একটা দ্বন্দ্ব পড়ে গেছে সে। একদিকে বাবার প্রতি নিখাদ ভালোবাসা, আরেক দিকে অপরাধ সুন্দর প্রাণিগুলোর মঙ্গলচিন্তা ও ব্যক্তিগত নীতিবোধ, কোন্টাকে বাদ দিয়ে কোন্টাকে প্রশয় দেবে সে?

এক এক করে বেশ ক'টা দিন কেটে গেলো। বুড়ো সিংহটাকে বৈধভাবে শিকার করার চেষ্টা চলছে। আরেকটা বক্সা মোষ চিহ্নিত করলো শন, ক্যাপো সেটাকে গুলি করে মারলেন। প্রতিদিন হয় টোপ নাহয় মাচা নতুন জায়গায় সরালো শন, সন্দেহমুক্ত মনে সিংহটা যাতে দিনের বেলা আসে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরও এক ঘন্টা করে মাচার অপেক্ষা করে ওরা, তারপর একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরে আসে

ক্যাম্পে। পরদিন সকালে গিয়ে দেখে, রাতে ঠিকই এসেছিল সিংহ, পেটভরে মাংস খেয়ে গেছে, ওদেরকে ব্যঙ্গ করার জন্যে স্কেলে রেবে গেছে কেশরের দু'একটা চুল আর পায়ের ছাপ।

কৌশল বদল করলো শন। লোহার চেইন ছিল করে টোপটা খানিক নিচে নামালো, যাতে সিংহী আর বাচ্চাগুলো সহজেই অবশিষ্ট মাংসের নাগাল পায়। নদীর পাঁচশো মিটার উজানে তাজা আরেকটা টোপ ঝোলানো হলো, বেশ অনেক উঁচুতে, চেষ্টা করলে একা শুধু বিশালদেহী সিংহটা নাগাল পাবে। কাঁধ সমান উঁচু ঘাসের মাঝখানে নিম্নসঙ্গ একটা গাছ থেকে ঝুঞ্জছে টোপটা। শনের আশা, বাচ্চা আর সিংহীরা বিরক্ত করবে না। তেবে দিনের কোলা আসতে পারে। শুকনো নদীর ওপারে একটা সেক্সন গাছের উঁচু ডালে মাচা তৈরি করা হলো, সিংহটা যাতে আরো নিরাপদ বোধ করে। মাটি থেকে পনেরো ফুট ওপরে থাকলো মাচাটা, ওখান থেকে নদীর সাদাবালির ওপর দিয়ে টোপটা পরিষ্কার দেখা যায়। নিম্নসঙ্গ গাছটার চারধারের ঘাস খুব কমই কাটলো শন, জলো আড়াল পেয়ে স্বস্তি বোধ করবে হাইকডলিস। শুধু একটা সুড়ঙ্গ তৈরির জন্যে যতোটুকু ঘাস কাটা দরকার ততোটুকু কাটা হলো, ওই সুড়ঙ্গপথেই ধড়টাকে দেখতে পাচ্ছে ওরা।

দুপুর থেকে শুরু হলো অপেক্ষার পালা। সময় কাটানোর জন্যে একটা পেপারব্যাক আনার অনুমতি দেয়া হয়েছে ক্রুডিয়াকে, তবে শন শর্ত দিয়েছে 'পাতা ওল্টানোর আওয়াজ যেনো না হয়।'

প্রথমে এলো সিংহী আর বাচ্চাগুলো। টোপ থেকে মাংস খাওয়ায় এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, আসার পথে কোনো রকম সতর্কতা অবলম্বন করলো না। প্রথমে এলো নতুন টোপের কাছে, দুই সিংহীই লাফ দিয়ে মাংসের নাগাল পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। সুবিধে হচ্ছে না দেখে পুরনো, প্রায় নিঃশেষিত টোপের কাছে ফিরে গেলো তারা। বালির আঘাতে দস্যুরানীর চোখে ক্ষত দেখা দিয়েছে, ফুলে গেছে চোখের পাতা, পানি ঝরছে।

ম্যাচা থেকে পুরনো টোপটা পাঁচশো মিটার দূরে, তবু সিংহীদের গরগর আওয়াজ আর হাড়ে কামড়বসানোর শব্দ পরস্পর শুনতে পেলো ওরা। বিকেলের দিকে শান্ত হয়ে এলো পরিবেশ, বোঝা গেলো বিশ্রাম নেয়ার জন্য ছায়ায় গিয়ে বসেছে সিংহীরা।

সূর্য ডোবার আধঘন্টা আগে হঠাৎ করে থেমে গেলো বাতাস। গভীর জঙ্গলে রোমহর্ষক আফ্রিকান নিস্তব্ধতা নেমে এলো। চারপাশে যতোদূর দৃষ্টি চলে, একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। নদীর কিনারা ধরে গজিয়ে ওঠা ঘাসের সমুদ্র সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থির। নিস্তব্ধতা এতোই গাঢ় হয়ে উঠলো যে হঠাৎ প্রায় চমকে উঠে বই, থেকে মুখ তুললো ক্রুডিয়া। সতর্কার সাথে, ধীরে ধীরে বইটা বন্ধ করলো সে, কান পাতলো নিস্তব্ধতার ভেতর।

তারপর হঠাৎ নদীর দূর পাড় থেকে ডেকে উঠলো একটা হুম্মি। ছাকটা এতো স্পষ্ট আর জোরালো যে নিজের অজান্তে বাঁকি খেলো ক্রুডিয়া। সাথে সাথে শনের আলতো ছোঁয়া অনুভব করলো নিতম্বে। ক্রুডিয়া শুনতে পেলো তার বাবা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন, যেনো এই মাত্র কোথাও থেকে দৌড়ে এলেন।

এতোক্ষণে ভারি নিস্তর্রতার একটা ওজন অনুভব করছে ওরা, মনে হলো পৃথিবী যেনো তার নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে। ক্রুডিয়া শুনতে পেলো ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ছেন বাবা। আড়চোখে তাঁর দিকে তাকালো সে। ইস্বর, পাপার মতো সুদর্শন পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। -ভাবলো ক্রুডিয়া। কপালের দু'পাশেরুপালি ডানা বাদদিলে তাঁর বয়স ধরার কোনো উপায় নেই- মেদহীন একহারা শরীর, খটখটে, প্রাণচঞ্চল। না, ভেতরের যে শত্রু তার শরীরটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, বাইরে থেকে তার কোনো তৎপরতা এখনো ধরা পড়ে না।

বাবার দৃষ্টি অনুসরণ করে বাইরে তাকালো ক্রুডিয়া। ডান দিকে, নদীর ওপাশে, তাকিয়ে আছেন তিনি, ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় গাছ আর ঘাস যেখানে মিলিত হয়েছে।

বাইরে জীবিত প্রাণি বলতে শুধু একটা পাখিকে দেখা গেলো, উইলো গাছের মগডালে বসে আছে, অনেকটা তোতাপাখির মতো দেখতে ধূসর রঙ। শনের কাছ থেকে শুনেছে ক্রুডিয়া, ওটা কুখ্যাত 'গো অ্যাওয়ে' পাখি, শিকারীদের উপস্থিতি ফাঁস করে দেয়। ঘটনা সত্যি, হঠাৎ পাখিটা 'গ' ওয়ে গ'য়ে স্বরে ডেকে উঠলো। মগডাল থেকে গলাটা লম্বা আর বাঁকা করে উইলো গাছের নিচের ঘাসে কি যেনো দেখছে।

'আসছে সে। পাখিটা তাকে দেখতে পাচ্ছে,' ক্রুডিয়ার কানের পিছন থেকে ফিসফিস করলো শন, কি দেখতে পাবে জানে না, তবু চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলো ক্রুডিয়া।

'ঘাসের ওপর চোখ রাখো,' তাকে গাইড করলো শন, পরক্ষণে ক্রুডিয়ার চোখে একটা আলোড়ন ধরা পড়লো। ঘাসের ডগা কাঁপছে, তারপর কাত হয়ে পড়ছে একদিকে। ঘাসের ভেতর দিয়ে, চুপিসারে, সতর্কতার সাথে কি যেনো একটা এগোচ্ছে। মাঝে মধ্যে, কখনো এক বা দু'মিনিটের জন্যে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে থাকলো ঘাস।

'গন্ধ নিচ্ছে, কোনো শব্দ হয় কিনা শুনছে,' বললো শন। আবার কাঁপতে শুরু করলো ঘাস, কাঁপনটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে টোপ বাঁধা গাছটার দিকে। হঠাৎ ফোঁপানোর মতো একটা শব্দ করলেন ক্যাপো, প্রায় সাথে সাথে আবার ক্রুডিয়াকে সতর্ক করলো শন। আবারও হয়তো লোকটা তার নিতম্বে ছুঁতে যাচ্ছে, ভাবলো ক্রুডিয়া। পরিবর্তে শনের শক্ত আঙুলগুলো চেপে ধরলো তার উরুর ওপর দিকটা।

শনের ছোঁয়া বৈদ্যুতিক ধাক্কার মতো লাগলো, প্রথমবার সিংহটাকে দেখে যে ধাক্কাটা খেলো তারচেয়ে অনেক বেশি জোরালো। ঘাসের মাঝখানে একটা ফাঁক পেরুলো সিংহ, সিংহীদের লাফালাফিতে ওখানকার ঘাস কাত হয়ে আছে। সিংহের

মাথাটা শুধু দেখতে পেলো কুড়িয়া, ঘন ঝোপের মতো ফুলে আছে কেশর, কালো আর কুণ্ডলী পাকানো, হাঁটার তাহলে তালে দুলছে আর ঢেউ খেলছে; পলকের জন্যে কেশরের নিচে ঝিক্ করে উঠতে দেখলো হলুদ চোখে।

এ-ধরনের প্রাণি আগে কখনো দেখেনি কুড়িয়া। ভীতিকর তো বটেই, কিন্তু সেই সাথে... কি বলা যায়, অভিজাত, নাকি রাজকীয়? মাত্র এক পলকের জন্যে দেখতে পেলো সে, ঘাসের আড়ালে আবার হারিয়ে যাবার আগে, কিন্তু ওই এক পলকের দেখাতেই কাঁপন ধরে গেছে শরীরে, গলায় আটকে গেছে দম; এদিকে শনের হাত এখনো তার উরুর ওপর।

হঠাৎ কি হলো বলতে পারবে না কুড়িয়া, তার ইচ্ছে হলো শনের গায়ে হেলান দেয়, ঢলে পড়ে, লোকটাকে জড়িয়ে ধরে উন্মত্তের মতো চুমো খায়। তারপর সে বুঝলো, এটা তার মানের ইচ্ছে নয়, শরীরের কাতরানি। তার বিস্ময়ের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো। শরীরের এই বিপুল ও জোরালো চাহিদা আগে কখনো অনুভব করেনি সে। কি ব্যাপার, লোকটাকে তো আমি এমনকি পছন্দও করি না! নিজেকে তিরস্কার করলো সে। হাঁটুজোড়া কাঁপছে, যৌনাস্ত্রে শিরশিরে, ভেজা একটা অনুভূতি, নড়াচড়ার শক্তি নেই।

ধীরে ধীরে কুড়িয়ার উরু থেকে হাতটা সরিয়ে নিলো শন। কিন্তু যেভাবে নিলো, তা আরো বেশি উদ্ভিপক। মোলায়েম ভঙ্গিতে, আলতো ছোঁয়ায়; অত্যন্ত ধীরে। মুখে রক্তস্রোত অনুভব করতে পারছে কুড়িয়া।

মুহূর্তের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তেজনা, নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলো কুড়িয়া, শিকারীর কোনো প্রভাব নয়। আমার উপযুক্ত নয় সে, ওর প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই। আমি সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী কৌশলী মানুষ পছন্দ করি, কোমলতার ভক্ত, কিন্তু এই লোক নির্দয় ও ভোঁতা। পাষণ্ড।

নদীর ওপারে হঠাৎ প্রবলবেগে আলোড়িত হলো ঘাস, তারপরই শোনা গেলো মাটিতে ভারি একটা দেহ আছড়ে পড়ার শব্দ।

পিছনে, অনুভব করলো কুড়িয়া, হাসি চাপতে গিয়ে সারা শরীর কাঁপছে শনের। মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হলো তার শিকারী বোধহয় তার উদ্দেশ্যেই হাসছে। তারপর শনের ফিসফিসে গলা শুনতে পেলো সে। 'মহাশয় শুলেন। বিশ্বাস হয়, টোপের সরাসরি নিচে বিশ্রাম নিচ্ছে? ব্যাটাচ্ছেলের স্পর্ধা বলিহারি!'

আবার অনেকক্ষণ পর সিংহটাকে দেখলো ওরা, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘাসের ঝসঝস আওয়াজ শোনা গেলো, চারপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, দেকার জন্যে তিনজনই ওরা সামনের দিকে ঝুঁকলো। রাইফেলের বাঁট কাঁধে তুললেন ক্যাপো, টেলিস্কোপ সাইটের লম্বা টিউব দিয়ে সামনে তাকালেন।

হঠাৎ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো সিংহ, ম্লান আকাশের গায়ে বিশাল একটা কাঠামো। লোহার চেইন থেকে শব্দ উঠলো, শব্দ হলো মাংস ছেঁড়ার-খাচ্ছে সে।



‘ঘন্টাখানেক হলো চলে গেছে’, ক্যাপো বললেন। ‘আলো ফোটোর আগেই।’

‘বিড়ালটাকে আপনি একটিমাত্র উপায়ে শিকার করতে পারবেন, ক্যাপো জ্যাক-লাইটের সাহায্য নিতে হবে আপনাকে।’

‘আমি চিরকাল ভাগ্যবান’, নিঃশব্দে হাসলেন রিকার্ডো মনটেরো। ‘এই কাজটাতেও ভাগ্যের সাহায্য পাবো বলে আশা করছি।’ এঞ্জিনের আওয়াজ পেলো ওরা, ওদেরকে নিতে আসছে টয়োটা।

সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্যাম্পে থাকলো ওরা, সারাটা দিন ঘুমালো। সন্ধের পর মাচায় উঠলো বটে, কিন্তু সিংহটাকে কোথাও দেখা গেলো না। সে রাতে নয়, তার পরের রাতেও নয়। হঠাৎ করে যেনো বাতাসে মিলিয়ে গেছে। শন আর ওর সহকারীরা সম্ভাব্য সব রকমভাবে খুঁজলো তাকে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেটের কোনো খবর দিতে পারলো না। এদিকে রিকার্ডো মনটেরো হরিণ বা অন্য কোনো শিকারের প্রতি আগ্রহী নন, তাহলে অন্তত এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হতো না।

বাচ্চাদের নিয়ে সিংহী দুটো নদীর পারে আগের মতোই আসে, বলা যায় প্রায় নিয়মিতই। ‘শন কোর্টনির ফাইভস্টার হোটেল’, সহাস্যে মন্তব্য করলো শন একদিন। ‘বিনা পয়সায় দৈনিক ভোজ।’

দিন বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেটের দেখা নেই।

‘এভাবে হঠাৎ সে গায়েব হয়ে গেলো কেন?’ প্রতিবাদের সুরে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপো।

‘কারণ সে একটা সিংহ-আর কে জানে সিংহরা কখন কি চিন্তা করে!’

\* \* \*

সিংহশিকারের সেইদিনের ঘটনা কুড়িয়া এবং শনের মধ্যকার বিরোধ আরো জমিয়ে তুললো। পরস্পরের সানিধ্যে আরো বেশি করে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে দুজন। পরিষ্কার বৈরী মনোভাব আর হিংসাত্মক তর্ক হচ্ছে অনেক বেশি।

যখন কুড়িয়া শনকে বর্ণবাদী বলে গাল দেয়, সে হাসে।

‘আমেরিকায়— তোমার দেশে, একজন রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বের ক্যারিয়ার শেষ করে দেওয়ার জন্যে কিংবা একজন সফল ব্যবসায়ীর দফারফা করার জন্যে ওই একটা শব্দই যথেষ্ট।’ শন বলেছিলো। ‘ওখানে তোমরা এই গালিকে এতোটাই ভয় পাও, কালোরা ওটাকে ব্যবহার করে। কিন্তু এটা আমেরিকা নয়, ডাকি, আর ওই শব্দটা নিয়ে আমরা এখানে লজ্জিতও নই। এখানে বর্ণবাদ মানে গোত্রবাদ, বিশেষত কালোদের জন্যে। আমরা সবাই এখানে গোত্রবাদী। যদি সত্যিকারের বর্ণবাদ বা গোত্রবাদ দেখতে চাও, তবে নতুন স্বাধীন হওয়া কোনো আফ্রিকান দেশে থেকে দেখো। সাধারণ একজন কালো রাজনীতিবিদকে বলো বর্ণবাদী, এখানে সে ওটাকে প্রশংসা বলে ধরে নেবে। মনে করবে, তুমি তাকে দেশশ্রেমিক বলছো।’

প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলো কুড়িয়া। শনের তাতে বয়েই গেছে।

‘তুমি জানো, আমি একজন দক্ষিণ আফ্রিকান?’ শিকারীর এই কথায় চমকে যায় মার্কিন রুপসী।

‘আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি ব্রিটিশ।’

এই কথায় তাক্ষিল্যের হাসি হাসে শন। ‘আমার ধারণা, আমাদের সরকারে বিরুদ্ধে বিশেষ যে নিষেধাজ্ঞা চলছে, তুমি তা সমর্থন করো।’

‘ঠিক তাই। একজন সুস্থ লোক মাত্রই তা করবে।’ চটপট করে বলে কুড়িয়া।

‘এমনকি যদি ১০ লক্ষ কালো মানুষ না খেয়ে মরে— তাও তোমার কিছু আসে যায় না, তাই না?’ কুড়িয়ার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে শন ব’লে চলে। ‘আমেরিকা যে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ব্যবসা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নিশ্চই তাও সমর্থন করো তুমি?’

‘আমি নিজে ওই প্রচারণায় অংশ নিয়েছি।’ গর্বিত স্বরে কুড়িয়া জবাব দেয়।

‘তারমানে, সমস্ত সাহায্য বন্ধ করে, সমস্ত গীর্জা পুড়িয়ে দিয়ে একটা দেশকে বদলে দিতে চাইছো তোমরা, না? ব্রিলিয়ান্ট!’

‘দ্যাখো— কথা প্যাঁচাবে না—!’

‘আরে, নিজের জন্যে তোমার তো গর্ব হওয়া উচিত! তোমারই দেশের লোকজন উপায়ন্তর না দেখে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের সমস্ত সম্পদ পানির দরে বিক্রি করেছে আমাদের কাছে। আর তারপর ভাগছে আফ্রিকা ছেড়ে। ধন্যবাদ! রাতারাতি বহু লাখোপতির জন্ম দিয়েছো তোমরা আমাদের দেশে। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানো, তাদের একজনও কালো নয়!’

এতোসব তর্কের ভিতরেও পরস্পরের শারিরীক যোগাযোগের কথাটা ভুলে যায়নি ওরা কেউই। বিপজ্জনক কোনো সরীসৃপের মতোই ওটা ঝুলছে ওদের দুজনের মাঝখানে।

প্রায় দু বছর হতে চললো কোনো পুরুষের সঙ্গে শোয়নি কুড়িয়া। এর আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে বেশ কিছুদিন একসঙ্গে ছিলো ও। ভদ্রলোক বিয়ের কথা ভুলতেই অস্বস্তি হত। ওর তরুণ রক্ত এই শয্যা-বিরতিকে নিতে পারছে না। ক্ষুধার্ত হয়ে পরেছে কুড়িয়া।

শিকার অভিযান থেকে ক্যাম্প ফিরে রোজই নিজের তাঁবুতে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে ও, বিছানায় শুয়ে ক্যাম্প-ফায়ার থেকে ভেসে আসা শনের ভরাট গলার আওয়াজ শোনে কান পেতে। ভরি, পুরুষালি গুঞ্জন; বাবার ঘড়ঘড়ে আওয়াজের মতো নয়। তবে কোনো শব্দই এতো দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না। এক রাতে কুড়িয়ার মনে হলো, শন যেনো ওর নাম উচ্চারণ করলো। বিছানায় উঠে বসে কান খাড়া করলো সে। তার সম্পর্কে কি বলা হয়েছে বুঝতে না পেরে হতাশ হলো মনে মনে।

আরেকদিনের ঘটনা। বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেরা তাঁবুতে ফিরছে শন। কুড়িয়ার পাশ ঘেঁষেই যেতে হবে ওকে। বিছানায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ে থাকলো কুড়িয়া, শনের পায়ের আওয়াজ শুনে কান পেতে, কানভাসের ভেতর দিয়ে টর্চের আলো দেখতে পেলো, মনে মনে তৈরি হয়ে আছে শিকারী যদি কিছু বলে বা তার সাড়া পাবার চেষ্টা করে, চরম অপমান করে ছাড়বে। কিন্তু শনের পায়ের শব্দ একবারও ইতস্তত না করে দূরে সরে যাওয়ায় সামান্য হলেও আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করলো সে, মনে হলো শিকারীই উল্টে তাকে অপমান ও অবহেলা করে পেলো।

সাফারির ন'দিনের দিন সকালে টোপ পরীক্ষার জন্যে আবার নদীর শুকনো তলায় গাড়ি থামালো ওরা। তরুণী সিংহী আবার তেড়ে এলো শনকে দেখে। ইতিমধ্যে তার চোখের ঘা শুকিয়ে গেছে। একশো গজ দূর থেকে হামলা করার পায়তারা কমলো সে, লেজটা এদিকে ওদিক নড়ছে। শনের তাড়া খেয়ে এক সময় ঘুরলো সিংহী, ঝোপের আড়ারে পালিয়ে গেলো, কিন্তু তার আগেই লেজের নিচে কোমল লোমের মাঝখানে, রক্তের লালচে দাগ দেখে ফেলেছে শন।

‘দস্যুরানীর এখন একজন পুরুষসঙ্গী দরকার’, শনকে বলতে শুনলো কুড়িয়া, বাবার সাথে নিচু গলায় কথা বলছে। ‘এমন একটা টোপ পেয়ে গেছি আমরা, স্টেটা না গিলে পারবে না। আপনি নাকি ভাগ্যবান, আসুন দেখা যাক এতোটা ভাগ্যবান।’

সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া হবার আগেই সিংহটাকে শিকার করতে চায় শন, নতুন টোপের জন্যে চিউইউই নদীর তীরে গিয়ে মোষের পাল খাঁজার সময় নেই হাতে। কাজেই একটা পুরুষ হরিণকে গুলি করে মারলেন ক্যাপো, ক্যাম্পের কাছেই। পুরুষ সিংহটাকে শেষবার যেখানে দেখা গেছে, সেই ঘাসের রাজ্যে নিঃসঙ্গ

গাছের সাথে ঝোলানো হলো হরিণের ধড়। এবার অনেকটা নিচে, যাতে সিংহীরাও নাগাল পায়। দুপুরের দিকে মাচায় উঠলো ওরা। ঘন্টাখানেকের মধ্যে তাজা রক্ত-মাংসের গন্ধ পেয়ে শুকনো নদী পেরলো সিংহীরা, পিছু পিছু এলো সব ক'টা বাচ্চা। বয়স্কা সিংহী গোথ্রাসে খাওয়া শুরু করলো, তার ঝিদে যেনো আর মেটে না। ভরুপী সিংহী খুব সামান্যই খেলো, খাওয়ার মাঝখানে বারবার এদিকে ওদিকে পায়চারি করলো সে, যেনো কারো আসার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে আছে। বাচ্চাদের তড়া করা করলো কয়েকবার, মাটিতে পিঠ দিয়ে গড়াগড়ি খেলো নিজের লেজের নিচেটা জিভ দিয়ে চাটলো একবার। মাঝে মধ্যে চারপায়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো সে, গলা থেকে বেরিয়ে এলো প্রলম্বিত গোষ্ঠানির করুণ বিষন্ন সুর, বিরহ ব্যথায় কাতর। সুরটা শুয়ে সহানুভূতি আর মায়ায় কুড়িয়া' নিজেও দুর্বল হয়ে পড়লো।

‘পুরুষটাকে ডাকছে’, বিড়বিড় করলো শন।

অকস্মাৎ দুই সিংহীই একযোগে লাফ দিয়ে ঘন জঙ্গলের দিকে ফিরলো, বুড়ি বেটি নরম সুরে কাকে উদ্দেশ্য করে যেনো ঝঁকিয়ে উঠলো। ঘাবড়ে গিয়ে বিরতিহীন খেলায় ভঙ্গ দিলো বাচ্চারা, যে-যার মায়ের পিছনে আড়াল নিলো। এরপর দস্যুরানী ঘাসের ভেতর দিয়ে সামনে বাড়লো-শরীরে ঢেউ তুলে, হাঁটার ভঙ্গিতে দর্শনীয় ছন্দ ফুটিয়ে তুলে মিলিত হবার বাসনা প্রকাশ করলো, গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো আবেদনভরা নিচু গোষ্ঠানি।

‘তেরি হোন, ক্যাচপা’, বললো শন, এক হাতে ক্যাপোর কনুই ধরে আছে ও। ‘বেশি সময় নেবেন না।’

তারপর ঘাস থেকে বেরিয়ে এলো সিংহটা। প্রথমে ঘাসের মাঝে তার কেশর দেখতে পেলো ওরা। সিংহীর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রায় ছুটে আসছে। লজ্জা নেই দস্যুরানীর, সে-ও ছুটলো। কাত হয়ে থাকা ঘাসের মাঝখানের মিলিত হলো ওরা।

পুরুষটার গায়ে নিজের গা ঘষলো ফুলন, পরিবর্তে তার শা চেটে দিলো সিংহ। এক সময় আদার-সোহাগের প্রথম পর্ব শেষ হলো, শুরু হলো লুকোচুরি খেলা। দূরে সরে গিয়ে পরীক্ষা করলো সিংহী, তাকে ধরার জন্যে বীরপুরুষটা আসে কিনা। সিংহ কাছে আসতেই ছুটে আরো দূরে গেলো তরুণী।

ধীরে, আলতোভাবে হাতটা কুড়িয়ার উরুর উপর রাখলো শন। চেয়ারের কারণে রিকার্ডের চোখের আড়ালে পরে গেছে সে। সরিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করলো না মেয়েটা।

সিংহের উদ্দেশ্যে ঘুরেছে এবারে সিংহী। এরপর মাটির উপর উপর হয়ে ছড়িয়ে গুলো, কাঁধের উপর দিয়ে কটাক্ষ হানছে সঙ্গীকে। আগ্রহী পায়ে দ্রুত কাছে চলে আসে পশুরাজ; নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে দেয় কামার্ত সিংহীকে। দাঁড়িয়ে যায় তার উপর, পুং জননাঙ্গ বেষ্ট্রিয়ে এসেছে চামড়ার আবরন থেকে— চকচকে গোলাপী। সিংহী তার লেজ সরিয়ে দেয় পেছনটা উন্মুক্ত করার জন্যে।

ধীরে, ক্রুডিয়ার উরুর গোড়ায় পৌঁছে গেছে শনের আঙ্গুলের ডগা। কোমড়ের কাপড়ের নীচে মেয়েটার পিউবিক চুলের স্পর্শ পাচ্ছে ও। ওর হাতের ছোঁয়ায় একটু ফাঁক হলো ক্রুডিয়ার উরু জোড়া।

চরম পুলকে শিউড়ে উঠছে এখন সিংহ, ঘাড় নাড়িয়ে হৃষ্কার ছাড়লো তার দম্বিতার দিকে চেয়ে। মৃদু গোঙ্গানির মতো আওয়াজ করে পুরুষসঙ্গীকে কামড়ে দেয় সিংহী।

একহাত দিয়ে শনের কড়ে আঙ্গুলটা ধরলো ক্রুডিয়া। এমন জোরে উল্টো মোচড়ালো, আর একটু হলে জয়েন্ট থেকে আলাদা হয়ে গেছিলো ওটা। পুরো হাত ব্যাথায় অবশ হয়ে এলো শনের।

আর একটু হলে চিৎকার করে উঠেছিলো সে। কিন্তু রিকার্ডো কাছাকাছি থাকায় তা করা সম্ভব হলো না। কিছু বুঝতে বাকি থাকবে না তার, শন এই অবস্থায় ধরা খেলে। সুস্থ হাত দিয়ে ধীরে আহত আঙ্গুলটা ডলতে লাগলো সে। ক্রুডিয়ার ঠোঁটের বাঁকা হাসিটা টের পাচ্ছে।

ইতিমধ্যে বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে। নদীর পারে রোদ পড়েছে সরাসরি। মাচা থেকে দূরত্ব ছিয়ানক্সই গজ। রিকার্ডো মনটেরো লক্ষ্যভেদে অত্যন্ত নিপুণ একজন রাইফেলম্যান। এই দূরত্বে একই গর্তে তিনটে বুলেট ঢোকাতে পারবেন তিনি।

কাতর স্বরে গুঙিয়ে উঠলো সিংহী, চারপায়ে দাঁড়িয়ে খোলা পারে বেরিয়ে এলো তার সঙ্গী। সিংহীর পিছনে দাঁড়ালো সে, মাচা থেকে তার শরীরটা আড়াআড়িভাবে দেখতে পাচ্ছে ওরা, সোনালি আলোয় আলোকিত।

‘স্বর্গীয় উপহার, ক্যাপো’, ফিসফিস করলো শন, ভদ্রলোকের কাঁধে টোকা দিলো। ‘মারুন ওটাকে।’

ধীরে ধীরে রাইফেল বাঁট কাঁধে তুললেন রিকার্ডো মনটেরো। ৩০০ ওয়েদারবাই ম্যাগনাম ওটা। ফ্যারিং পিনের নিচে কার্টিজে রয়েছে আশি গ্রেন গান পাউডার, ১৮০- গ্রেন বুলেট। নদীর ওপর দিয়ে সেকেণ্ডে তিন হাজার ফুট গতিতে ছুটবে ওই বুলেট। তাজা মাংসের ভেতর যখন ঢুকবে, শক ওয়েভের আঘাতে ভেতরের অংশগুলো, ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ড, শ্রেফ ছাতু হয়ে যাবে-সেই ছাতু সদ্য তৈরি বিরাট একটা গর্ত নিজের ভেতর টেনে নেবে, তারপর পিচকারি থেকে বেরিয়ে আসা লাল পানির মতো ছড়িয়ে দেবে ঘাসের ওপর।

‘গুলি করুন!’ আবার তাগাদা দিলো শন। টেলিস্কোপ সাইটে চোখ রেখে অপলক তাকিয়ে আছেন ক্যাপো, কুণ্ডলী পাকানো কেশরের প্রতিটি আলাদা লোম চিনতে পারছেন তিনি। এতো বিশাল সিংহ, এতো সুন্দর, আগে কখনো দেখেননি। এমন মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন যে শনের কথা শুনতেই পাননি। ট্রিগারে চেপে বসে আছে আঙুল, টেনে দিলেই তাঁর এতোদিনের সাধ পূরণ হবে।

বাবার পাশে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে ক্লডিয়া। সিংহটা ঘাড় ফিরিয়ে নদীর ওপর দিয়ে সরাসরি তার দিকে তাকালো॥ ক্লডিয়ার মনে হলো, বনভূমির একটা অমূল্য শোভা, এটাকে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না। ঠিক সচেতনভাৱে নয়, মুখ খুলে চোঁচিয়ে উঠলো সে, ফুসফুসের সমস্ত শক্তি এক করে ‘পালাও, বোকা’ সিংহ, পালাও!’

এরপর যা ঘটলো, চাক্ষুষ করে ক্লডিয়া নিজেও স্তম্ভিত হয়ে গেলো। জীবিত কোনো প্রাণি এতো দ্রুত নড়ে উঠতে পারে, ওর ধারণা ছিলো না। অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলো, তারপর চোখের পলকে তিনটে প্রাণি যেনো বিস্ফোরণের মতো ছিটকে পড়লো তিনদিকে। সোনালি ঝিলিক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো মুহূর্তের মধ্যে।

সবচেয়ে আগে অদৃশ্য হলো বুড়ি বেটি... লম্বা ঘাসে যেনো তাকে গিলে ফেললো। তার পিছু পিছু গেলো বাচ্চাগুলো নদীর পার ধরে ছুটলো দস্যুরানী, এতো জোরে দৌড়লো যেন হলো মাটিতে পা পড়ছে না। তাকে অনুসরণ করলো পত্তরাজ। শরীরটা বিরাট আর পিঠে বিপুল কেশরের বোঝা সত্ত্বেও দস্যুরানীর চেয়েকম নস্ক তাক পতি।

চোরাগে বসে ঘুরে খেলেন রিকার্ডো, কাঁধে রাইফেল, উজ্জ্বল গ্রাস লেগে তাকিয়ে আছেন, সাইট দিয়ে অনুসরণ করছেন সিংহটাকে। ঘাসের ভেতর ঢুকেশুভ্রমো দস্যুরানী। তার পিছু পিছু সিংহও ঢুকছেযাচ্ছে, এই সময় গর্জে উঠলো ওয়েদারবাই, মাচার, ভেতর বিস্ফোরণের শব্দে ওদেরকাণে তালা গেলে গেলো। বলমলে রোদ সত্ত্বেও নদীল ওপর দিয়ে ছুটে যেতে দেখা গেলো আগুনের লকলকে একটা লাল শিখা।

হোট্ট খেলো সিংহ, সজোরে কেশেউঠলো একবার, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলো ঘাসের ভেতর। নিস্তব্ধতার ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করছে ওদের কান, বিস্ফোরনের শব্দটা এখনো লেগে রয়েছে কানের পর্দায়, খালি জায়গাটার দিকেফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, হতভম্ব ও প্রিয়মনা।

‘ভালোই দেখালে, ডাকি!’ নিচু গলায় বললো শন।

‘আমি দৃথখিত নই,’ দৃঢ়কণ্ঠে বললো ক্লডিয়া। তার বাবা এমন রাগ আর জোরের সাথে রিলোড, করলে রাইফের যে খালি ব্রাস কেসটা রোদের ভেতর ঝিলিক দিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে দূরে সরে গেলো। মাচা কাঁপিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, মেয়ের দিকে একবারও তাকালেন না, মই বেয়ে নেমে গেলেন নিচে।

.৫৭৭ ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা তুলে নিয়ে শনও তাঁর পিছু পিছু নামলো’। গাছটার নিচে দাঁড়ালো ওরা, বুক-পকেট থেকেএটা হাভানা চুরুট বের করে শনের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন রিকার্ডো মনটেরো, নিজেও একটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধূমপান করলো ওরা, তারপর জানতে চাইলো শন, কোথায়? পেটে?’

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকালের ক্যাপো। ‘পেটে।’

‘জম্বন্য,’ বললো শন। ‘জম্বন্য, জম্বন্য!’ দু’জনেই ওরা লম্বা ঘাস আর নদীর পার্শ্ব ঢাকা কাঁটাবহুল ঝোপের দিকে তাকালো।

দশ মিনিট পর টয়োটা নিয়ে এলো ওরা। জোব, শেডরাখ আর মাতাউ নিঃশব্দে হুসছে, প্রত্যাশায় চকচক করছে তিনজোড়া চোখ। রিকার্ডো মনটেরোর সাথে কয়েকটা সাফরিতে অংশগ্রহণ করেছে ওরা, জানে লক্ষ্যভেদে কখনো ব্যর্থ হন না তিনি। ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নামলো ওরা, নদীর ওপারে তাকালো, ধীরে ধীরে যুঁহে গেলো মুখের হাসি। একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো শন, ‘পেটে।’ তাতেই যা বোঝার বুঝে নিলো ওরা।

মাথা নিচু করে টয়োটার ফিরে গেলো তিনজন। অনুসরণ করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো চুপচাপ।

চোখ কুঁচকে সূর্যের দিকে তাকালো শন। ‘এক ঘন্টা পল্ল সন্ধ্যা,’ বললো ও। ‘কতটায় টান ধরতে সময় লাগবে, অত্যা সময় নেই আমাদের হাতে।’

‘কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি,’ পরামর্শ দিলেন ক্যাপো। ‘ততোক্ক্ষেণে অসুস্থ হয়ে পড়বে ওটা।’

মাথা নাড়লো শন, যোশের দিকে ইঙ্গিত করলো। ‘ওখানে মারা গলে লাশটা হয়েনারা পাবে। ট্রফির আশা ছেড়ে দিতে হবে আপনাকে। আচ্ছা, আমি চাই না বেচারি সারাত কষ্ট পাক।’

মই বেয়ে ক্লডিয়া নেয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেলো ওরা। নিচে নেমে ওদের দিকে তাকালো না সে, উদ্ধত ভঙ্গিতে কালো চুলের লম্বা বেনী দুটো ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিঠে আছড়ালো, দুপদাপন্থকে পা ফেলে হেঁটে গেলো টয়োটার দিকে। সামনের সিটে বসলো যে, হাত দুটো ভাঁজ করলো ছোট্ট বুকে, শিরদাঁড়া টান টান করে গভীর মুখে তাকিয়ে থাকলো নাক বরাবর সামনে।

‘আমি দুঃখিত,’ ক্যাপো বললেন। ‘ওকে আমি ছাব্বিশ বছর ধরে চিনি, আমার বোঝা উচিত ছিলো এ-ধরনের একটা কিছু করে বসবে।’

‘আপনি না আসলেও পারেন, ক্যাপো। আমি একাই পারবো।’

সরাসরি জবাব দিলেন না ক্যাপোও। ‘আমি রিগবিটা নেবো,’ বললেন তিনি।

শন পরামর্শ দিলো ‘দেখবেন ওটায় যেনো সফট-নোজ বুলেট থাকে।’

‘অবশ্যই।’ পাশাপাশি হেঁটে এলো ওরা টয়োটার কাছে, রাইফেল বদল করলেন ক্যাপো।

ট্রাকের গায়ে হেলান দিলো শন, ডাবল রাইফেলের কল্ট্রিজ বদল করলো। ‘আহা বেচারি,’ বললো ও, তাকিয়ে আছে ক্যাপোর দিকে, তবে কথাগুলো ক্লডিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলা। ‘আমরা ওকে এতো কষ্ট দিতে চাইনি, এটা গুলি বেয়ে সাথে সাথে মারা যেতো। কিন্তু কি ঘটলো? পেটে বিরাট একটা গর্ত নিয়ে অন্তত কয়েক ঘন্টা বেঁচে থাকতে হবে বেচারাকে। অর্ধেক নাড়ীভূঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। অসহায় একটা পশুকে এভাবে কষ্ট দেয়ার কোনো মানে হয়?’ সরাসরি না

তাকিয়েও শন দেখতে পেলো, শিউরে উঠলো ক্লডিয়া, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। শনের দিকে তাকাবেই না।

‘আহত পঙ্কে আজরাইল বললেই হয়,’ বলে চলেছে শন। ‘আমাদের কেউ মারা গেছে একটুও আশ্চর্য হবো না। হয়তো মাতাউই মারা পড়বে। পায়ের ছাপ ধরে সেই-ই তো আগে আগে চুটবে। পালিয়ে আসা স্বভাব নয় তার। কেউ যদি মারা পড়ে তো ধরে নেয়া যায় মাতাউই....।’

‘থাক, শন,’ রিকার্ডো মনটেরো মৃদুকণ্ঠে বললেন। ‘ক্লডিয়া জানে কাজটা ওর সাংঘাতিক অন্যায় হয়ে গেছে।’

‘জানেকি? সশব্দে রাইফেলে বোল্টটা সামনে ঠেলে দিলো শন। ‘আমার সন্দেহ আছে। আপনি, ক্যাপো, লেদার জ্যাকেটা পরে নিন। যদি আপনাকে পেড়ে ফেলে, জ্যাকেট পরে থাকায় খানিকটা রক্ষা পাবেন-যদিও শেষ রক্ষা হবে না।’

নদীর উঁচু কিনারায় অপেক্ষা করছে তিনজন কর্মী। জোবের হাতে শটগান, বাকি দু’জন নিরস্ত্র। ঘন ঝোপের ভেতর আহত একটা সিংহকে খালি হাতে অনুসরণ করতে হলে অসমসাহস দরকার। যতোই রাগ আর ক্ষোভ থাক মনে, শনের ওপর তাদের শ্রদ্ধামেশানো আস্থা ক্লডিয়ার দৃষ্টি এড়ালো না। সে উপলব্ধি করলো, এর আগে এতো বার তারা ভয়ংকর বিপদের সময় পরস্পরকে সাহায্য করেছে যে কেউ নিজের কথা আলাদাভাবে ভাবতে পারে না। ওরা চারজন যেনো আপন ভাইয়ের চেয়েও ঘনিষ্ঠ। ঈর্ষা জাগলো ক্লডিয়ার মনে, সে তার জীবনে কোনো মানুষের সাথে এরকম ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি।

এক এক করে সবার কাঁধে হাত রাখলো শন, চাপ দিলো মৃদু। তারপর নিচু গলায় কথা বললো জোবের সাথে। কালো হয়ে গেলো জোবের চেহারা, ভাব দেখে মনে হলো প্রতিবাদ করবে। কিন্তু তারপর মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো সে, হেঁটে এলো টয়োটার দিকে, হাতে শটগান নিয়ে ক্লডিয়ার পাশে পাহারায় থাকলো।

ভাঁজ করা হাতের কনুইয়ে ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিলো শন, আঙুল দিয়ে কপাল থেকে চুলে সরালো, তারপর এক ফালি চামড়া দিয়ে কপালের চারধারে পট্রি বাঁধলো। শিকারীকে পছন্দ না করলেও, ভয়ঙ্কর বিপদে পা বাড়াবার আগে ওর এই প্রস্তুতি সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিলো ক্লডিয়ার। মনে মনে স্বীকার করলো, লোকটা চেহারা ও দৈহিক কাঠামো বীর বা নায়কের মত। ওর বুশ জ্যাকেটের আস্তি ন কেটে ফেলা হয়েছে, পরনে খাটো খাকি প্যান্ট, বাহু আর পায়ে কোনো আবরণ নেই। ক্লডিয়া লক্ষ্য করলো, শিকারী এমনকি তার বাবার চেয়েও লম্বা, তবে কোমরটা সরু, আর কাঁধ দুটো অনেক বেশি চওড়া। ভারি রাইফেলটা অনায়াসে একহাতে ধরে আছে।

ক্লডিয়ার দিকে একবার তাকালো শন। নির্লিপ্ত চেহারা। অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠলো ক্লডিয়ার, না জানি কি সর্বনাশ ঘটে যায় আজ! হঠাৎ একটা ঝোঁপ

চাপলো, ছুটে গিয়ে শনের হাতটা চেপে ধরে, নদী পেরুতে নিষেধ করে তাকে।  
কিন্তু মুখ খোলার আগেই ঘুরে দাঁড়ালো শন।

ধীরগতিতে সামনে বাড়লো ওরা। আহত সিংহকে ব্যস্ততার সাথে অনুসরণ করতে গিয়ে বহুলোক মারা গেছে আফ্রিকায়। মাতাউর সমস্ত মনোযোগ পায়ের নিচে মাটির ওপর। ঘাসবনের উঁচু পাঁচিলের দিকে একবারও মুখ তুলে তাকালো না। শনের ওপর তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে। ঘাসবনের কিনারায় পৌঁছে থামলো সে, একটা হাত পিছনে এনে গোপন সংকেত দিলো।

‘রক্ত’, পিছনদিকে না তাকিয়ে নিচু গলায় রিকার্ডো বললো শন। ‘রক্ত আর পেটের লোম। আপনি ঠিক ধরেছেন, ক্যাপো। গুলিটা পেটেই লেগেছে।’ ঘাসের ভায়ায় লেগে থাকা রক্তের চকচকে ভেজা দাগ দেখতে পেলো ও।

সুইমিংপুলে ডাইভ দেয়ার আগে সাঁতারু যেমন বুক ভরে শ্বাস টানে, সেভাবে বাতাস টানলো শন। বাতাসটা বুকে আটকে রেখে সামনে বাড়লো, ঢুকে পড়লো ঘাসবনের ভেতর।

\* \* \*

ঘাসবনে ঢোকেনি, যেনো পানিতে ডুব দিয়েছে ওরা। ঘাসগুলো ওদের চেয়ে লম্বা, এতো ঘন যে দু'গজ সামনে দৃষ্টি চলে না। ঘাসের গায়ের রক্তের দাগ রয়েছে এখন দিয়ে সিংহটা ছুটে যাওয়ায় একটা পথও তৈরি হয়েছে, কাজেই অনুসরণ করতে অসুবিধা হলো না। ঘাসের গায়ে রক্তের দাগ দেখে শন আর মাতাউ বুঝে নিলো ঠিক কোথায় আহত হয়েছে। রক্তের সাথে মিশে রয়েছে মল, অর্থাৎ ফুটো হয়ে গেছে নাড়িভুঁড়ি। ক্ষতটা মারাত্মক, তবে মরার আগে দীর্ঘক্ষণ অসহ্য কষ্ট পাবে।

ঘাসবনে ঢোকার পর বিশ গজ এগিয়ে থামলো মাতাউ, আঙুল দিয়ে গাঢ় রক্তের ছোট্ট একটা পুকুর দেখালো। 'এখানে থেমেছিল', ফিসফিস করলো সে, উত্তরে মাথা ঝাঁকালো শন।

'বেশিদূর যায়নি', আন্দাজ করলো ও। 'কাছেই কোথাও আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। 'মাতাউ, এখানেই থাকো!' দু'জনেই ওরা জানে, নির্দেশটা অমান্য করা হবে। জীবনে কখনো পিছু হটেনি মাতাউ। আজও সে হামলার সময় নিজের জায়গা ছেড়ে একচুল নড়বে না।

'ঠিক আছে, মাথামোটা গর্দভ', রাগের সাথে বললো শন। 'আগে বাড়ো।'

'মাথামোটা গর্দভ', হাসিমুখে পুনরাবৃত্তি করলো মাতাউ। জানে, তার ওপর খুশি বা তাকে নিয়ে গর্ব অনুভব করলে এই গালিটা দেয় শন।

রক্তের ছাপ ধরে এগোলো ওরা। তিন-চার পা এগিয়ে থামলো, সামনের ঘাসে পাথর ছুঁড়লো শন। সিংহ সাড়া না দিলেও আবার এগোবার সময় সেফটিক্যাচটা বারবার অন আর অফ করছেন ক্যাপো। শব্দটা অস্বস্তিকর হলেও, মনে মনে ভদ্রলোকের প্রশংসা করলো শন। মানুষের পক্ষে যে-সব দুঃসাহসিক কাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব সেগুলোর মধ্যে এটাই সম্ভবত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। পেটে গুলি খাওয়া সিংহের চেয়ে হিংস আর কিছু হতে পারে না। কাজটা শনের, এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত ও, কিন্তু রিকার্ডো মনটোরোর জন্যে অগ্নিপরীক্ষা-এখনো তিনি হতাশ করেননি ওকে।

সামনের ঘাসে আরেকটা পাথর ছুঁড়লো শন। নিচু গাছের শাখায় লেগে শব্দ করলো সেটা। সামনে ঝোপ। আরো সতর্কতার সাথে এগোলো দলটা। ঘাসের ফাঁকে ঝোপটা দেখা গেলো।

আশ্চর্য কালো রক্তের একটা ঝোপ, ঘাসের সমুদ্রে যেনো একটা দ্বীপ। ঝোপের ভেতর দৃষ্টি চলে না এতো ঘন। পাথর ছুঁড়লো শন, শাখা-প্রশাখায় বাড়ি বেঁচে যেতে নিচে নামলো সেটা, সেই সাথে ঝোপের অনেক ভেতর থেকে গর্জে উঠলো সিংহ।

মৃত্যুভয় এতোই উপভোগ্য হয়ে উঠলো যে ত' প্রায় সহ্যের বাইরে, এ যেনো আবেগের দ্বারা চরম পুলকলাভ, নারী-পুরুষ মিলনের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো। রাইফেলের সেফটি-ক্যাচ অফ লো শন, বললো, 'আসছে, মাতাউ।

শালাও!’ গুর কঠে উল্লাস। সময় যেনো স্থির হয়ে গেলো। ভয় থেকে উৎসারিত আরেকটা বিচিত্র অনুভূতি এটা

চোখের কোণ দিয়ে শন দেখলো, এক পা এগিয়ে গুর পাশে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপো। এর জন্যে কতোটুকু সাহাস দরকার হয়েছে তাঁর, জানে ও। ‘ওড ম্যান!’ জোরেই বললো। শন, আর যেনো গুর গলার আওয়াজেই ঝাঁকি খেলো ঘন ঝোপ, ভালপালা মড়মড়িয়ে ভেঙে ফুটে এলো সিংহ-আক্রোশে আর ব্যাখায় গোঙাচ্ছে, পরগর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

অটল দাঁড়িয়ে থাকলো মাতাউ, যেনো মাটিতে পৌতা একটা খুঁটি। ইতিহাসে নেই মাতাউ কখনো পিছু হটেছে। পা বাড়িয়ে তার একপাশে চলে এলো না, আত্মক পাশে এলেন ক্যাপো; দু’জন একযোগে রাইফেল তুললো গুরা, লক্ষ্যস্থির করলো পাসবনের পাঁচিলের দিকে। ঝোপের ভেতর থেকে এখনো ছুটে আসছে সিংহ, গর্জন ছাড়ছে অনবরত, প্রতিটি গর্জনে ঘন হাতুড়ি বাড়ি মেরে ওদের ইন্দ্রিয়গুলোকে অবশ করে দিলো।

ওদের মুখের ওপর ফাঁক হলো ঘাসবন বিশাল তামাটে একটা দানবীয় আকৃতি লাক দিলো ওদের ওপর।

একসাথে গুলি করলো গুরা, গুলির বিকট শব্দে চাপা পড়ে গেলো বনভূমি-কাঁপানো গর্জনের আওয়াজ। দ্বিতীয় ব্যারেল থেকেও গুলি করলো শন। দুটো গুলির শব্দ একটা হয়ে বাজলো কানে, ৭৫০-গ্ৰেন বুলেট আঘাত করলো হিংস্র দানবটাকে, খামিয়ে দিলো যেনো, একটা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে। ব্রিগবির বোল্ট টানলেন ক্যাপো, চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুলে কিরে এলো গুলির শব্দগুলো

নিহত প্রাণিটা ওদের পায়ের সামনে পড়েছে, রাইফেল উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে গুরা, রক্তাক্ত লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে-ঘটনার দ্রুততায় আচ্ছন্নবোধ করছে সবাই, মাঝার ভেতর এখনো রয়ে গেছে গুলির শব্দের রেশ।

নিশ্চরতার ভেতর সামনে বাড়লো শেডরাখ। মাতাউর মতোই সে তার জায়গায় স্থির দাঁড়িয়েছিল। লাশটার সামনে এসে বুকলো সে, পরমুহূর্তে ঝণাকি খেয়ে পিছিয়ে এলো, চিৎকার করে যা বললো তার পুরোপুরি অর্থ কেউ ভালো করে বুঝতে পারলো না।

‘এটা সিংহ নয়!’

তার কথা শেষ হয়নি, হামলা করলো ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেট। দস্যুরানীর মতোই, ঝোপ থেকে সরাসরি ওদের দিকে ছুটে এলো সে, তবে আরো ক্ষিপ্ৰবেগে। ঝড়ের বেগে ছুটন্ত রেল এঞ্জিনের মতো আওয়াজ করছে সে। অপ্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে গুরা, রাইফেল রিলোড করা হয়নি, সিংহীর লাশের কাছে এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে। দূরে রয়েছে একা শুধু শেডরাখ, সিংহ ওদের মাঝখানে।

গাসের পাঁচিল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেই শেডরাখকে হাঁ করা চোয়ালের ফাঁকে আটকে নিলো, কামড় বসালো নিতম্বে, মাটিতে ঘষা খেয়েও পিছলে শেডরাখের পিছনে দাঁড়ানো ছোট্ট দলটার মাঝখানে চলে এলো।

ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলো সবাই। মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়লো শন, ঘাড়টা ঝাঁকি খেলো প্রচণ্ডভাবে। বুকের ওপর রাইফেলটা ধরে আছে ও, পতনের সময় ওটা যাতে হাতছাড়া না হয় সেদিকে খেয়াল রয়েছে। মাটিতে পড়েই একপাশে কত হলোও।

দশ ফুট দূরে শেডরাখকে ক্ষতবিক্ষত করেছে সিংহ। বিশাল থাবা দিয়ে শেডরাখকে মাটির সাথে গেথে নিয়েছে, দাঁত বসাচ্ছে নিতম্বে আর হাঁটুর ওপর পায়ে।

‘ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে ওটা চিতা নয়,’ রিলোড করার জন্যে রাইফেল ভাঙার সময় ভাবলো শন। কোনো শিকারী দলের ওপর হামলা করলে, চিতা কখনো একটা লোককে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। ক্ষিপ্ততার সাথে একজনকে ছেড়ে আরেকজনকে ধরে, গোটা দলের সবক’জনকে অসাড় করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগে তার।

সিংহের খোলা চোয়াল থেকে রক্ত ঝরছে। তার থাবার নিচে ছটফট করছে শেডরাখ, চিৎকার করছে, কেশর ঢাকা সিংহের মাথায় বৃথাই ঘুসি মারছে দু’হাতে। সিংহ আর শেডরাখের সামনে, ঘাসের ভেতর রিকার্ডো দেখতে পেলো শন। আঁচড়ে-খামচে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলেন তিনি, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়েন ছটকে পড়া রিগবির দিকে।

‘গুলি করবেন না, ক্যাপো!’ তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করলো শন। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে অনভিজ্ঞ একজন রাইফেলধারী হামলারত পশুর চেয়ে বিপজ্জনক রিগবির বুলেট সিংহের গা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে সামনের যে-কে নো লোককে আঘাত করতে পারে।

বাম হাতের আঙুলের ফাঁকে দুটো স্পেন্নার কার্টিজ আটকে রেখেছিল শন। দ্রুত রিলোড করার জন্যে অভিজ্ঞ শিকারীদের একটা কৌশল এটা। কার্টিজ দুটো খালি ব্রীচে ভরে নিলো ও।

শেডরাখের নিচের দিকটা চিবাচ্ছে সিংহ। হাড় ভাঙার রোমহর্ষক শব্দ ঢুকলো শনের কানে, যেনো শুকনো টোস্টে কামড় দিচ্ছে কেউ। দুর্গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস।

শেডরাখ আর সিংহের সামনে, শন দেখলো, রিগবিতে গুলি ভরছেন ক্যাপো। ‘না, ক্যাপো!’ আবার চিৎকার করলো শন। সরাসরি দু’জনের মাঝখানে রয়েছে। কোনো বুলেট যদি তাকে আঘাত করে, শনের গায়েও লাগবে সেটা।

ধরাশায়ী মানুষের ওপর ঝুঁকে রয়েছে পশু, এই অবস্থায় ওদের দিকে ছুটে গিয়ে গুলি করা বোকামি ছাড়া কিছু নয়, কারণ পশুর সাথে মানুষটাও নির্বাণ মারা পড়বে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে বিশেষ কৌশল দরকার হয়।

দাঁড়াবার কোনো চেষ্টাই করলো না শন।। মাটির ওপর শরীরটাকে গড়িয়ে দিলো ও। তিনবার গড়ান দিয়ে থামলো, শুয়ে আছে সিংহের পাশে, প্রায় ছুঁতে পারে। রাইফেলের মাজলটা চেপে ধরলো সিংহের নিচের দিকের পাজরে, গুলি ওপর দিকে ছুটবে। ৭৫০-গ্রেনের একটা বুলেটই যথেষ্ট।

গুলির ধাক্কায় শেডরাখের শরীর থেকে শূন্যে উঠে পড়লো, ছিটকে পড়লো একপাশে, দুই কাধের মাঝকান দিয়ে বেরিয়ে সোজা আকাশের দিকে উঠ গেছে বুলেট।

রাইফেল ফেলে দিয়ে শেডরাখের ওপর ঝুঁকলো শন দু'হাতে তুলে নিলো বুলের ওপর, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো তার পায়ের দিকে। দাঁতগুলো ছোরার মতো ব্যবহার করেছে সিংহ। নিভন থেকে হাঁটু পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। 'মাতাউ!' হাঁক ছাড়লো শন।

'টয়োটা! মেডিসিন বক্স! জলদি!' শনের কথা শেষ হতে যা দেরি, ঘাসবনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো বুদে ট্র্যাকার।

হামাগুড়ি দিয়ে শনের পাশে চলে এলেন ক্যাপো। শেডরাখের পাটা দেখলেন। 'ওহু পড!' আঁতকে উঠলেন তিনি।

মাংসের গভীরে ধমনি ছিঁড়ে ঝাওয়া ফিনকি দিয়ে সবেগে বেরিয়ে আসছে লাল রক্ত। গরম মাংসের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিলো শন। হেঁড়া ধমনি পিচ্ছিল লাগলো আঙুলে, রাবারের মতো দু'আঙুলে শক্ত করে চেপে ধরলো সেটা। 'জলদি, মাতাউ, জলদি! আবার চিৎকার করলো ও।

তিনশো গজের মতো দূরে টয়োটা। তাড়া খাওয়া খরগোশের মতো ছুটলো মাতাউ। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো সে। তার সাথে জোবও রয়েছে, হাতে একটা সাদা বাস্ক, ঢাকনির গায়ে রেড ক্রিসেন্ট আঁকা। ঢাকনিটা খুললো ওরা।

'ইনস্ট্রুমেন্ট রোলে পাবে,' বললো শন। 'হীমোস্ট্যাকস।'

স্টেইন-লেস স্টীল ক্ল্যাম্পগুলো শনের হাতে ধরিয়ে দিলো জোব, শেডরাখের হেঁড়া ধমনিতে আটকানো হলো সেগুলো। তাজা লাল রক্তে ভিজে গেলো শনের হাত।

'শিরাপথে স্যালাইন দিতে হবে, পথ তৈরী করো,' জোবকে নির্দেশ দিলো শন। 'প্রথমে ওকে আমরা এক ব্যাগ রিংগার্স ল্যাকটেট দেবো। তাড়াতাড়ি করো!' কথা বলছে বটে, তবে হাত দুটো থেমে নেই। আয়েডিন পেস্ট ভরা টিউবের মখটা ক্ষতগুলোর গভীরে ঢুকিয়ে চাপ দিলো ও। চূপচাপ শুয়ে আছে শেডরাখ। প্রতিবাদ করছে না বা ব্যথায় কাতরাচ্ছে না, চোখ খুলে ওদের কাজকর্ম দেখছে, জোব কিছু জিজ্ঞেস করলে বিড়বিড় করে সিনডেবেল ভাষায় জবাব দিচ্ছে। 'স্যালাইনের পথ তৈরী হয়ে গেছে,' বললো জোব।

শেডরাখের কনুইয়ের উল্টোদিকের একটা শিরা খুঁজে নিলো শন, প্রথমবারের চেষ্টাতেই ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো ছুঁচটা। 'ওহে, শেডরাখ,' জোর করে নিঃশব্দে

হাসলো শন। 'তুমি জানো, তোমার ঝাণ্ডায়ানো বিবেই মারা গেছে সিংহটা। তোমার পাটা খেলো সে, অমনি পটল তুললো। কি মজা!' হাসির একটা শব্দ রেকলো শেডরাখের গলা থেকে, শুনে ভাঙ্কব বনে গেলেন ক্যাপো। 'রিকার্ডো সাহেব,' দরাজ গলায় বললো, শন, আমার বন্ধুকে আপনার একটা চুকট দিন।' পরিষ্কার সাদা টেপ দিয়ে পাটা বাঁধলো ও।

পায়ের যত্ন নেওয়া পর শেডরাখের বাকি শরীরটা পরীক্ষা করলো শন। আঁচড়ের দাগগুলোর ওপর আয়োডনের প্রলেপ মাখালো। এরপর ট্রান্সফিউশন ব্যাগে পুরো এক অ্যামপুল পেনিসিলিন ঢাললো কাজটা শেষ হতে আশঙ্কটার বেশি লাগলো না। মনে মনে ক্যাপোস্বীকার করলেন, ভালো একজন ডাক্তারও এরচেয়ে দ্রুত বা দক্ষতার সাথে কাজটা সারতে পারতো না।

'এখানে টয়োটার আনতে হলে অনেক পথ ঘুরে আসতে হবে,' বললো শন। 'ফিরতে সঙ্কো হয়ে যাবে আমার। কমল দিয়ে ঢেকে রাখো শেডরাখকে।' শেডরাখের ওপর ঝুঁকলো ও। 'কিছু না শ্রেক আঁচড়, আমি দেখতে চাই তাড়াতাড়ি কাজে ফিরে এসেছো তুমি। তা নাহলে কিন্তু বেতন কাটা যাবে।' ৫৭৭-টা তুলে নিয়ে ছুটলো ও, ঘাসবনের ভেতর দিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছে। এতোকক্ষে রাগ হলো শনের, দেরি করে হওয়ায় অনেক বেশি জোরালো।

নদীর পারে পৌঁছে দেখলো, টয়োটার সামনের সিটে একা বসে রয়েছে কুড়িয়া। নিঃশব্দ আর বিষণ্ণ লাগছে তাকে, যদিও শনের মনটা তাতে একটুও নরম হলো না। ওর হাতে শুকনো রক্ত দেখে শিউরে উঠলো কুড়িয়া। তার দিকে না তাকিয়ে রাইফেলটা গান র্যাকে রাখলো শন, বোতলের পানি দিয়ে হাত ধুলো। ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিলো ট্রাক, নদীর শুকনো তলা ধরে ফিরতি পথে ছুটলো টয়োটা।

'কি ঘটেছে আমাকে বলবে না?' অবশেষে জানতে চাইলো কুড়িয়া। সে যে অনুভূত তা গোপন করার জন্যে গলার আওয়াজ চড়া করতে চেষ্টা করলো, স্বর ফুটলো না, মিনমিনে আওয়াজ বেরলো।

'বেশ।' সামনের দিকে তাকিয়ে মুখ ঝুললো শন। 'যা ঘটেছে তারচেয়ে খারাপ আর কিছু ঘটতে পারে না।' সংক্ষেপে ঘটনার বর্ণনা দিলো ও। প্রথমে হামলা করে তরুণী সিংহী, ভুল করে তাকে গুলি করে ওরা। দস্যুরানী মারা যাওয়া ক্ষতি হলো কুড়িয়া যাদেরকে অভ্যন্ত ভালোবাসে বলে মনে করে, সেই বাচ্চাগুলোর। এখনো তারা মায়ের দুধ ছাড়েনি। ওরা বাঁচবে না। তিনটে বাচ্চাই মারা যাবে। বেশিরভাগ সম্ভাবনা হয়েনাদের খোরাক হবে শুকলো।'

'না!' আঁতকে উঠলো কুড়িয়া।

হেডলাইট জ্বাললো শন, সূর্য ডেবার সাথে সাথে অন্ধকার নেমে আসছে বনভূমিতে। তারপর কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করলো শন। শেডরাখের ওপর লাফিয়ে পড়লো ফ্রেড। কামড়ে শরীর তেকে প্রায় আলাদা করে ফেলেছে শেডরাখের একটা

না। ওটা যে কেটে ফেলতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ট্র্যাফিকার হিসেবে লোকটার আর কোনো মূল্য নেই। সারাটা জীবন তাকে পঙ্গুত্বের অভিশাপ নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

নিঃশব্দে কেঁদে ফেললো ক্রুডিয়া। ‘আমি -দুঃখিত।’

‘দুঃখিত? শেডরাখ আমার আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি! আমরা আফ্রিকার সূর্য মন্ডায় নিয়ে দশ হাজার মাইল একসাথে হেঁটেছি, এক কম্বলের নিচে ঘুমিয়েছি, এক ঝল্লায় খেয়েছি। এখন তুমি বলছো, দুঃখিত! বেশ-বেশ অসংখ্য ধন্যবাদ, ডাকি! অনে সুখী হলাম!’

‘জানি তোমার রাগ করার কারণ আছে। আমি বুঝতে পারি...।’

‘বুঝতে পারো? কিছুই তুমি বোঝো না! মূল্যহীন ভাবাবেগে ঠাসা তোমার ভেতরটা, কঠিন বাস্তব দুনিয়া সম্পর্কে কিছুই তোমার শেখা নেই। একটা মাত্র পশুর নিয়তি বদলে দিতে চেয়ে কতোটুকু ক্ষতি করেছে জানো? একটা সিংহী মারা গেছে, তার বাচ্চাগুলোও বাঁচবে না। একজন লোক, যদি ভাগ্যবশত বাঁচেও সারাজীবন পঙ্গু হয়ে জীবন কাটাবে।’

‘আর কি বলতে পারি আমি? আমার ভুল হয়েছে।’

‘চমৎকার! তুমি ভুল স্বীকার করায় সব আবার ঠিকঠাক হয়ে গেলো, তাই না? শেডরাখ তার পা ফিরে পাবে, সিংহীটা আবার প্রাণ ফিরে পাওয়ায় আমার লাইসেন্স বাতিল হবে না....।’

‘কি করলে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে?’

‘সাফারি শেষ হতে আর ত্রিশ দিন বাকি,’ তিস্তকণ্ঠে বললো শন। ‘আমি চাই এই ত্রিশটা দিন তুমি আমার ঘাড়ে চড়বে না। সাফারি বাতিল করে তোমাকে আমি আমেরিকায় ফেরত পাঠাচ্ছি না একটি মাত্র কারণে, তোমার বাবা দারুণ একজন মানুষ, তাঁর আনন্দটুকু মাটি করতে চাই না। কি বলতে চাই বুঝতে পারছো তো? আমার কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে থাকবে তুমি আমার কোনো ব্যাপারে নাক গলাবে না। ঠিক আছে?’

‘বেশ।’

ফেরার পথে আর কোনো কথা হলো না। ইতিমধ্যে আগুন জ্বলেছে জোব আর মাতাউ গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি শেডরাখের পাশে চলে এলো শন। ‘ব্যথা কি রকম?’

‘বেশি না,’ যতোই ব্যথা হোক, স্বীকার করবে না শেডরাখ। সে না একজন আফ্রিকার পুরুষ!

শেডরাখকে মরফিন ইন্জেকশন দিলো শন। ওষুধ কাজ শুরু করার পর ধরাধরি করে ট্রাকে তোলা হলো তাকে। ওরা অপেক্ষায় থাকলো, জোব আর মাতাউ ছাল ছাড়ালো দস্যুরানী ও ফ্রেডেরিক দ্য গ্রেটের। ‘সিংহ বটে,’ রিকার্ডো বললো শন। ‘গর্ব করার মতো একটা ট্রফি পেলেন আপনি।’

বিষণ্ণ চোখে তাকালেন ক্যাপো। ‘চলুন শেডরাখকে ক্যাম্পে নিয়ে যাই।’

সাবধানে গাড়ি চালালো শন, শেডরাখ যাতে ঝাঁকি না খায়। জেদ করে শেডরাখের সাথে ট্রাকের পিছনে বসলো ক্লডিয়া, ট্রাকারের মাথাটা তুলে নিলো নিজের কোরে তার মাথার চুলে আঙুল চালালো ধীরে ধীরে, চোখ দুটো ছলছল করছে।

সামনের সিটে শনের পাশে বসেছেন ক্যাপো 'এরপর কি আশা করতে পারি আমরা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'সিংহী হত্যার দায়ে গেম ডিপার্টমেন্ট সত্যি সত্যি আপনার লাইসেন্স বাতিল করে দেবে?'

'ক্যাম্পে পৌছে হারারেতে রেডিও মেসেজ পাঠাবো,' বললো শন। 'শেডরাখের জন্যে এয়ারপোর্টে একটা অ্যাম্বুলেন্স রাখবে ওরা। দু'দিনের জন্যে যাবো আমি-শেডরাখকে দেখবো, তদবির করবো লাইসেন্সটা যাতে বাতিল না হয়।'

'লাইসেন্স বাতিল হলে আপনি বিপদে পড়বেন, আমি বুঝি,' বললেন ক্যাপো। 'আমার যদি কিছু করার থাকে, অবশ্যই করবো আমি, শন। আমি লিখিত দিতে পারি, সিংহীকে আমি গুলি করেছি...।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপো। গেম ডিপার্টমেন্টের নীতি হলো, ক্রায়েন্টদের কোনো ভাবে দায়ী করা যাবে না। যাই ঘটুক না কেন, মাশুল দিতে হবে আমাকে। এমনকি ওরা আপনার সাফারিও বাতিল করবে না। আপনার সাফারির মেয়াদ শেষ হলে শুরু হবে আমার সাজা। ভয় নেই, তুকুটেলাকে শিকার করার সময় আপনি আমাকে পাশে পাবেন।'

'শন, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি যেনো একটা স্বার্থপর বেজন্মা। আমি আপনার জন্যে চিন্তিত, চিন্তিত আপনার লাইসেন্সের জন্যে, নিজের আনন্দ-ফুর্তির কথা ভাবছি না।'

'দু'জনেই আমরা সময়টা উপভোগ করবো, ক্যাপো। লাইসেন্সটা যদি সত্যি হারাই, এবারই তাহলে শেষবার আমরা একসাথে শিকার করবো।'

পিছন থেকে ওদের কথা সবই শুনতে পেলো ক্লডিয়া, জানে শনের শেষ কথার উত্তরে কেন কিছু বললেন না তার বাবা। বাবা জানান, এটাই তাঁর শেষ শিকার অভিযান, লাইসেন্স থাক বা না থাক। গত কয়েক ঘন্টা ধরে মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ক্লডিয়া, এখন বাবার কথা ভাবতে গিয়ে চোখ দুটো তার পানিতে ভরে উঠলো। তারপর একা শুধু বাবার জন্যে নয়, আরো অনেকের জন্যে কান্না পেলো তার। কান্না পেলো দস্যুরানীর জন্যে, তার ভুলে প্রকৃতির অমন একটা চোখ-ধাঁধানো শোভা অকালে ঝরে পড়লো। কান্না পেলো বাচ্চা তিনটির জন্যে। বিদেতে কষ্ট পাবে, দেখাশোনার কেউ না থাকায় হয়েনারা খেয়ে ফেলবে। কান্না পেলো শেডরাখের জন্যে। সরল একটা মানুষ, কর্মঠ, কিন্তু পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকবে-যদি বাঁচে।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো ক্লডিয়া, এক ফোঁটা পানি পড়লো শেডরাখের কপালে। চোখ খুলে অবাক হয়ে তাকালো সে। আঙুল দিয়ে তার কপালটা মুছে দিলো ক্লডিয়া, কমলের ভেতর হাত গলিয়ে বুকে আঙুল বুলালো। 'তুমি ভালো হয়ে যাবে, শেডরাখ,' ধরা গলায় বললো সে। নিজেও জানে, কতো বড়ো মিছে কথা ওটা।

\* \* \*

রেডিওর সাথে টয়োটার বারো-ভোল্ট ব্যাটারির সংযোগ দিয়ে এরিয়াল ফিট করলো শন, রোজ রাতের মতো আজও ওর হারারে অফিসের সাথে কথা বললো। অপরপ্রান্তে অপেক্ষা করছিল গুজরাটি মেয়ে রীমা, তার মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ভেসে এলো। হিন্দু এই মেয়ে কোটনি সাফারির হারারি অফিস দেখভাল করে।

‘এদিকে সমস্যা হয়েছে,’ যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলে চলে শন। ‘আমি চাই বিমানবন্দরে একটা অ্যামবুলেন্স যেনো রেডি থাকে।’

‘ঠিক আছে, শন।’

‘আগামীকাল সকাল দশটায় জোহানেসবার্গে আমার ভাই, গ্যারিক কোটনির সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগের ব্যবস্থা করো।’

‘ঠিক আছে, শন।’

‘আগামীকাল বিকালে গেম ডিপার্টমেন্টের পরিচালকের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলো।’

‘পরিচালক ওয়াইন্ডলাইফ কনফারেন্স উপলক্ষ্যে নিউ ইয়র্কে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে। তার বদলে দায়িত্বে রয়েছেন ডেপুটি ডিরেক্টর।’

‘ঠিক আছে, রীমা। তাহলে ডেপুটি ডিরেক্টর জিওফ্রে ম্যানগুজার সঙ্গেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করো।’

‘পরিস্থিতি ঋণাত্মক মনে হচ্ছে, শন?’

‘ঠিক তাই।’

‘আচ্ছা। তোমার আসার সময় জানাও।’

সন্ত্রাসবাদী হামলার কারণে হারারি এয়ারপোর্ট আগে থেকেই টাইম-টেবিল ঠিক করে রাখে।

‘পাইলট ছাড়াও দুজন থাকবে সাথে। ২৩০০ ঘন্টায় হারারি পৌঁছবো।’

যোগাযোগ কেটে দিলো শন।

টয়োটা নিয়ে এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছতে আধা ঘন্টা লাগলো। গাড়িতে ক্যাপো আর ক্লডিয়া থাকলো। বীচক্র্যাফট প্লেন থেকে পিছনের সিটগুলো তুলে ফেললো শন, খালি জায়গাটায় শেডরাখের জন্যে নরম কম্বল পাতা হলো। ইতিমধ্যে গায়ের তাপমাত্রা একশো এক ডিগ্রীতে পৌঁচেছে শেডরাখের, প্রলাপ বকছে। ড্রেসিং খুলে ক্ষতটা পরীক্ষা করার সাহস হয়নি শনের, কি না কি দেখতে হয়। প্লেনে তোলার পর আবার তাকে পেনিসিলিন দিলো ও। শেডরাখের সাথে তার স্ত্রীকেও হারারেতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাপড়ে বাঁধা বাচ্চাটাকে পিঠে ঝুলিয়ে প্লেনে চড়লো সে, বসলো শেডরাখের পাশে, কান্না থামাবার জন্যে ব্লাউজের বোতাম খুলে দুধ খাওয়ালো বাচ্চাকে।

‘চিন্তা করবেন না, যাই ঘটুক না কেন, দু’দিনের মধ্যেই ফিরবো আমি,’ বিদায় নেয়ার সময় রিকার্ডকে বললো শন। ‘আপনারা কিন্তু ক্যাম্প ছেড়ে বেশি দূরে কোথাও যাবেন না।’

শনের সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন রিকার্ডো মনটেরো। ‘আমাদের কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। শেডরাখের ওপর খেলায় রাখবেন।’

বেনী বাদ দিয়ে চুল খোলা রেখেছে আজ ক্লডিয়া। বড়ো বড়ো দুই চোখে নরম আর উষ্ণ দৃষ্টি। টয়োটার হেডলাইটের আলোয় তার নখর শরীর যেনো আরো মোহনীয় দেখায়। হঠাৎ করেই শন বুঝলো, এই মেয়ে দারুণ সুন্দরী।

করমর্দনের জন্যে ক্লডিয়া হাত বাড়াতে চাচ্ছিলো, কিন্তু দেখতে না পাবার তান করে ঘুরে দাঁড়ালো শন, মই বেয়ে উঠে পড়লো পেনে।

আকাশে উঠে পড়ার পর আসছে দিনের ঘটনাবলী নিয়ে ভাবার অবকাশ পেলো সে। ও জানে, ডেপুটি ডিরেক্টরের সঙ্গে মিটিংটা খারাপ হবে। পরিচালক হুদ্রলোক ওর বন্ধু মানুষ, রোডেশিয়ান সরকারে এখনো যে কজন ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট রয়েছেন, তিনি তাদের একজন। কিন্তু জিওফ্রে ম্যানগুজা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতে গড়া। কালো আদমী।

বুশ ওয়ারের সময় দুই পক্ষে লড়েছিলো সে আর শন। গেরিলা লড়িয়ে এবং রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব ম্যানগুজা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে, তিনি পেশাদার শিকারীদের একদম পছন্দ করেন না, আর শেতাঙ্গ হলে তো কথাই নেই।

হারারে এয়ারপোর্টে নেমে রীমাকে পেলো শন। আধুনিক ভারতীয় নারীর মতোই শাড়ি বাদ দিয়ে সুট পড়েছে সে। কিন্তু এতো আধুনিকও হয়নি যে নিজের বর নিজেই পছন্দ করবে। রীমার বাপ-চাচার ছেলে ঠিক করেছে তার জন্যে, কানাডাবাসী ভারতীয় এক অধ্যাপককে। কোর্টনি সাফারির এক মূল্যবান অলঙ্কার হলো গে এই রীমা, ও চলে গেলে কি হবে শন জানে না।

হালকা প্লেনগুলোর জন্যে নির্ধারিত হাঙ্গারের পাশে একটা অ্যাংকুলেঙ্গ অপেক্ষা করছে। কোম্বি-র একটা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো শেডরাখকে। রীমার চটপট গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিঠি পত্র পড়ে গেলো।

‘আটলান্টার সার্জন, কার্টার সাহেব তার সাফারি বাতিল করেছেন...’ একুশ দিনের সাফারি ছিলো ওটা; শন চমকে উঠতে হাসলো রীমা। ‘মিউনিখের সাবান প্রস্তুতকারক, হের বুখনারকে ফোন করেছি আমি। ওই যে, গত ডিসেম্বরে বাদ দিয়েছিলো সাফারি। উনি লুফে নিয়েছেন এই একুশ দিনের প্রস্তাব। কাজেই, আমরা বুক।’

‘আমার ভাইয়ের কি খবর?’ বাধা দিয়ে শন বলে।

‘বিকেলে তোমার ফোনের অপেক্ষায় আছেন উনি। ফোন কাজ করছে এখনো।’ জিম্বাবুয়েতে টেলিফোন সবসময় কাজ করা একটা বিরল ঘটনা।

হাসাপাতালে আরো জনা পঞ্চাশেক সিরিয়াস রোগী ভর্তির অপেক্ষায় আছে। শেডরাখের স্ট্রুচার একপাশে সরিয়ে রাখা হলো।

‘দেখি কি করা যায়,’ বলে এগিয়ে গেলো রীমা। ভুবনভোলানো হাসির সঙ্গে কথা বলতে লাগলো ভর্তি কেরানীর সাথে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেডরাবের ভর্তির সমস্ত কাগজপত্র সম্পন্ন হলো। পূর্ব জার্মানির একজন ডাক্তার তাকে দেখতে এলেন।

‘কতো লাগলো ঘুম?’ শন জানতে চায় ব্রীমার কাছে।

‘অল্প। এক ব্যাপ্তি ওকনো মাংস।’

সাক্ষরির ক্রান্তিদের কল্যাণে শেবা অল্প বিস্তার জার্মান ভাষায় শন ডাক্তারকে বুঝিয়ে বললো শেডরাবের ইতিহাস। এরপর ফিরে এলো শেডরাবের কাছ থেকে কিনার নিতে।

‘ব্রীমার কাছে টাকা আছে। কোনো প্রয়োজন হলে, শুকে বললেই চলেবে।’

‘যখন ভুকুটলোকে শিকার করবেন, আমি কল্পনায় আপনার পাশে থাকবো,’ নরম স্বরে বললো শেডরাব। উত্তর দেওয়ার আগে অনেক কষ্টে কান্না গিলে নিলো শন।

‘আমরা দুজান মিলে আরো অনেক বড়ো হাতি শিকার করবো হে!’ বলে, আর দাঁড়ালো না সে, তান্ত্রতাড়ি বেরিয়ে এলো হাসপাতাল থেকে।

পরদিন সকালে ভাইব্রের অফিসে কোন করতেই নানান শব্দজট ভেসে এলো শনের কানে।

‘গ্যারিক কোর্টনি এমন বোর্ড মিটিং এ রয়েছেন,’ কোর্টনি গ্রুপের হেডকোয়ার্টার, সেনটাইন হাউজ থেকে বললো অগারেটর মেয়েটা। ‘তবে আপনার কল সরাসরি তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ আছে।’

‘শন!’ গ্যারির গভির, শক্তিশালী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো লাইনে। কেমন করে এতো শক্ত হয়ে উঠলো ও?

শন চাইলে কোর্টনি অফিসে গ্যারির কাজটা পেতে পারতো। যাই হোক, পরিবারের বড়ো ভাই সে। কিন্তু অমন কাজ গুরু ধাতে নয় না। তবে, মাঝেমধ্যে গ্যারির রোলস্ রয়েস, নিয়ার জেট আর ফ্রান্সের ভিলায় অবকাশ যাপন দেবলে গুরু হিংসা হয়।

‘হ্যালো, গ্যারি! সব কেমন চলছে?’

‘একদম ঠিকঠাক,’ গ্যারি বলে চলে। ‘কোনো সমস্যা?’ সাধারণত কোনো সমস্যা না হলে দুই ভাইব্রের কথা হয় না।

‘কিছু জায়গায় ঘুম দিতে হতে পারে,’ কূটনীতিবিদের মতো করে বলে শন।

‘ঠিক আছে। কেবল বলো কতো টাকা দিতে হবে, কোথায়,’ কোর্টনি সাক্ষরির চল্লিশ পার্সেন্ট শেয়ারের মালিক গ্যারি।

‘মন্যবাদ। আমি কাল তোমাকে ফোন করে জানাবো। বাকি সব কি অবস্থা?’ আরো কিছুক্ষণ টুকটাকি কথা পর কোন রাখলো শন। আউটার অফিসে ব্রীমা গুরু অপেক্ষায় আছে।

‘আজ বিকেল ৪:৩০-এ কমরেড জিওফ্রে ম্যানগুজার সঙ্গে তোমার বৈঠক।’ জানালো মেয়েটা।

লম্বা শরীরের একজন শোনা ম্যানগুজা। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। ক্রপালী ফ্রেমের চশমা চোখে, কালো নীল সুট। গায়ে যতো দামী পরিচ্ছদ পড়া, তার কোনোটিই একজন মার্কসিস্ট-এর পরিচয় বহন করে না, অথচ ম্যানগুজা নিজেকে বাম পন্থি রাজনৈতিক বলে দাবী করে। কিন্তু নিজের ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ওকে সম্বাধন জানালো না ভদ্রলোক।

‘কর্নেল কোর্টনি দেখছি,’ বাঁকা হাসির সঙ্গে ওকে সম্বাধন করে বুঝিয়ে দিলো, যুদ্ধে ব্যালানটিন স্কাউটে শনের পদবীর কথা তার মনে আছে। আরো বুঝিয়ে দিলো, তারা পরস্পরের শত্রু।

‘ওধু মিস্টার বললেই চলবে,’ শন বলে। ‘ওসব যুদ্ধের ব্যাপার এখন অতীত, কমরেড ম্যানগুজা।

‘কি করতে পারি আপনার জন্যে?’

‘দুঃখজনক ব্যাপার.. আমার সাফারিতে ভুলবশত একটা নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে...’ পুরো ঘটনার বর্ণনা শেষ করে রীমার টাইপ করা কিছু পাতা ডেপুটি ডিরেক্টরকে দিলো শন।

‘আপনি নিশ্চই অবগত আছেন, কর্নেল কোর্টনি,’ ইচ্ছেকৃত ভাবেই আবারো শনের র‍্যাক্ উচ্চারণ করলো ম্যানগুজা। ‘এই ব্যাপারে আমার কঠোর অবস্থান নিতে হবে। মনে হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্ট এবং স্টাফদের প্রতি কোনো দায়িত্ববোধই নেই আপনার। জিহ্বাবুয়ে এখন আর কোনো ব্রিটিশ কলোনি নয়, আমাদের লোকেদের আগে মতো চাকর ভাববেন না।’

‘পরিচালকের কাছে রিপোর্ট করার আগে আমার কিছু কথা শুনুন।’

‘বলুন, কর্নেল।’

‘এখন তো পাঁচটা বেজে গেলো। চলুন না হয়, গলফ ক্লাবে কক্ষা হোক।’

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ম্যানগুজা বলে, ‘ঠিক আছে। আধ ঘন্টা পরে ক্লাবে দেখা করুন।’

ক্লাবে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলো ম্যানগুজা, শনকে। অবশেষে যখন ওর বিপরীতে বসলো সে, মুচকি হেসে বললো, ‘কি মজা, তাই না? আরো কয়েক বছর আগে একজন কালো আদমী কেবল ওয়েটার হিসাবে এখানে প্রবেশ করতে পারতো। আর এখন আমি কমিটি মেম্বর!’

এটা সেটা বলে পরিবেশটা হাক্কা করতে চাইছিলো শন, কিন্তু তা হবার নয়।

‘আপনি কিছু ব্যাপার বলতে চাইছিলেন?’

‘প্রথমত, মি. ম্যানগুজা, আমি আপনাকে বলতে চাই যে, চিউইউই কনসেশনকে আমি এবং আমার পরিবার অত্যন্ত গুরুত্ব দিই।’ ইচ্ছে করেই গুরুত্ব শব্দটা উচ্চারণ করলো শন। ‘আমি ফোনে আমার পার্টনারদের সঙ্গে কক্ষা বলেছি সকালে, যে কোনো মূল্যে এই সমস্যা থেকে মুক্তি চায় তারা।’

কিছু সময় চুপ থেকে শন আবাবো বললো, 'আমি পার্টনারদের বলেছি, গেম ভিপিআর্টমেন্টে আপনি সবচেয়ে প্রভাবশালী লোক, শেতাঙ্গ ডিরেক্টর কেবল লোক দেখানো। দশ হাজার ডলার। আপনার মনোনীত যে কোনো একাউন্টে যে কোনো দেশে পাঠাতে পারি।'

কঠোর চোখে শনের দিকে তাকিয়ে আছে ম্যানগুজা। থেমে পড়লো শন। সামান্য কঁপে গেলো ম্যানগুজার গলা, 'আমাকে ঘুষ দিয়ে কিনে নিবেন- এমন ধারণা অত্যন্ত অপমানজনক। তা ও না হয় সহ্য করা গেলো, কিন্তু আমার দেশের স্বাধীনতার জন্যে যেসব মুক্তিকামী জনগনকেও লড়েছে, তাদেরকে ও আপনি অপমান করলেন- এটা সহ্য করার মতো নয়। মার্কসিস্ট মতাদর্শকে অপমান করলেন আপনি।'

'আরে, ভাই, আমি কেবল আমার কনসেশন ফেরত চাই; আফ্রিকায় দাস প্রথা নয়!'

'যতো পারেন, হেসে নেন, কর্নেল কোর্টনি। আপনি শেতাঙ্গ। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আমরা ভালোই জানি। যে ম্যাটাবেল হলিগানদের দোসর ব'নিয়েছেন- তাও অজানা নয়। গনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা আপনাকে মদদ দিয়েছে। আপনি তাদের লিডার।'

'আমি ভুলক্রমে একটা সিংহীকে গুলি করেছি, আমার একজন ক্যাপিটালিস্ট ব্রোডার তার কামড় খেয়েছে।'

'আপনার গতিবিধির উপর আমরা লক্ষ্য রাখছি, কর্নেল।' ভয়ংকর স্বরে বললো ম্যানগুজা। 'নিশ্চিত থাকেন, আপনার এই অপরাধের কথা আমি উপযুক্ত কতৃপক্ষের কাছে জানানো।'

বাট করে উঠে দাঁড়িয়ে বের হয়ে গেলো জিওফ্রে ম্যানগুজা।

'তো,' মাথা ঝাঁকায় শন। 'চিউইউই কনসেশন- বিদায়! সব শেষ।' পেটের ক্ষতীরে বাজে একটা অনুভূতি গুলিয়ে উঠছে থেকে থেকে।

\* \* \*

নিজের অফিসে ফিরে এলো শন। রীমা বললো, ‘যতীবানেক আগে ক্লিনিক থেকে ফোন করেছিল ওয়া। কেটে বাদ দেয়া হয়েছে শেডরাবের পা।’

অনেকক্ষণ নড়লো না শন, কথাও বলতে পারলো না। শুকে একা রেখে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলো রীমা। রীমা বেরিয়ে যেতে কাইলিং কেমিন্টে খুলে শিতাস ত্রিগালের একটা বোতল আর গ্লাস বের করলো ও। ব্রাভটা আফ অফিসের সোকার বসেই কাটিয়ে দেবে, হোটেলের ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

সকালে রীমা শনের ক্লাইট গ্যান বুক করতে হাসপাতালে শেডরাবের কাছে ফিরে এলো ও।

কোমড়ের একটু নিচে থেকে শেডরাবের পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

জামান ভাস্কর এক-রে প্রেট দেখালেন শুকে, কালেন, ‘আর কোনো উপায় ছিলো না।’

সার্জিকাল ওয়ার্ডে বসবার কোনো ব্যবস্থা নেই, শেডরাবের বিছনার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো শন। পুরনো শিকার অভিযানের কথা উঠলো, দু’জনের কে কবে ভয়ংকর সব বুকি নিয়েছে। পায়ের কথা কেউই ভুললো না। গ্রোমহনের জন্যে আর কিছু বন্ধন পাওয়া গেলো না, ওয়ার্ড সিস্টারের হাতে একশো ডলারের একটা নোট ভেঁজে দিয়ে চলে এলো শন, শেডরাবের ওপর বেয়ান রাখবে সে।

সবাসরি এয়ারপোর্টে চলে এলো শন। আসেই নৌচেছে রীমা, ক্লাইট গ্যান নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ইতিমধ্যে ফুয়েল ভরা হয়েছে বীচক্র্যাকটে, ক্যাম্পর জন্যে প্রয়োজনীয় বসদণ্ড তোলা হয়েছে।

‘তোমার মতো মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের কথা, রীমা,’ বললো শন। ‘কিন্তু নাইসেন নেই তো অফিসও নেই।’ গতকাল জিওফ্রে ম্যানভজার সঙ্গে বৈঠকের কথা বলে বললো ও। ‘তোমার চাকরি বোজা উচিত।’

‘সত্যি আমি দুঃখিত, শন’ বললো রীমা। ‘তবে আমার কথা ভেবে উন্নি হবেন না। কথাটা কিতাবে বলবো বুঝতে পারছিলাম না। সেটেকরের বোলো তারিখে কানাডায় চলে যাচ্ছি আমি। সব পাকা হয়ে গেছে, ওখানে এক প্রফেসর ভদ্রলোকের সাথে আমার বিয়ে।’

‘আমি চাই তুমি সুখী হও।’ রীমার হাত ধরে ক্ষুদ্র চাপ দিলো শন, এই প্রথম তাকে স্পর্শ করলো। আনন্দ ও লজ্জায় রাগা হয়ে উঠলো রীমা, আরো সুন্দরী দেখালো তাকে।

ক্যাম্পের ওপর দু’বার চকর দিয়ে এয়ারস্ট্রিপে চলে এলো শন। পুন থেকে নামলো ও, দেখলো টয়েটাও পৌছে গেছে। পুন থেকে কার্গো নামালো জোব আর তাউ। তাদের কাজ শেষ হতে শেডরাবের পায়ের কথাটা বললো শন।

ফেরার পথে শোকে যেনো পাথরের মতো ভারি হয়ে থাকলো ওদের মাঝখানে, কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না। ওরা চারজন খুদে একটা বাহিনীর মতো ছিলো-একসাথে যুদ্ধ করেছে, শিকার করেছে, গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। শেড়ান্ন নয়, যেনো গোটাবাহিনীটাই পত্ন হয়ে গেছে।

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে জোব বললো, আমাদের নতুন একজন বন্দুকবাহকের দরকার হবে। পিউমুলা, চামড়া খানাই করে, বেশভালো লোক।’

‘হ্যাঁ, তাকেই নেবো আমার,’ বললো শন।

কোনো কথা না বলে টয়োটার চড়ে বসলো ওরা সবাই।

\* \* \*

সেই সন্ধ্যায় ডিনারে স্ন্যাকস-এর বদলে ঢিলে-ঢালা সাদা শিফনের একটা ড্রেস পরেছিলো ক্লডিয়া, শিফনের গায়ে জরি ও নীলকান্তমণির অলংকার। তার দুখে আলতা গায়ের রঙ আর 'কালো চুলের সাথে পোশাকটা এতো মানিয়েছে যে চোখ ফেরানো দায়। তবে চোখ থেকে প্রশংসার ভাবটা লুকিয়ে রাখলো শন, কথা বললো শুধু তার বাবার সাথে।

শেডরাখ এবং গেম ডিপার্টমেন্টের সীদ্ধান্ত সম্পর্কে বললো শন, সেই সাথে বিস্ময় হয়ে উঠলো পরিবেশ। পুরুষদেরকে ক্যাম্প-ফায়ারের কাছে রেখে নিজের তাঁবুতে ফিরে গেলো ক্লডিয়া, খানিক পর ক্যাপোও শনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ডাইনিং টেবিল থেকে এক বোতল হুইস্কি নিয়ে জোবদের গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলো শন।

গ্রামের এক প্রান্তে দুই বউকে নিয়ে থাকে জোব, একচালা ঘরে। ঘরের সামনে আশুপেরদ্বারে শনকে বসালো জোব, তার এক বউ শনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো, হাতে দুটো স্নপ। দুটো মগেই বেশ খানিকটা হুইস্কি ঢাললো শন। আশুনের আরেক ধারে বসে আছে জোব, বউয়ের হাত থেকে একটা মগ নিয়ে শনকে স্যালুট করলো সে। দ্বিতীয় মগটা নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলো বউ।

কেউ কোনো কথা বললো না ওরা। সরাসরি বোতল থেকে খানিকটা হুইস্কি খেলো শন। গোআই নদীর তীরে জন্ম জোবের, শন জানে, লোকাল মিশন স্কুলে পড়েছে সে। রাজনীতি, ইতিহাস এবং নৃবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে রোডেশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে। ইয়ান স্মিথ যে বছর একক স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন, সেই একই বছরে মাস্টার্স করেছে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে।

‘এতো মন খারাপ করার কিছু নেই,’ অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলো জোব ‘একটা না একটা উপায় পাওয়া যাবে।’

‘দেখার আর কিছু নেই,’ বললো শন। ‘কনসেশনটা গেছে।’

‘আমার নামে অ্যাগ্রাই করবো,’ প্রস্তাব দিলো জোব, চোখেদুট হাসি ঝিক করে উঠলো ‘আপনি আমাকে বাওয়ানা বলে ডাকবেন তখন!’

দু’জন হেসে উঠলে একসাথে, হালকা হয়ে গেলো পরিবেশটা। খানিক পর জোবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্ধকার পথে পা বাড়ালো শন।

ক্যাম্পে ফিরে এলা শন, নিজের তাঁবুর দিকে এগোচ্ছে। সামনের একটা গাছের আড়াল থেকে কি যে বেরিয়ে এলা। ধক্ করে উঠলো শনের বুক তারপর লক্ষ্য করলো, ওটা একটা ছায়ামূর্তি। গাছের আড়াল থেকে তাঁদের আলোয় বেরিয়ে আসতে চেনা গেলো ক্লডিয়াকে। ‘তোমার সাথে কথা বলতে পারি?’ জিজ্ঞেস করলো সে।

‘পারো,’ শন নির্লিপ্ত।

‘এ-সব আমি ভালো পারি না,’ স্বীকার করলো ক্লডিয়া, কিন্তু শন তাকে উৎসাহ বা সাহস জোগাতে রাজিনয়। ‘বলছিলাম কি, আমাকে কি ক্ষমা করা যায় না?’

‘তুমি ভুল লোকের কাছে ক্ষাম চাইছো, আমার তো দুটো পা-ই সক্ষম রয়েছে।’

শিউরে উঠলো ক্লডিয়া, গলাটা কেঁপে গেলো। ‘তোমার মনে কোনো দয়া নেই, তাই না?’ চিবুকটা উঁচু করলো সে। ‘বেশ, মানলাম, এ-সব আমার পাওনা হয়েছে। নীতান্ত বোকামের মতো আচরণ করেছি, ফলে সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে গেছে। এ-ও জানি যে আমার ক্ষমা চাওয়ার ক্ষতিগূর্ণ হবার নয়। আমি শুধু জানাতে চাই, নতি আমি দুঃখিত।’

‘তুমি আর আমি, দু’জন সম্পূর্ণ আলাদা জগতের মানুষ, কোনো ব্যাপারেই কোনো মিল নেই। পরস্পরকে কখনোই আমরা বুঝতে পারবো না, বন্ধু হওয়া তো দূরের কথা। তবে বুঝতে পারি, কথাটা বলার জন্যে নিজের সাথে কি রকম যুঝতে হয়েছে তোমার।’

‘তুমি কি আপোষেও আপত্তি করবে?’ জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া। ‘এমনকি শক্রাও আপোষ করে।’ শনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে অপেক্ষারয় থাকলো সে।

‘ঠিক আছে, আপোষ।’ ক্লডিয়ার হাতটা ধরে সামান্য ঝাঁকি দিলো শন। তার হাতের তালু গোলাপ পাপড়ির মতো সমৃণ ও ঠাণ্ডা, তবে মুঠোটা যে-কোনো পুরুষের মতো কঠিন।

‘ওভরাত্রি,’ বললো ক্লডিয়া, শনের হাত ছেড়ে দিয়ে ঘুরলো।

নিজের তাবুতে ফিরে যাচ্ছে মেয়েটা, তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকলো শন। পূর্ণ আকৃতি পেতে আর দু’দিন বাকি চাঁদের তার উজ্জ্বল আলোয় সাদা পোশাকটা ঝলমলে আর মায়াবী লাগলো। কাপড়ের নিচে ক্লডিয়ার শরীর একহারা, হাত-পা লম্ব আর সুগঠিত।

এই মুহূর্তে মনে মনে মেয়েটার সৎ সাহসের প্রশংসা না করে পারলো না শন। পরিচয়ের পর এই প্রথম ক্লডিয়ার ব্যাপারে মনের তরফ থেকে অনুকূল সাড়া পেলোও।

\* \* \*

পাতলা ঘুম, তাঁবুর ক্যানভাসে সামান্য একটু আঁচড় লাগতেই পুরোপুরি সজাগ হলো শন, হাত চলে গেলো টর্চ আর .৫৫৭ রাইফেলের দিকে। মাথার কাছে, নাগালের মধ্যে রয়েছে ওগুলো। ‘কে?’ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো

‘আমি, জোব।’

হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রাখলো শন তিনটে বাজে। ‘ভেতরে ঢোকো, কি খবর?’

‘ক্যাম্পে আমাদের একজন ট্র্যাকার এসেছে। নদীর ধারে পাহারায় ছিলো। বিশ মাইল দৌড়াতে হয়েছে তাকে।’

ঘাড়ের পিছনে চুল খাড়া হয়ে গেলো শনের। লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়লো ও ‘বলো!’

‘আজ সন্ধ্যায়, সূর্য ডোবার সময়, ন্যাশনালপার্ক থেকে বেরিয়ে এসে নদী পেরিয়েছে তুকুটেলো।’

‘সত্যি?’

‘সত্যি। ট্র্যাকাররা সবাই দেখেছে। তুকুটেলোই ওটা, যেনো রেগে ভোম’ গলায় কোনো কলার নেই।

‘মাতাউ কোথায়?’ ব্যস্ত হাতে প্যান্ট পরছে শন, খুদে নদোরণে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলো ভেতরে।

‘আমি রেডি, বস।’

‘ওউ। বিশ মিনিটের ভেতর রওনা হবো আমরা। মার্চিং প্যাক আর ওয়াটার বটল নিতে হবে। শেডরাখের জায়গায় পিউমুলাকে নিচ্ছি আমরা। আলো ফেটার আগেই তুকুটেলার পায়ের ছাপ দেখতে চাই আমি।’

খালি গায়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলা শন, ক্যাপোর তাঁবুর কাছাকাছি আসতেই ভেতর থেকে নাক ডাকার আওয়াজ পেলো। ‘ক্যাপো! জেগে আছেন? তুকুটেলো আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।’ নাক ডাকার শব্দ থেমে গেলো, ঘুম ভেঙে গেছে ক্যাপোর।

‘তুকুটেলো, ভাই আমার, তোমার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি আমি!’ অন্ধকার তাঁবুর ভেতর হাতড়াচ্ছেন ক্যাপো। ‘দূর ছাই, আমার প্যান্টটা গেলো কোথায় শন, ক্লডিয়ার ঘুম ভাঙাবে, গ্লিভ?’

ক্লডিয়ার তাঁবুতে আলো জ্বলছে। নিশ্চয়ই চোঁচামেচিতে ঘুমভেঙে গেছেতার। পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো শন, ‘জেগে আছো?’ পর্দা সরিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়ালো ক্লডিয়া, পিছনে হারিকেন। রাতের কাপড়টা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, হাতা আর গলার কাছে লেস লাগানো। কাপড়টা এতোই মিহি যে ভেতরে ঢুকতে কোনো বাধা পায়নি আলো, নগ্ন শরীরের কাঠামো স্পষ্টভাবে ফুটে আছে।

‘শুনেছি,’ বললো সে। ‘এখুনি তৈরি হয়ে যাবো আমাদের কি হাঁটতে হবে? কি পরবো, হাইকিং বুট নাকি মোকাসিন?’

‘হাঁটতে হবে,’ কর্কশ স্বরে বললো শন। ‘জীবনে কখনো এতো হাঁটোনি।’ একবারে বেহায়ার মতো নিজের শরীর দেখাচ্ছে মেয়েটা— মনে মনে বললো সে। কিন্তু একটা বিষয়ও ঠিক— বেহায়া মেয়েরা শনকে যথেষ্ট আকর্ষণ করে! ‘ঠিক যখন একটু শ্রদ্ধাবোধ করতে শুরু করেছিলাম— এমন বেহায়াপনা!’ মনে মনে বললো শন। মুখে উঠে আসা ভৎসনাটা গিলে ফেললো ও, কিন্তু নম্র শরীরের কোমড়ের মস্ন বাকো চোখ চলে গেছে নিজের অজান্তেই। ইচ্ছে না থাকলেও অনেকটা হা করেই চেয়ে থাকলো শন। শেষমেষ, ছেড়ে দিলো তাবুর পর্দা।

‘সন্ধি, না ছাই! এখনো মেয়েটা আমাকে বিরক্ত করতে চাইছে,’ মনে মনে সিদ্ধান্তে পৌঁছলো শন কোর্টনি।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের তাবুর দিকে ছুটলো ও, শেডরাখের পা আর নিজের লাইসেন্স হারাবার কথা আপতত ভুলে গেছে। এই তুকুটেলা আফ্রিকা মহাদেশের একটা কিংবদন্তী, মেজাজী আর একগুয়ে মেয়েটার উপস্থিতিতে সেই অশুভ শক্তির সাথে যুদ্ধ হবে ওর, তাতে করে যেনো শিকার অভিযানের রোমাঞ্চ শতগুণ বেড়ে গেছে।

\* \* \*

পথের পাশে ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু, হেডলাইটের আলোর মুক্তোর মতো জ্বলজ্বলে। ঠাণ্ডায় জড়সড় হয়ে আছে প্রাণিকুল, বাধ্য না হলে টয়োটার পথ থেকে সরলো না। ভোর হবার ঘণ্টাখানেক আগে চিউইউই নদীতে পৌঁচুলো ওরা। চাঁদের আলোয় চকচকে আর কালো দেখালো পানি, দুই তীরের সার সার গাছগুলো রপালী মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, যেনো পৌরাণিক দানবদের প্রতিদ্বন্দ্বী দুটো বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে।

পথের শেষ মাথা থেকে অনেকটা পিছনে ট্রাক দাঁড় করালো শন। কিনারদের একজনকে টয়োটার পাহরায় রাখা হলো। পরিচিত ঝাঁকের আকৃতি নিলো দলটা, ক্লায়েন্টার মাঝখানে। পেছনে শেডরাখের জায়গাটা দখল করলো পিউমুলা। মাঝারি আকৃতির পেশীবহুল শরীর তার, উলের মতো নরম দাড়ি মুখে। ক্যাপোর রিগাবিটা বহন করছে সে।

দলের সবাইকেই কিছু না কিছু বইতে হচ্ছে, ক্যাপোও রেহাই পাননি। ক্লডিয়া তার নিজের পানির বোতলগুলো নিয়েছে। ক্যাপোর দ্বিতীয় রাইফেলটা রয়েছে জোবের কাছে। বরাবরের মতো শন কাঁধে রয়েছে .৫৭৭ নাইট্রো এক্সপ্রেস। শিকার অভিযান শুরু হলে এটা কখনো আর কারো হাতে দেয় না ও, রওনা হলো ওরা, যাচ্ছে উজানের দিকে। এক ঘণ্টার মধ্যে সয়ে এলো ঠাণ্ডা, গরম হয়ে গেলো শরীর, সেই সাথে বেড়ে গেলো হাঁটার গতি। শন লক্ষ্য করলো, লম্বা পায়ে গতি আছে ক্লডিয়ার, দলের বাকি সবার সাথে অনায়াসে তাল মেলাতে পারছে। শনের সন্ধানী দৃষ্টিতে প্রশংসার ভাব লক্ষ্য করে ঠোঁট টিপে মিষ্টি একটু হাসলো ক্লডিয়া।

ভোরে আলো ফুটতে শুরু করেছে, এই সময় বার্তাবহক ট্রাকার উল্লাসে ছোট্ট একটা লাফ দিলো, হাত তুলে দেখালো সামনেটা। নদীর পাড়ের কিনারায় সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা, পাহরায় রয়েছে একটা মেহগনি গাছ, পায়ের ছাপটা পরিষ্কারই দেখতে পেলো ওরা।

‘ওখানে!’ বললো ট্রাকার। ‘ছাপটার চারধারে আমি দাগ কেটে রেখেছি।’

একবার চোখ বুলিয়েই শন বুঝলো, প্রকান্ডদেহী প্রাণিদের নদী পার হওয়া জন্যে জায়গাটা আদর্শ। জলহস্তীরা নিয়মিত আসা-যাওয়ার করার একটা চওড়া পথ তৈরি হয়েছে। মোষের পালগুলোও এই পথ ব্যবহার করে। ট্রাকারে উল্লাস শুনে দলের সবাই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো, কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলো মাতাউ। ছাপটার সামনে দাঁড়ালো সে, মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে ঘাড় ফিরিয়ে শনের দিকে তাকালো তার মতামত জানার জন্যে অপেক্ষা করছে শন।

‘সে-ই!’ বাঁশীর মতো তীক্ষ্ণ স্বরে বললো মাতাউ। ‘তারই! এ আমাদের তুকুটেলা সব হাতির পিতা!’

মিহি ধুলোর ওপর বিশাল আকৃতির পায়ের ছাপটা কাছে এসে দেখলো শন। কি এক আবেগ ও উত্তেজনায় সারা শরীর শিরশির করে উঠলো ওর।

‘মাতাউ,’ বললো ও। ‘ছাপ অনুসরণ করো!’ অভিযান শুরুর ঘোষণা দিলো সে আনুষ্ঠানিক ভাবে।

\* \* \*

ছাপগুলো স্পষ্ট, গেইম ট্রেইল ধরে বনভূমির ভেতর ঢুকেছে, নদীটা পিছনে  
ব্রহ্ম। প্রাচীন হাতি নদী পেরুবার পর লম্বা পা ফেলে দ্রুত এগিয়েছে, যেনো জানা  
হচ্ছে, জায়গাটা বিপজ্জনক। বোধহয় সেজন্যেই সূর্যডোবার সময়টা বেছে নিয়েছে  
সে, যাতে দূরে সরে যাবার আগেই অন্ধকার তাকে ঢেকে ফেলে।

কোনো বিরতি ছাড়াই একনাগাড়ে পাঁচ মাইল এগিয়েছে সে, তারপর হঠাৎ  
ট্রেইল ছেড়ে ঘন কাঁটাঝোপের ভেতর ঢুকেছে। নতুন পাতা গিজিয়েছে ঝোপটায়,  
ঢালগুলো কচি। এখানে সে কখনো পিছু হটেছে কখনো সামনে বেড়েছে,  
নুন্ডেমচড়ে এককার হয়ে গেছে কাঁটাঝোপ, পায়ের ছাপগুলো এলানো।

জোবকে সাথে নিয়ে ঝোপের ভেতর ঢুকলো মাতাউ, পায়ের ছাপ কোনোদিকে  
সেছে জানার জন্যে। দলের বাকি সবাই পিছনে অপেক্ষায় থাকলো।

‘গলা শুকিয়ে গেছে!’ বেল্ট থেকে একটা পানির বোতল খুললো ক্লডিয়া।

‘না!’ বাধা দিলো শন। ‘প্রথমবার গলা শুকানোই যদি পানি খাও, সারাটা দিন  
শনি খেতে ইচ্ছে করবে তোমার।’

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো ক্লডিয়া, শনের কথা অমান্য করবে কিনা ভাবলো,  
তারপর বেল্টে বুলিয়ে রাখলো বোতলটা।

‘বুঝলাম, কঠিন লোকের পাল্লায় পড়েছি,’ বললো সে।

ঝোপের আরেক মাথা থেকে নরম শিস দিলো মাতাউ। ‘ছাপগুলো আলাদা  
করতে পেরেছে ও,’ বললো শন, দলের বাকি সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়লো ঝোপের  
ভেতর।

তুকুটেলার কাছ থেকে দশ ঘন্টার মতো পিছিয়ে রয়েছে ওরা। খাওয়ার জন্যে  
হতোবার থেমেছে সে, তার ছাপ ততোবার হারিয়ে গেছে, ফলে আরো পিছিয়ে  
পড়েছে দলটা। ‘এখানে বেশিক্ষণ থামেনি সে,’ বললো মাতাউ। ‘আবার ছুটতে শুরু  
করেছে।’

গেইম ট্রেইল ছেড়েপাথুরে একটা প্রান্ত ধরে এগিয়েছে তুকুটেলা, মনে হলো যে  
সচেতনভাবে পায়ের ছাপ গোপন রাখতে চেয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পরে এমন  
কোনে চিহ্নই নেই, তবে মাতাউ তাকে অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের  
সাথে।

‘আপনি ঠিক জানেন, মাতাউ কোনো ভুল করছে না?’ উদ্ভিগ্নস্বরে জানতে  
চাইলে ক্যাপো।

‘ক্যাপো, ওর সাথে আগেও বহুবার শিকার করেছেন আপনি, নিজেই তো  
জানেন।’

‘কিন্তু কি দেখছে ও? জানতে চাইলো ক্লডিয়া। ‘আমি তো পাথর ছাড়া কিছুই  
দেখছি না।’

‘পাথরে ঘষা খায় হাতির পা, শ্যাওলায় দাগ রেখে যায়, ধুলো থাকে। ভালো করে তাকাও, প্রতি জোড়া পাথরের মাঝখানে ঘাস দেখতে পাবে-ঘাসের ডগা কাত হয়ে থাকে, যেদিকে গেছে হাতি। কাত হয়ে থাকা ঘাসে আলো পড়ে অন্যভাবে।’

‘তুমি দেখতে পাও, অনুসরণ করতে পারো?’ জানতে চাইলো ক্লডিয়া, উত্তরে মাথা নাড়লো শন।

‘না, আমি জাদুকর নই,’ নিচু গলায়, ফিসফিস করে কথা বলছে ওরা, তবু সতর্ক করে দিলো শন, ‘আর কোনো কথা নয়, এখন থেকে সবাই চুপ।’

পাথুরে প্রান্তরে গাছপালার সংখ্যা কম নয়, কোথাও কোথাও এতাবেশি যে সম্পূর্ণ গ্রাস করলো ওদেরকে। তারপর আবার ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলা দলটা, দূরে দেখা গেলো পাহাড়ের মাথা, খোলা ঘাসবন, কিংবা সবুজ প্রান্তর।

নতুন জানো ঘাসের লোভে বনভূমি ছেড়ে এদিকে চলে এসেছে অনেক গুলো হরিণের পাল। খোলা জায়গায় বাঁকানো শিং উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা খাদ দেখালো ওরা, পাথুরে তলায় আটকে আছে পানি। পচা লতাপাতা পড়ে সবুজ হয়ে গেছে পানির রঙ। একবার থেকে এই পানিই খেয়েছে তুকুটেলা, পাশে রেখে গেছে স্পঞ্জসদৃশ হলুদ বিষ্ঠা। ‘এখানে আমরা দশ মিনিট বিশ্রাম নেবো,’ ওদেরকে বললো শন। ‘এখন তুমি এক ঢোক পানি খেতে পারো।’ ক্লডিয়ার দিকে তাকালো।

ক্যাপোর পাশ থেকে উঠে মাতাউর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো শন। পুল-এর মাথায় একা দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ‘কি ব্যাপার?’ জানতে চাইলো শন। দীর্ঘদিন একসাথে সময় কাটিয়েছে ওরা, মাতাউর মন-মেজাজ আন্দাজ করতে পারে ও। জবাবে মাথা নাড়লো মাতাউ, চেহারার ভাঁজগুলো আরো গভীর হলো।

‘এখানে কি যেনো একটা গোলমাল আছে,’ বললো সে। ‘তুকুটেলা স্বত্তিবোধ করেনি। একবার এদিকে গেছে, একবার ওদিকে। খুব জোরে হেঁটেছে, কিন্তু উদ্দেশ্য হীনভাবে। কিছু খায়নি সে, হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয় মাটি যেনো পুড়িয়ে দিয়েছে তার পা।’

‘কারণ কি, মাতাউ?’

‘জানি না,’ স্বীকার করলো মাতাউ। ‘তবে ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেকছে না, বাওয়ানা।’

তাকে একা রেখে ক্লডিয়ার কাছে ফিরে এলো শন ‘দেখি, তোমার পা দুটো পরীক্ষা করবো।’ শেষদিকে ক্লডিয়াকে সামান্য ঝোঁড়াতে দেখেছে ও।

‘মানে? তুমি সিরিয়াস?’ হাসতে শুরু করলো ক্লডিয়া।

কথা না বাড়িয়ে তার একটা পা নিজের কোলে তুলে নিলো শন, ফিতে খুলে বুট আর মোজা নামালো। তার হাতের মতোই সরু আর লম্বা পাঁটা, তবে চামড়া খুব নরম। গোড়ালি আর বড় আঙুলটার মাথার কাছে উজ্জ্বল লালচে দুটো দাগ দেখা গেলো। সর্জিকাল স্পিরিট ও কটন উল দিয়ে জায়গা দুটো পরিষ্কার করলো

শন। ‘আর পাঁচমাইল হাঁটলে এক থোকা আঙুরের মতো ফোঁসকা পড়বে পায়ে, দলে একজন পঙ্খ পাবো আমরা।’ টেপ দিয়ে দাগ দুটো জড়ালো ও। ‘মোজা বদলাও,’ নির্দেশ দিলো। ‘এরপর ব্যথা করলে সাথে সাথে জানাবে আমাকে।’

বাধ্য মেয়ের মতো শনের নির্দেশ পালন করলো ক্লডিয়া। তারপর ওরা রওনা হলো।

দুপুরের খানিক আগে আবার দিক পরিবর্তন করলো ছাপ, চলে গেছে পূর্বদিকে। ‘আগের মতো আর পিছিয়ে নেই আমরা,’ ফিসফিস করে রিকার্ডোকে বললো শন। ‘তারচেয়ে এক কি দু’ঘন্টা বেশি এগিয়েছি। কিন্তু মাতাউ ব্যাপারটা সহ্য করতে পারছে না। ভালো ঠেকছে না আমারও। উত্তেজিত হয়ে আছে তুকুটেলা। সোজা মোজাম্বিক সীমান্তের দিকে ছুটছে।’

‘আপনার কি মনে হয়, আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে?’ ক্যাপো উদ্বিগ্ন।

মাথা নাড়লো শন। ‘অসম্ভব। এখনো কয়েক ঘন্টা পিছিয়ে আছি আমরা।’

খাওয়া আর বিশ্রামের জন্যে কিছুক্ষনের জন্যে থামলো ওরা। আবার রওনা হয়ে এক মাইলও পেরোয়নি, ঢুকে পড়লো মারুলা গাছের জঙ্গলে ওদের পায়ের তলায় হুটলে ছড়িয়ে রয়েছেপাকা হলুদ ফল। লোভ সামলাতে পারেনি প্রাচীন বুড়োটা। পেট ভরে খেয়েছে সে, অন্তত তিন ঘন্টা ছিলো জঙ্গলের ভেতর। আরো ফল পাড়ার জন্যে গাছগুলো ঝাঁকিয়েছে সে। তারপর আবার রওনা হয়েছে পূর্বদিকে, যেনো হঠাৎ করে মনে পড়েগেছে এক জায়গায় পৌঁছবার কথা তার।

‘সময়ের ব্যবধান কয়েক ঘন্টা কমে গেছে,’ ওদেরকে জানালো শন, যদিও হুঁচকে আছে ভুরু জোড়া। ‘মোজাম্বিক সীমান্ত থেকে মাত্র দশমাইলদূরে রয়েছে আমরা তুকুটেলা সীমান্ত পেরুলে আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে।’

ছাপ ধরে ছুটবে কিনা ভালো শন। যুদ্ধের সময় শত্রুকে বা শিকার অভিযানের সময় কোনো প্রাণিকে ধাওয়া করতে হলে কখনো হাঁটেনি ওরা। একটানা দৌড়েপ্রতিদিন ষাট বা সত্তর মাইল পেরিয়ে গেছে। আড়চোখে ক্লডিয়ার দিকে তাকালো শন। মেয়েটা তাক লাগিয়ে দিতে পারে, কারণ তার হাঁটার ভঙ্গিটা হ্যাথলেটদের মতো, পায়ে ব্যথা পেলেও পদক্ষেপে ক্ষিপ্ততা আছে। তারপর রিকার্ডো মনটেরোর দিকে তাকালো ও ধারণাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিলো উপত্যকার পঁচানব্বুই ডিগ্রী উত্তাপে হাঁসফাঁস করছেন ভদ্রলোক। প্রায়ই ভুলে যায় শন, আর দু’বছর পর ষাটে পড়বেন। বরাবরই তিনি সুস্থ-সবল, তবে তার ক্লাস্তি ধরা পড়ে যাচ্ছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে, আগে যা কখনো দেখা যায়নি। চমড়ার রঙও কেমন যেনো নিঃপ্রভ হয়ে গেছে।

অন্যমনস্ক ভাবে দৌড়াতে গিয়ে মাতাউর সাথে অকস্মাৎ ধাক্কা খেলো শন। বৃন্দে ট্র্যাকার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখনো ছাপের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সে।

‘কি ব্যাপার, মাতাউ?’

আপনমনে মাথা নাড়ছে মাতাউ, আঞ্চলিক নদেরোবো ভাষা বিড়বিড় করে যা বলছে তার মর্ম উদ্ধার করা এমনকি শনের পক্ষেও সম্ভব নয়।

‘কি....?’ জিনিসটা দেখতে পেয়ে মাঝপথে থেমে গেলো শন। ‘সর্বনাশ!’ একপাশ থেকে এসে মানুষের দু’জোড়া পায়ের ছাপ পড়েছে পথের ওপর। এদিকের মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি, পাছগুলো পরিষ্কার।

দু’জন লোক, রাবারের সোল লাগানো জুতা পরে আছে। বাটার টেনিস শূ, চিনতে পারলো শন, স্থানীয় যে-কোনো বাজারের ফুটপাতে কিনতে পাওয়া মাত্র কয়েক ডলার দাম। এমনকি ক্যাপোও অচেনা লোকগুলোর পায়েরছাপ চিহ্নিত করতে পারলেন। ‘কারা ওরা?’ জানতে চাইলেন তিনি, তাঁর কথার সবাব না দিয়ে জোবকে নিয়ে একপাশে সরে-দাঁড়ালো শন মাতাউর কাজ দেখার জন্যে।

ছাপগুলো ধরে বুড়ি মুরগীর মতো বেশ কিছুক্ষণ আগুপিছু করলো মাতাউ, তারপর ওদের কাছে ফিরে এলা শন। একপাশে উচু হয়ে বসলো জোব, আরেক পাশে মাতাউ-যুদ্ধ মন্ত্রণালয় বৈঠক করছে, অনুপস্থিত শুধু শেডরাখ।

‘দু’জন লোক। একজন লম্বা, রোগা, বয়সে তরুণ, গোড়ালিতে ভর দিয়ে হাঁটে। দ্বিতীয় লোকটার বয়স বেশি, বেঁটে, মোটা। দু’জনেই বোঝা বহিছে, একটা করে বন্দুক ছাড়াও। শনের জানেন, শুধু পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য দেখে এ-সব আন্দাজ করছে মাতাউ। ‘লোকগুলো বিদেশী। উপত্যকার লোকজন জুতো পরে না, তাছাড়া এরা এসেছে উত্তর দিকে।’

‘জাম্বিয়ান পোচার,’ ঘৃণার সাথে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করলো জোব। ‘গণ্ডারের শিং চুরি করতে এসেছিল, ইঠাৎ দেখে ফেলেছে তুকুটেলাকে। অস্বাভাবিক আকৃতি দেখে পিছু নেয়ার লোভ সামলাতে পারেনি।

‘বাস্টার্ডস!’ তিক্তকণ্ঠে বললো শন। উনিশশো সত্তর সালে জরিপ করা হলো, জাম্বিয়ার জাম্বিজি নদীর আশপাশে বারো হাজার কালো গন্ডার আছে। এখন একটাও নেই। একজন মার্কিন সংগ্রাহক গণ্ডারে শিং দিয়ে তৈরি হাতল সহ একটা ছোরার দাম দেবে পঞ্চাশ হাজার ডলার, আধুনিক অস্ত্র কিনে আর ট্রেনিং নিয়ে নিজেদেরকে সেনাবাহিনীর মতো শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছে পোচাররা জাম্বিজি উপত্যকার উত্তর দিকটায় এখনো কয়েক শো গণ্ডার রয়েছে, জাম্বিয়ান পোচাররা তারই লোভে রাতের অন্ধকারে নদী পেরিয়ে চলে আসে, গেইম ডিপার্টমেন্টের প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে। পোচারদের অনেকেই গেরিলা যোদ্ধা শুধু পশু হত্যা নয়, হাত পাকিয়েছে মানুষ হত্যায়ও।

‘ওদের সাথে এ/কে রাইফেল থাকবে,’ শনকে বললো জোব। ‘এখানে আমরা দু’জোড়া পায়ের ছাপ দেখছি বটে, কিন্তু সংখ্যায় ওরা আরো বেশি হতে পারে-সবাই একসাথে না থাকারই কথা। ধরে নিতে হবে অস্ত্র এবং লোক বলের দিক থেকে আমরা দুর্বল, বাওয়ানা। কি করতে চান আপনি?’

‘এটা আমার কনসেশন,’ বললো শন। ‘তুকুটেলা আমার হাতি।’

‘তাহলে ওদের সাথে লড়তে হবে আমাদের,’ জোবের চকচকে চোখে যুদ্ধের নেশা।

দাঁড়ালো শন। ‘অবশ্যই, জোব।’ নাগাল পেলে লড়াই তো করবোই।’

‘তাহলে আর দেরি করা চলে না,’ শনের পাশে সোজা হলো মাতাউও। ‘আমাদের চেয়ে দু’ঘন্টা এগিয়ে আসছে ওরা। খাওয়ার জন্যে তুকুটেলোও খুব তাড়াতাড়ি থামবে। ওখানে আমরা পৌঁছবার আগেই তার নাগাল পেয়ে যাবে ওরা।’

ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন ক্যাপো, পাশে ক্রুডিয়া। লম্বা পা ফেরে তাদের সামনে চলে এলো শন। পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলো ও। কথা না বলে ওর দিকে তাকিয়ে তাকলেন ক্যাপো। ‘ওদেরকে ধরার জন্যে আমাদের একটা দল ছুটবে, বললো শন। ‘আপনি আর ক্রুডিয়া পিউমুলার সাথে ইন্টবেন। আমার সাথে থাকছে মাতাউ আর জোব। তুকুটেলার কাছে পৌঁছবার আগেই ওদেরকে আমরা ধরতে চাই। রিগবিটা আপনার কাছে থাক, ক্যাপো। ওয়েদারবাইটা জোবকে দিন।’

ঘুরতে যাবে শন, ওর হাত ধরলেন ক্যাপো। ‘শন, এই হাতিটা আমার চাই। জীবনের এই একটা সাধ যে কোনো মূল্যে.....।’

‘আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।’ মাথা ঝাঁকালো শন, রিকার্ডো মনটেরোর আকৃতি উপলব্ধি করে ও।

‘ধন্যবাদ, শন।’

জোব আর মাতাউর কাছে ফিরে এলো শন। নিজেদের বোঝা পিউমুলাকে দিয়ে হালকা হয়েছে ওরা, সাথে শুধু পানির বোতল। স্টেনলেস স্টীল রোলেক্স-এর দিকে তাকালো শন। পোচারদের ছাপ দেখতে পাবার পর চার মিনিট পেরিয়ে গেছ।

‘প্রাণপণ ধাওয়া! ঘোষনা করলো ও, তারপর সতর্ক করলো, ‘অ্যামবুশের জন্যে সতর্ক থাকো!’

কোমরে জড়ানো নামমাত্র কাপড়টা গুটিয়ে, দু’পায়ের ফাঁক দিয়ে তুলে শিরদাঁড়ার কাছে গুঁজলো মাতাউ, শার্টের কিনারা গুঁজলো বেল্টে, তারপর চরকির মতো আধ পাক ঘুরে লাফাতে লাফাতে ছুটলো ঠিক যেনো একটা বানর সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পযন্ত এই গতিতে বিরতিহীন তাকে ছুটতে দেখেছে শন। পথের ডান দিকে ঘেঁষে থাকলো ও, বাম-হাতি জোব বরাবরের মতো বাঁ দিকেই থাকলো। .৫৭৭-এর কার্ভিজ বদল করলো শন, তারপর সে-ও ছুটলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওদের পিছনের বনে হারিয়ে গেলেন ক্যাপো আর তাঁর দল। শনের সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিলো সামনের বনভূমি।

এ-ধরনের গাছ আর ঝোপবহুল উঁচু-নিচু মাটিতে তিনজনের তৈরি ঝাঁকে আকৃতি অটুট রাখতে হলে বিশেষ দক্ষতা ও বিপুল অভিজ্ঞতা দরকার। দু’পাশের লোক দু’জন থাকবে ট্র্যাকারের খানিকটা সামনে, আন্দাজ করে নেবে ঠিক কোথায় আছে ছাপগুলো, এতপেতে থাকা শত্রুর খোঁজ করবে গোটা এলাকায়, কাভার দেবে ট্র্যাকারকে, অথচ ট্র্যাকারে কাছ থেকে দু’দিকে দূরত্ব বজায় রাখবে। চল্লিশ গজ, তারপর অপর দিকে ছুটন্ত লোকটার সাথে যোগাযোগ রাখবে এ-সবই করতে হবে

ছুটন্ত অবস্থায়, রেশির ভাগ সময় পরস্পরকে না দেবে। মাঝখানের রেখা ধরে দৌড়াচ্ছে মাতাউ, তার ছোট্টার সাথে তাল বজায় রেখে ঝানকটা সামনেও থাকতে হবে ওদের।

ছাপ যদি দিক বদল করে, যেদিকে ঘুরলো তার উল্টোদিকের লোকটাকে প্রতিপক্ষের চেয়ে দিশূণ দূরত্ব পেরুতে হবে। আর ছাপ যদি খোলা জায়গার ওপর দিয়ে এগায়, বর্শার উল্টো করা মাথার মতো আকৃতি পাবে ঝানকটা, সব সময় বেয়াল রাখবে মাতাউর নিরাপত্তার দিকে, পরস্পরের সাথে ষোণাষোণর ভাষা হবে পাখির ডাক। বুলবুলি ডাকুক বা ঘুণ্ড, প্রত্যেকটারই আনন্দ অর্থ আছে।

এ-সব ছাড়াও, আরো দুটো জরুরী ব্যাপার হলো, নীরবতা ও গতি। একজোড়া কিশোর হরিনের মতো ছুটছে জোব আর শন। লাফ দিয়ে কাঁটাকোপ পেরুচ্ছে কখনো বা ঐক্যবৈক্যে ছুটছে, নিচু ডালে বাড়ি যাওয়া থেকে বাঁচতে ঘন ঘন নিচু করছে মাথা।

এক ঘন্টা পর, জঙ্গলের একটা ফাঁক দিয়ে হাত-ইশারার সাহায্যে সংকেত দিলো মাতাউ। অর্থটা সাথে সাথে ধরতে পারলো শন। 'আরো দু'জন।' অর্থাৎ প্রথম দলটার সাথে আরো দু'জন পোচার যোগ দিয়েছে চারজনই তারা ছুটছে তুকুটেলার পিছনে।

আরো এক ঘন্টা ছুটলো ওরা, মুহূর্তের জন্যে মন্থর হয়নি গতি। মাঝখান থেকে আবার সংকেত দিলো মাতাউ, হাতের তালু দেখালো শনকে। তারমানে 'খুব কাছে। সাবধান। বিপদ।' জবাবে জংলী হাঁসের মতো ডাক দিলো শন, ছোট্টার গতি কমিয়ে আনলো, গোটা দলটা এগালে সতর্ক দুলকি চালে।

নিচু একটা মালভূমির গা বেয়ে উঠে গেছে ট্রেইল। পাশেই রয়েছে প্রাচীন এলিফেন্ট ট্রেইল, লোহার মতো শক্ত মাটিতে গজবাহিনীর পদাঘাত স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে। সমতল মালভূমির কিনারা উপকে ওপরে উঠতেই ঘাসে তেজা মুকে পুবাণি বাতাসের ঠান্ডা পরশ অনুভব করলো শন।

মালভূমিটা এক মাইলও চওড়া নয়, তাড়াতাড়ি হেঁটে অপরদিকের কিনারায় পৌছে গেলো ওরা, শেষ দশ গজ ত্রল করে এগোলো, আকাশের গায়ে ষাতে ওদেরকে দেখা না যা। নিচে উপত্যকা, উপত্যকার সামনে গাছপালার ঢাকা আরেকটা মালভূমি। উপত্যকার মাঝখানে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে একটা সরু নদী, দুই পারে সবুজ ঝোপ। উপত্যকার বাকি অংশ সম্পূর্ণ খোলালো-রোদে চকচক করছে সোনালি ঘাস, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে শিপড়ের ঢিবি-একেকটা একতলা বাড়িরসমান উঁচু-মেলে ধরা ছাতার মতো কয়েকটা অ্যাকাসিয়া গাছও দেখা গেলো। দ্রুত চোখবুলিয়ে সব দেখে নিলো শন।

বাঁ দিক থেকে একটা রীড-বাক ডেকে উঠলো, জোবের জরুরী সংকেত। হাত দিয়ে নিচের উপত্যকা দেখালো সে, ওদের সামনে থেকে বেশখানিকটা বাম দিকে।

তার আঙুল অনুসরণ করে তাকালো শন। প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না, তারপর হঠাৎ তুকুটেলা, অশুভ শক্তি, বেরিয়ে এলো দৃষ্টিপথে।

প্রকাণ্ড একটা পিঁপড়ের ঢিবির আড়ালে ছিলো তুকুটেলা। খোলা তৃণভূমিতে বেরিয়ে আসতেই সশব্দে আঁতকে উঠলো শন। এমনকি এক মাইল দূরে থাকলেও, শন উপলব্ধি করলো এই কিংবদন্তীতুল্য প্রাণিটির ভিমালত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার স্মৃতি স্পান হয়ে গেছে।

তুকুটেলার শরীর যেনো আগ্নেয়গিরির গাঢ় ছাই রঙা পাথর দিয়ে তৈরি। অসম্ভব লম্বা সে, চওড়া হাড়গুলো চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আছে। এতো দূর থেকেও তার ছেঁড়া-ফাটা চামড়ার ভাঁজ ও মোটা রেখাগুলো পরিষ্কার দেখতে পেলো শন, গিঁটবহুল শিরদাঁড়ার কাঠামোটা চামড়া ঠেলে উঁচু হয়ে আছে। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে তার বিরাট কান জোড়া হাতপাখার বাতাস করার ভঙ্গিতে একদিক থেকে আরকদিকে আসা-যাওয়া করছে মন্তরবেগে, ছেঁড়া-ফাড়া কিনারা ঘষা খেতে খেতে কড়া পড়ে গেছে।

তুকুটেলার দাঁত দুটোও কালো; কালের আঁচড় তো লেগেইছে, তাছাড়া লম্বা যে গাছগুলো এতো যুগ ধরে ধরাশায়ী করা হয়েছে ওগুলোর সাহায্যে, তার রসও তো কম লাগেনি। তার খোলা নিচের ঠোঁট থেকে প্রসারিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে দাঁত দুটো, তারপর ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে পরস্পরের দিকে এগিয়েছে, ফলে ঠোঁটের কাছ থেকে ডগা পর্যন্ত একেকটা দাঁতের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে প্রায় নয় ফুটের মতো। ওগুলো আগা থেকে ডগা পর্যন্ত একই রকম, ক্রমশ সরু হয়নি। নিরেট আইভরি শাখা ছাড়িয়ে এতো ঝুলে আছে যে শীতকালীন ঘাসের নিচে নেমে এসেছে মাঝখানটা। প্রকাণ্ডদেহী তুকুটেলার জন্যেও ওগুলো যেনো বোঝা বলে মনে হয়। এ-ধরনের আরো একজোড়া গজদন্ত আর বোধহয় কেউ কোনোদিন দেখবে না। আফ্রিকা মহাদেশে ইতিহাস ও কিংবদন্তী হয়ে থাকবে এই হাতি।

আবার শিস দিলো জোব, শনের মনোযোগ দাবি করলো। তার লম্বা করা হাত অনুসরণ করে তাকাতেই পোচারদের দেখতে পেলো ও।

চারজনই তারা একসাথে রয়েছে। ঢালের নিচের গাছপালা থেকে এইমাত্র বেরিয়েছে দলটা, ঘাস মোড়াপ্রান্তরে ঢুকে পড়েছে। একজনের পিছনে একজন, একটা লাইন ধরে এগাচ্ছে তারা, কাঁধ ছুঁই ছুঁই করছে ঘাসের ডগাগুলো প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে একে ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল। এ-ধরনের রাইফেল দিয়ে হাতি শিকার করা কঠিন, তবে ওদের কৌশলটা কি হবে আন্দাজ গুলি করবে চারজন, হাতির গায়ে বিদ্ধ হবে কয়েকশো রাউণ্ড বুলেট, কপার জ্যাকেট পরানো বুলেটের আঘাতে হিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ফুসফুস। শুধু অটোমেটিক ফায়ার পাওয়ারের ওজনেই ধরাশায়ী হবে তুকুটেলা।

গত চার বছরে পোচারদের হাতে শনের মতো অনেক শিকারী খুন হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে, দেখামাত্র গুলি করা যাবে পোচারদের, সতর্ক করার দরকার

নেই। প্রাইম মিনিস্টার মুগাবে আরো পরিষ্কার করে দিয়েছেন ব্যাপারটা, তিনি বলেছেন, 'শুট টু কিল।'

.৫৭৭ নাইট্রো এক্সপ্রেসটা রেখে জোবের কাছ থেকে ওয়েদারবাইটা নিলো শন। টার্গেট কাছাকাছি হলে .৫৭৭ খুব কাজের জিনিস, কিন্তু দূরত্ব বেশি হলে অসুবিধা-একশো গজের পর ভারি বুলেট দ্রুত নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। ধরাশায়ী একটা গাছের আড়ালে গুয়ে আছে জোব, শনও তার পাশে লম্বা হলো। বোল্ট খুলে চেম্বার পরীক্ষা করলো ও, ভেতরে একটা কার্ট্রিজ রয়েছে। পোচারদের দলটা ছ'শো গজ দূরে, ১৮০-গ্রেন নসলার বুলেট দূরত্বটা পেরুবার আগেকতোটুকু ঝুলে পড়বে তার একটা হিসাব করা দরকার। শনের জানা আছে সাড়ে তিনমো গজে ছ'ইঞ্চি নিচে নামে।

হিসাব সেরে সাইটে চোখ রাখলো শন। বুক ভরে শ্বাস টানলো ও, তারপর অর্ধেকটা বের করে দিলো। ট্রিগারে টান দিতেই বাঁট প্লেট ধাক্কা মারলো কাঁধে, লাফ দিয়ে ওপরে উঠে গেলো ব্যারেল, চোখের সামনে থেকে গায়েব হয়ে গেলো টার্গেট।

সাইটে আবার চোখ রাখার আগেই জোবের চিৎকার শুনতে পেলো শন। 'লেগেছে!' লেসে চোখ রেখে দেখলো, ঘাসের ওপর এখন মাত্র তিনটে মাথা।

তিনটে রাইফেল একসাথে গর্জে উঠলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঢাল লক্ষ্য করে গুলি করছে পোচাররা, যেখানে লুকিয়ে আছে শন আর জোব। তাদেরকে ছাড়িয়ে আরো দূরে চলে গেলো শনের দৃষ্টি ঘাসের ওপর গজদন্ত তুলে পুরোদমে ছুটছে তুকুটেলা। গাঢ় রঙের বোপ রেখা ভেদ করে ভেতরে ঢুকলো সে, বেরুলো অপরপ্রান্ত ফুঁড়ে। 'পালাও, ভাই আমার, পালাও!' বিড়বিড়করে বললো শন। 'আমি যদি না পাই কেউ যেনো না পায় তোমাকে।'

পোচারদের দিকে তাকালো শন। গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নেয়া আছে ওদের বোঝা গেলো পরিষ্কার। ঢাল লক্ষ্য করে গুলি করছে দু'জন, বাকি একজন ছুটে গেছে দলনেতার কাছে। তাকে ধরে দাঁড় করালো সে। নীল ডেনিম পরা দলনেতা তার রাইফেল হারিয়ে ফেলেছে, পিঠ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে আছে, খামচেধরে আছে একপাসের পাজর।

আবার গুলি করলো শন। ঘাসের ওপর ধুলো উড়তে দেখলো ও, পোচারদের কাছাকাছি। ঘাসের আলোটা ঢাকা দিলো তারা। পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পরও তাদের আর দেখা গেলো না। শন বললো, 'চলো দেখে আসি।'

'সাবধান,' সতর্ক করলো জোব। 'এগিয়ে এসে কোথাও ওত পেতে থাকতে পারে ওরা।' এটাও গেরিলাদের একটা পুরনো কৌশল। কাজেই চোখ-কান খোলা রেখে ভাল বেয়ে নামলো ওরা।

পথ দেখালো মাতাউ। এক জায়গায় থাকলো সে, ঘাস এখানে কাত হয়ে আছে। রক্তের দাগও দেখা গেলো কয়েকটা ঘাসের গায়ে, এরইমধ্যে শুকিয়ে এসেছে। দলনেতা মারাত্মকভাবে আহত হয়নি, আঁচড়কেটে বেরিয়ে গেছে বুলেট। তার রাইফেলটাও খুঁজে পেলো না ওরা।

‘কি অনুসরণ করবো আমরা?’ জানতে চাইলো জোব। ‘তুকুটেলাকে, নাকি পোচারদের?’

‘লুসাকার দিকে রওনা হয়ে এরইমধ্যে অর্ধেক পথ পেরিয়ে গেছে ওরা,’ হেসে উঠে বললো শন, মাতাউকে নির্দেশ দিলো, ‘তুকুটেলার পিছু নাও।’

নদীতে পানি খুব কম, পার হবার পর তুকুটেলার পায়ের ছাপ দেখতে পেলো মাতাউ, উপত্যকার আরেকদিকের ঢাল বেয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে। প্রথম দিকে ঝড় তুলে দৌড়দিলেও, খানিক পর তার দৌড়ের মধ্যে একটা ছন্দ এসেছে প্রতিটি দ্রুতগতি পদক্ষেপের সাথে পেরিয়ে যাচ্ছে বিস্ময়কর দূরত্ব, ছোট্ট এই ভঙ্গি ও গতি একটানা কয়েকদিন বজায় রাখতে পারবে সে। আবারও পূর্ব দিকে ছুটছে তুকুটেলা, মৌজাম্বিক সীমান্ত খুব বেশি দূরে নয় আর।

বনভূমির ভেতর সীমান্তরেখা চেনার কোনো উপায় নেই। বেড়া, পাঁচিল বা অন্য কোনো হিন্ত থাকলে ভালো হতো। তবে এক ঘণ্টার পর আন্দাজ করলো শন, এরইমধ্যে সীমান্ত পেরিয়ে মৌজাম্বিকে ঢুকে পড়েছে ওরা। থামার নির্দম দিতে যাবে ও, তার আগেই জোব নরম দূরে শিস দিলো।

দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা, সাঁঝবেলার আবছা আলোয় দেখলো পূর্ব দিকের ঘন বনের দিকে এগিয়ে গেছে তুকুটেলার অস্পষ্ট পায়ের ছাপ। ‘মৌজাম্বিক,’ বললো জোব। ‘চলে গেছে সে।’ বাকি দু’জন প্রতিবাদ করলো না।

‘এখনো খুব জোরে দৌড়াচ্ছে,’ বললো মাতাউ। ‘এতো জোরে কোনো মানুষের পক্ষে তাল মেলানো সম্ভব নয়। এ-বছর আর তুকুটেলাকে আমরা দেখতে পাবো না।’

‘হ্যাঁ, তবে আবার সুযোগ আসবে,’ বললো জোব। ‘আগামী বছর ন্যাশনাল পার্কে আবার ফিরে আসবে সে, তারপর নতুন চাঁদ উঠলে চিউইউই নদী পেরুবে। আমরা তার জন্যে অপেক্ষা করবো।’

‘সম্ভবত,’ বললো মাতাউ। ‘কিংবা, কে জানে, আমাদের আগে পোচাররাই হয়তো মেরে ফেলবে তাকে। অথবা কোনো ল্যাণ্ড মাইনে পা ফেলে মারা যাবে। বয়সও তো কম হলো না, স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে তার।’

ফেরার পথে মনটা বিষণ্ণ হয়ে থাকলো শনের। এই হাতিটাকে শিকার করার খুব ইচ্ছে ছিলো ওর।

\* \* \*

মাঝরাতের খানিক আগে একটা আশুনের ধারে রিকার্ডো মনটেরো ও ক্লুডিয়াকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলো ওরা। চারটে খুঁটির সাথে বেঁধে ওদের ওপর একটা চান্দর টাঙানো হয়েছে শুয়ে আছে কেটে জড়োকরা ঘাসের ওপর। আরেকটা আশুনের ধারে বসে ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে পিউমুলা। ক্যাপোর কাঁধে হাত রাখলো শন, সাথে সাথে ঘুম ভেঙে গেলো ভদ্রলোকের।

‘পেয়েছেন তাকে? কি খবর? পোচারদের কি হলো?’

‘তুকুটেলা চলে গেছে, ক্যাপো। পোচারদের আমরা ভাগিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তুকুটেলা সীমান্ত পেরিয়ে মোজাম্বিকে ঢুকে পড়েছে।’ ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে শন, দু’হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ শুনছেন ক্যাপো।

বাবার পাশে উঠে বসেছে ক্লুডিয়া, সান্দ্রনাসূচক একটা হাত রাখলো কাঁধে। শনের দিকে ফিরে জানতে চাইলো সে, ‘ক্যাম্পে ফেরার কি উপায় হবে?’

দাঁড়ালো শন। ‘এখান থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে আমার একটা হান্টিং ট্রাক আছে। আমার সাথে মাতাউ যাচ্ছে একটা জায়গার কথা বলে যাচ্ছি, তোমাদের ওখানে নিয়ে যাবে জোব। ওখানেই আবার দেখা হবে আমাদের।’

গভীর জঙ্গল আর ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে শুধু তারার আলো দীর্ঘ চার ঘন্টা শনকে পথ দেখালো মাতাউ, একবারও পথ ভুল না করে পৌঁছে দিলো ট্রাকটার কাছে। আরো এক ঘন্টা ট্রাক চালিয়ে দলের বাকি অংশের দেখা পেলো ওরা, পথের ধারে আশুন জেলে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছেন ক্যাপো। ক্লান্ত শরীর, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ট্রাকেচড়লো ওরা, ব্যর্থ তার গ্লানি আর হতাশা নিয়ে গোটা দল ফিলে চললো ক্যাম্প অভিমুখে। ভোর হতে আর বেশিদেরি নেই, চারটে বাজে।

ট্রাক চলছে, কেউ কোনো কথা বলছে না। বাবার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো ক্লুডিয়া। এক সময় চিন্তিত সুরে রিকার্ডো মনটেরো জানতে চাইলেন, ‘আপনি জানেন কোথায় গেছে তুকুটেলা, শন?’

‘আমাদের নাগালের বাইরে, ক্যাপো,’ গম্ভীর সুরে জবাব দিলো শন।

‘সিরিয়াসলি,’ ক্যাপোর গলায় অস্থিরতা। ‘ওদিকে কি তার নির্দিষ্ট কোনো

গন্তব্য আছে? সেখানেই কি যাচ্ছে তুকুটেলা?’

‘ওদিকে শুধুই বিপদ, ক্যাপো,’ চিন্তিত গলায় বললো শন। ‘গ্রামের পর গ্রাম জুলছে। গেরিলাদের দুটো দল পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আরো ভয়ংকর হয়ে উঠবে যুদ্ধটা, কারণ মুগাবের সশস্ত্র ছেলেরাও যোগ দিতে আসছে।’

‘আমার হাতি কোথায় যেতে পারে?’ জেদ ধরলেন ক্যাপো। ‘যাবার নিশ্চয়ই তার একটা জায়গা আছে, তাই না?’

মাথা ঝঁকালো শন। ‘সারা বছর কখনো কেথায় থাকে সে, গবেষণা করে বের করেছি আমরা-আমি, জোব আর মাতাউ। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাবোরা বাসা ড্যাম-এর নিচে, জলাভূমিতে থাকে সে। তারপর, সেপ্টেম্বরের শেষে বা অক্টোবরের প্রথমে জাখেজি পেরিয়ে রওনা হয় উত্তর দিকে, চলে যায় মালাউইতে।

কৃষ্টি শুরু হলে আবার দক্ষিণ দিকে এগায়, টিটির কাছে জাম্বেজি পেরোয়, ফিরে আসে চিউইউই ন্যাশনাল পার্কে।’

‘তারমানে এইমুহূর্তে জলাভূমির দিকে যাচ্ছে সে?’ জানতে চাইলেন ক্যাপো।

‘ধরে নেয়া চল,’ বললো শন। ‘আগামী বছর আবার আপনি সুযোগ পাবেন, ক্যাপো।’

সকালে ক্যাম্পে পৌঁছুলো ওরা। গরম পানি পাওয়া গেলো শাওয়ায়ে। সদ্য ইন্ট্রি করা কাপড় পরলো সবাই। ডাইনিং টেব্লে বিপুল ব্রেকফাস্ট পরিবেশিত হলো। ‘নাস্তা শেষ করে ঘুম,’ বললো শন। ‘দুপুরে ওঠার পর কনফারেন্স। সাফারি শেষ হতে এখনো তিনসপ্তাহ বাকি, কাজেই একটা প্র্যান করাদরকার। তুকুটেলার সাথে তুলনা করা যায় এমন কিছু আপনাকে আমি অফার করতে পারবো না, ক্যাপো, তবে একটা সিরিটি-পাউণ্ডার অবশ্যই আশা করতে পারেন আপনি।’

‘আমি কোনো সিরিটি-পাউণ্ডার চাই না,’ ক্যাপো বললেন। ‘আমি তুকুটেলাকে চাই।’

‘সে তো আমরা সবাই চাই, তবে তার কথা তুলে আর লাভ কি।’ অস্বস্তি বা বিরক্তি গোপন না করেই বললো শন। ‘কিছুই যখনকরার নেই, ভুলে যাওয়াই ভালো।’

‘কি হয় আমরা যদি সীমান্ত পেরিয়ে অনুসরণ করি তাকে?’ নাস্তার প্লেট থেকে চোখ না তুলে জানতে চাইলেন ক্যাপো। হেসে ওঠার আগে তাঁর মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলো শন।

‘এক সেকেন্ডের জন্যে হলেও আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন,’ হাসি খামিয়ে বললো ও। ‘মনে ইচ্ছিলো, আপনি আসলেও বুঝিতাই চাইছেন। চিন্তার কিছু নেই, আগামী বছর সুযোগ পাবেন আপনি।’

‘আগামী বছর বনে কিছু আছে কি? জিওফ্রে ম্যানগুজা আপনার লাইসেন্স বাতিল করে দিচ্ছে, চিউইউই কনসেশন কেড়ে নিচ্ছে আপনার কাছ থেকে।’

‘ধন্যবাদ, ক্যাপো। মানুষকে আনন্দদানের কৌশল ভালোই জানা আছে আপনার।’

‘নিজেদেরকে বোকা বানাবার কোনো মানে হয় না। তুকুটেলাকে শিকার করার এটাই আমাদের শেষ সুযোগ।’

‘কারেকশন,’ মাথা নাড়লো শন। ‘চলতি মওসমের জন্যে সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেছে।’

‘হয়নি, যদি আমরা তাকে অনুসরণ করে মোজাম্বিকে ঢুকি,’ বললেন ক্যাপো ‘সবাই জানি, জলাভূমিতে তাকে পাওয়া যাবে।’

তাঁর দিকে অগলক তাকিয়ে থকলো শন। ‘মাই গড, আপনি সিরিয়াস!’

‘আপনাকে আগেই জানিয়েছি। জীবনে আর কিছু চাওয়ার নেই আমার, ওই হাতিটা ছাড়া’



দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাতা নাড়ে জোব। ‘আমার আর চিন্তার কিছু নেই। কখন বঙ্গনা হবো, এটাই বলুন?’

দশ মিনিট পর ফিরে এসে শন দেখলো, কফির দ্বিতীয় কাপে চুমুকদিচ্ছেন ক্যাপো, আঙুলের ফাঁকে চুরুট। পাশেই বসে রয়েছে ক্লডিয়া, বাবার সাথে তর্ক করছি। শনকে তাঁবুতে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেলো সে।

‘ক্যাপো, সীমান্তের ওপারে কি ঘটছে আপনি জানেন না,’ বললো শন। ‘ধরে নিন, আরেকটা ভিয়েতনাম।’

‘আমি যেতে চাই,’ মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপো।

‘ঠিক আছে, আমার শর্তগুলো শুনুন। আপনি একটা ইনডেমনিটিতে সই করবেন। আপনার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, আমি দায়ী থাকবো না।’

‘রাজি।’

‘তারপর আপনি একটা ঋণপত্রে সই করবেন, আপনার কিছু হলে পুরো পাঁচ লাখ ডলার পেমেন্ট করতে বাধ্য থাকবে আপনার ব্যাংক।’

‘কই, কাগজপত্র দিন আমাকে।’

‘আপনি একটা উন্মাদ, ক্যাপো, জানেন কি?’

‘শিওর,’ নিঃশব্দে হাসলেন রিকার্ডো মনটেরো। ‘কিন্তু আপনি, স্যার?’

‘আমি তো জন্ম দেখেই পাগল!’ হ্যাগশেক করার সময় রিকার্ডোর সাথে হেসে উঠলো ও।

‘প্লেন নিয়ে সীমান্তটা একবার দেখে আসবো আমি সব যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আজ রাতেই পার হবো। তুকুটেলা বধ অভিযান দশ দিনের ভেতর শেষ করতে চাই।’

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপো।

‘আপনি বিশ্রাম নিন,’ বললো শন। ‘সামনে কঠিন সময়।’ ঘুরতে যাবে শন, ক্লডিয়ার অগ্নিদৃষ্টি লক্ষ্য করে স্থির হয়ে গেলো। ‘রীমাকে বলে দিচ্ছি, কাল আরেকটা প্লেন পাঠাবে ও-হারারেতে ফিরে যাচ্ছে। তুমি। আমেরিকার উদ্দেশ্যে প্রথম যে ফ্লাইটটা পাওয়া যাবে, তাতে তোমাকে তুলে দেবে ও।’

মনে হলো ক্লডিয়া কিছু বলবে, তবে তার আগেই মেয়ের কাঁধে একটা হাত রাখলেন ক্যাপো, বললেন, ‘ঠিক আছে, ফিরে যাবে ও। আমি ওকে বোঝাচ্ছি।’

‘ফিরে তো যাবেই,’ বললো শন, ‘আমরা পাগল নাকি যে মোজাম্বিকে নিয়ে যাবো ওকে!’

\* \* \*

বীচক্রাফটের ডানা আর পেটে টেপ লাগালো শন, আইডেনটিফিকেশনস মার্কিন ঢাকা পড়েগেল। প্লেনের ইমার্জেন্সি স্টোর চেক করলো জোব-বলা তো যায় না, বাধ্য হয়ে ল্যাগ করতেহতে পারে। ভারি ডাবল ব্যারেলের বদলে হালকা এটা রাইফেল নেয়া হলো।

আকাশে উঠে পূবদিকে এগোলো ওরা বনভূমির মাথা থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে থাকলে প্লেন,গেরিলাদের আনাগোনা বা মানুষজনে উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে চায়। শনের কোলের ওপর ম্যাপ, প্রতিটি ল্যাগমার্ক মিলিয়ে দেখে নিচ্ছে ও। ওর পাশে বসেছে জোব মাতাউ বসেছে জোবের পিছনে। সিটে তাকে বসতে দিতে রাজি নয় শন। ওর ভয় হয়তো লাফ দিয়ে পিটে চড়ে বসবে।

সীমান্তে পৌঁছুলো ওরা, আশাপাশে কোথাও মানুষজনের চিহ্ন দেখা গেলো না। সীমান্তের ওপর দিয়ে উত্তর দিকে আধা ঘন্টা প্লেন চালাবার পর দিগন্তরেখার কাছে চিকচিকে ভাব দেখতে পেলো-জাম্বিজি নদীর ওপর কাবোরা বাসা বাঁধটা তৈরি করার পর বিশাল এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, দেখে মনে হবে সাগর। কাবোরা বাসা আফ্রিকার সবচেয়ে বড় হাইড্রোইলেকট্রিক স্কি, পর্তুগীজরা তৈরি করেছিল পাশের যে-কোনো দেশ প্রজেক্টের বাড়তি সবটুকু বিদ্যুৎ কিনে নিতে রাজিআছে, কিন্তু মৌজাম্বিক সরকার এক পয়সার বিদ্যুৎও বিক্রি করতে পারে না। দক্ষিণমুখী পাওয়ার লাইনগুলো বাবার ধ্বংস করে দিচ্ছে বিদ্রোহী গেরিলারা, আর সরকারী সশস্ত্র বাহিনী এতোই দুর্নীতিপরায়ণ ও অলস যে মিস্ত্রী ও শ্রমিকদের রক্ষা করার প্রায় কোনো চেষ্টাই তারা করে না। আজ কয়েক বছর হয়ে গেলো মেরামতের কাজে হাত দেয়া হয়নি।

একশো আশি ড্রিগী বাক ঘরে ফিরতি পথ ধরলো শন, দক্ষিণ দিকে। ফেরার পথে মৌজাম্বিকে আরো গভীরে ঢুকলো ওরা। পরিত্যক্ত খেত-খামার চোখে পড়লো,কয়েক বছর ধরে চাষাবাদ হয় না, ফসলের মাঠে আগাছা জন্মেছে। কয়েকটা গ্রাম দেখা গেলো, মানুষজন নেই, ঘর-বাড়িতে আগুনলাগার পর আর মেরামত করা হয়নি। ভিলা দ্য মানিকা আর কাবোরা বাসার মাঝখানের রাস্তাটা সম্পূর্ণ নির্জন, রাস্তার ওপর ঝোপ আর ঘাস জন্মেছে,দু'পাশে জং ধরা সামরিক যানবাহনের লাইন দেখা গেলো, মাসের পর মাস পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। প্লে ঘুরিয়ে নিয়ে পশ্চিম অর্থাৎ সীমান্তের দিকে ফিরে এলো শন,ওদের তিনজনের পরিচিত একটা জায়গা খুঁজেবের করার চেষ্টা করছে। আরো খানিক সামনে এগোতেই পাওয়া গেলো সেটা-একজোড়া গম্বুজের মতো মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে ছোটো দুটো পাহাড়। 'ইনলোজেন'- জোবের দেয়া না, অর্থ হলো, 'কুমারীর স্তন'। ইনলোজেন- এর দক্ষিণে ছোটো দুটো নদী পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে।

'ইনলোজেন, মনে পড়ে, বাওয়ানা?' জিজ্ঞেসে করলো জোব।

কোথায় গেলো ভয়, পিছনের সিট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো মাতাউ, বন্ধন করে হেসে উঠলে বললো, 'বাওয়ানা, মনে পড়ে, কমরেড চায়নাকে এখানে হ'পনি...?'

দুই নদীর মোহনার দিকে নামলো প্লেন, চক্কর দিলো শন, তিনজনই ওরা হুঁকেআছে পুরনো গেরিলা ক্যাম্পটার আভাস পাচ্ছেওরা। শেষবার ১৯৭৬ সালের বসন্তে এখানে এসেছিলো ওরা— ব্যালানটিন্ স্কাউটস্ এর পক্ষে লড়তে।

লড়াইয়ে অতর্কিত হামলায় শত্রু শিবির দখল করে নেয় ব্যালানটিন্ বাহিনী। নব্বল শেষে যখন বন্দীদের যাচাই করছিলো ওরা, এমন সময় হস্তদন্ত হয়ে জোব এসে বলেছিলো, 'কর্নেল, আমি বন্দিদের একজনকে চিনেছি। উনি কমরেড চায়না স্বয়ং!'

কমরেড চায়না অত্যন্ত কুখ্যাত একজন অফিসার। গোটা উত্তর পূব সেট্টরের নেতা সে। রোডেশিয়ান আর্মির ওয়াণ্টেড তালিকায় পয়লা নম্বরে নাম। লোকটার কাছ থেকে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে, কাজেই নির্দেশ দিলো শন, 'ওনার নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখো।'

জোব জানালো, 'লোকটা হাঁটতে চাইছে না। ও জানে, আমরা তাকে গুলি করতে পারবো না।'

জোবের সাথে বন্দীর কাছে এলো শন, দু'জন গার্ড তাকে পাহারা দিচ্ছে। মাথার পিছনে হাত রেখে বসে আছে কমরেড চায়না, শনকে আসতে দেখে ঘূর্ণার সাথে তাকালো।

'দাঁড়াও,' নির্দেশ দিলো শন। 'হাঁটো।' জবাবে শনের বুটে থুথু ছিটালো কমরেড চায়না। হোলস্টার থেকে .৩৫৭ ম্যাগনাল রিভলভারটা বের করলো শন, লোকটার মাথার পাশে মাজল চেপে ধরলো।

'ওঠো,' আবার নির্দেশ দিলো শন 'এটাই তোমার শেষ সুযোগ।'

'গুলি করার সাহস তোমার নেই,' হিসহিস করে বললে কমরেড চায়না। 'বন্দী হিসেবে আমি আমার গুরুত্ব বুঝি...।' তার কথা শেষ হবার আগেই গুলি করলো শন।

চিৎকার করলো কমরেড চায়না, দু'হাতে চেপে ধরলো কানটা, আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত ঝরছে।।

'ওঠো!' কিন্তু এবারও শনের নির্দেশঅমান্য করলো লোকটা, শন জুতোয় থুথু ফেললো। এরপর তার অপর কানের ওপর রিভলভার ঠেকালো শন। 'এটা ফুটো করার পর তেমার চোখ তুলে নেয়া হবে, বেয়নেট দিয়ে খুঁয়ে। শনেরা দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে এবার দাঁড়ালো কমরেড চায়না।

'জোর কদমে হাঁটো!' লোটর পিঠে দু'হাত দিয়ে বাঁকা মারলো জোব। হোঁচটে খেতে খেতে গেলো লোকটা।

এক ঘন্টার পর লোকটাকে ব্যাথার খঁষ্ট পেতে দেখে একটা মরফিন ইন্জেকশন দিলো শন। ব্যাথা কমার পর প্রতিশ্রুতি দেয়ার সুরে চায়না শনকে বললো, 'কৈউ

ইট মারলে তাকে আমি পাথর মারি, আমার স্বভাবের মধ্যে ক্ষমা বলে কিছু নেই। সাবধানে থেকো, কর্নেল শন কোর্টনি।’

‘নাম জানলে কি করে?’ অবাক হয়ে বলেছিলো শন।

‘তুমি বিখ্যাত ব্যক্তি। নাকি বলবো কুখ্যাত? তোমাদের নেতা রক্তচোষা ব্যালানটিন্ সবচেয়ে বজ্জাত।’

‘একটু বেশিই বলে ফেলছো, কমরেড।’

‘শোনো, কর্নেল, রাতের আঁধারে যে সীমান্ত টহল দেয়, শেষ হাসি সে-ই হাসে।’

‘ও, মাও-সে-তুং-এর বানী!’ শন হেসেছিলো। ‘তোমার ঠোটে ভালো মানিয়েছে হে, চায়না।’

‘আমরা সমগ্র দেশের দখল নিয়েছি। তোমরা, শেতাঙ্গ কৃষকের দল ভয় পেয়ে গেছো। তোমাদের বউ-বাচ্চা যুদ্ধ ঘৃণা করে। কালো চাষীরাও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ব্রিটেন, সমগ্র বিশ্ব আজ তোমাদের বিপক্ষে। এমনকি তোমাদের একমাত্র দোসর, দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত অন্যরকম ভাবছে। খুব দ্রুত, কর্নেল, খুব দ্রুত আমরা জিতে নেবো...’

তর্ক করে চললো ওরা সারাটা পথ। কমরেড চায়নার ত্রুর চরিত্র স্তম্ভিত, ক্ষেত্রবিশেষে মুগ্ধ করেছিলো শনকে।

শেষমেষ, যাত্রার শেষ দিকে একটা বিয়ারের ক্যান চায়নার হাতে দিয়ে ও বলেছিলো, ‘তোমার কানের ব্যাপারে দুঃখিত।’

ত্রুর হেসে চায়না বলেছিলো, ‘আমিও ওরকম করতাম, তোমার অবস্থানে থাকলে। তবে ভুলে যেওনা আমাদের দেখা হবে আবার।’

পরে, কমরেডের পলায়নের খবর শুনেছিলো শন। হাতকড়া করা অবস্থায় এটা ট্রাকের পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেছে চায়না, আশপাশের জঙ্গল তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাকে আর পাওয়া যায়নি। দু’মাস পর একটা ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পেলো শন, মাউন্ট ডারউইন রাস্তায় একটা সাপ্লাই কনভয় সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে শত্রুপক্ষ, নেতৃত্বে ছিলো কমরেড চায়না।

‘হ্যাঁ, মাতাউ, মনে পড়ে,’ বর্তমানে ফিরে এলা শন।

‘আমাদের ক্যাম্পের উন্টেদিকের সীমান্ত তো দেখছি একবার খালি’ বললো জোব। ‘সরকারী পাহারা নেই, গেরিলারাও নেই।’

‘ঝাঁকিটা তাহলে নেবো আমরা?’

‘ঝাঁকি?’ মাতাউর উদ্দেশ্যে চোখ মটকালো জোব। ‘আমি তো কোনো ঝাঁকিই দেখছি না, বাওয়ানা।’

মাতাউ অনুরোধ করলো, ‘ফেরার আগে চলুন দেখে যাই তুকুটেলা কতোদূর এগালো।’

পোচারদের সাথে যেখানে গুলি বিনিময় হয়েছিল, জায়গাটা পরিস্কার চিনতে শরলো ওরা। উত্তর দিকে আঙুল তাক করে মাতাউ বললো, ‘আরো একটু ওদিকে যেতে হবে।’ তার কথা মতো প্লেন নিয়ে খনিকটা বাম দিকে সরে এলা শন।

নিচে শুকলো একটা নদী দেখা গেলো। নদী থেকে একটা পথ এগিয়ে গেছে ভঙ্গলের দিকে। ‘এবার কোনো দিকেও? জানতে চাইলো শন।

জবারেব উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এলা মাতাউর কণ্ঠ থেকে। লোকটা সত্যি গাছকয়, আকাশথেকেও যেনো গন্ধ গুঁকে তুকুটেলার রহদিশ বের করে ফেলেছে। তার লম্বা করা কালো হাত অনুরণ করে তাকাতে হাতিটাকে দেখতে পেলো শন। হাততালি নিয়ে হাসছে জোব, তাকে দু’হাতে জড়িয়ে ধরেছে মাতাউ, তাকিয়ে আছে নিচের দিকে।

শুকনো নদী থেকেমাইলখানেক দূলে জলমগ্ন, আগাছায় ভর্তি একটা বিল দেখা গেলো, চারপাশে উঁচু ঘাসবন, সেই ঘাসবনের ভেতর দিে ধীরগতিতে এগোচ্ছে তুকুটেলো।

বীচক্রাফট এঞ্জিনের আওয়াজ পেয়ে মাথা তুললো সে, কান দুটো ফেললো, প্লেনের দিকে তাকাবার জন্যে ঘুরলো সেই সাথে তার গজদখাড়া হলো আকাশের দিকে। জোড়া আইভরির সুন্দর, নিখুঁত গঠন দেখে আরেকবার মুগ্ধ হলো শন। তুকুটেলাকে ছাড়িয়ে ছুটলো প্লেন, মুহূর্তের জন্যে দেখা গেলো ওগুলো।

‘আরেকবার দেখবো?’ জানতে চাইলো জোব

‘না,’ মাথা নাড়লো শন। ‘অকারণে বিরক্ত করা হবে। কোথায় তাকে পাওয়া যাবে জানা গেছে, চলো ফেরা যাক।’

\* \* \*

‘আধ মিলিয়ন ডলার পানিতে ফেলছে তুমি,’ বাবাকে বললো ক্লডিয়া। ‘জানো না, ওগুলো আমার টাকা?’

‘কি রকম?’ জিজ্ঞেস করলো রিকার্ডো মনটেরো। সিন্ধু পা’জামা পরে ক্যাম্পের বেডে শুয়ে আছেন তিনি, শরীরের উর্ধ্বাংশ খালি। ক্লডিয়া লক্ষ্য করলো, বুকের বেশিরভাগ লোম এখনো তাঁর কালো।

‘উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার যাবতীয় টাকা-পয়সা আর সয়-সম্পত্তির একমাত্র মালিক হলো আমি।’

হেসে উঠলেন ক্যাপো। তাঁর ধারণা ছিলো, তর্কটা ব্রেকফাস্ট টেবিলেই মিটে গেছে। ‘এ-সব কথা আবার কেন উঠছে?’ জানতে চাইলেন তিনি।

‘পাঁচ লাখ ডলার থেকে বঞ্চিত করছে আমাকে, বেশ মেনে নিলামদ; কিন্তু তুমি অন্তত এটুকু তো করতে পারো, আমিও যাতে তোমার সাথে ব্যাপারটা উপভোগ করার সুযোগ পাই?’

‘শেষ অডিট থেকে জানা গেছে, ইয়ং লেডি, ট্যাক্স ইত্যাদি বাদ দেয়ার পর তোমার অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে ছত্রিশ মিলিয়ন ডলারের সামান্য কিছু বেশি, আমি এই এক মিলিয়ন ডলার পানিতে ফেলার পরও।’

‘বাবা, তুমি জানো টাকা জিনিসটা কখনোই আমাকে টানে না। আমি তোমার সাথে আফ্রিকায় এসেছি এই সমঝোতার মাধ্যমে যে তোমার সব কাজে আমারও একটা ভূমিকা থাকবে। নাকি ভুলে গেছো?’

‘কথাটা আর মাত্র একবার বলবো আমি, মাই টেসোরো,’ হয় প্রচণ্ড রেগে গেলে নয়তো চরম বিরক্ত হলে মেয়েকে এ-ধরনের সম্বোধন করেন ক্যাপো। ‘আমাদের সাথে তুমি মোজাম্বিকে যাচ্ছে না।’

‘তারমানে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে?’

‘বিনা দ্বিধায়,’ বললেন ক্যাপো। ‘যদি তোমার নিরাপত্তা বা সুকের প্রশ্ন জড়িত থাকে।’

ক্যানভাস ক্যাম্প চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে দাঁড়ালো ক্লডিয়া, তাঁবুর ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলো। হাত দুটো বুকের ওপর শক্তভাবে ভাজ করা, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। মেয়েকে হঠাৎ সোফিয়া লরেনের মতো লাগলো ক্যাপোর, তাঁর প্রিয় অভিনেত্রী। হঠাৎ ক্যাম্প-বেডের পাশে থামলো সে, বাবার দিকে ঝুঁকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো। ‘তুমি জানো নিজের জেদ সব সময় আমি বজায় রাখি,’ বললো সে। ‘ব্যাপারটাকে বেশিদূর গড়াতে না দিয়ে এসো একটা মীমাংসা করে ফেলি। আমাকে সাথে নিতে রাজি হয়ে যাও।’

‘সত্যি আমি দুঃখিত, ক্লডিয়া। তুমি যাচ্ছে না।’

‘ঠিক আছে,’ বড় করে শ্বাস টানলো ক্লডিয়া। ‘কাজটা আমি করতে চাইনি, বাবা, কিন্তু তুমি আমাকে বাধ্য করছো। এখন আমি বুঝতে পারি এই শিকার অভিযান তোমার জন্যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ, শুধু একটা হাতির জন্যে কেন তুমি

একটুকু টাকা খরচ করতে চাইছে। কিন্তু বোঝার পরও, আমি তোমার যাওয়াটা শুন্য করে দিতে চাই। চাই এবং পারি। আমি যদি আমার কর্তব্য পালনের জন্যে তোমার সাথে যেতে না পারি, তাহলে তোমারও যাওয়া হবে না।’

মৃদু হাসলেন শুধু ক্যাপো, জবাব দিলেন না।

‘আমি সিরিয়াস, বাবা, ডেডলি সিরিয়াস। প্লিজ, কাজটা করতে আমাকে বাধ্য করো না।’

‘কিভাবে তুমি আমার যাওয়া বন্ধ করবে, দুই মেয়ে?’

‘ডাক্তার অ্যান্ড্রুজ আমাকে যা বলেছে, সব আমি জানিয়ে দেবো শনকে।’

এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্যাপো, খপ্পু করে মেয়ের একটা হাত ধরে ফেললেন। ‘অ্যান্ড্রুজ তোকে কি বলেছে? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

‘তিনি আমাকে বলেছেন, গত নভেম্বরে তোমার ডান হাতে ছোট্ট একটা কালো নগ দেখা দেয়,’ বললো ক্লডিয়া, ঝট করে হাতটা পিছনে লুকিয়ে ফেললেন ক্যাপো। ‘সুন্দর একটা নাম আছে অসুখটার- মেলানোমা, যেনো একটা মেয়ের নাম। কিন্তু অসুখটা সুন্দর নয়, তাছাড়া, অনেকদিন ধরে ওটাকে পুষছে তুমি। ডাক্তার ওটা কেটে ফেলে দিয়েছেন, কিন্তু প্যাথোলজিস্ট জানিয়েছেন, ওটা ক্লার্ক ৫। অর্থাৎ, ছয়মাস থেকে এক বছর।’

বিহ্বানার ওপর ধপ করে বসে পড়লেন ক্যাপো। হঠাৎ তাঁকে বুড়ো আর ক্লান্ত দেখালো। ‘কবে বললো?’

‘দেড়মাস আগে,’ বাবার পাশে বসলো ক্লডিয়া। ‘সেজন্যেই তোমার সাথে আফ্রিকায় আসতে রাজি হই আমি। যতোটুকু সময় আমাদের আছে তার একটা ঘণ্টাও তোমার আমি একা থাকতে দেবো না। আর সেজন্যেই তোমার সাথে আমাকে মৌজামিকে যেতে হবে।’

‘না,’ মাথা নাড়লেন ক্যাপো ‘তা সম্ভব নয়।’

‘সেক্ষেত্রে শনকে আমি বলবো। যে-কোনো মুহূর্তে ওটা তোমার ব্রেনের নাগাল পেয়ে যাবে।’ বেশি কিছু বলারদরকার নেই ক্লডিয়ার, কারণ রোগটা কতো দিকে ছড়াতে পারে তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডা. অ্যান্ড্রুজ। যদি ফুসফুসে পৌঁছায়, দম আটকে মারা যাবেন তিনি। কিন্তু যদি ব্রেন বা নার্ভাস সিস্টেমের নাগাল পায়, নড়াচড়ার শক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে পঙ্গু হয়ে যাবেন, কিংবা বন্ধ উন্মাদ।

‘তুই বলবি না,’ বললেন ক্যাপো, মাথা নাড়ছেন। ‘এটা আমার জীবনের শেষ সাধ। আমি জানি, এটা থেকে তুই আমাকে বঞ্চিত করতে পারবি না। পারবি

‘বিনা দ্বিধায়,’ জবাবটা ফিরিয়ে দিলো ক্লডিয়া।

মেয়ের দিকে বোকার মতোতাকিয়ে থাকলেন ক্যাপো।

‘আমি কে? তোমার মেয়ে তো? মেয়েটা তার বাবাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। শেষ ক’টা দিন সে তার বাবার সাথে থাকবে। এটা তার শুধু ভালোবাসার দাবি বা কর্তব্য নয়, অধিকারও।’

‘কিন্তু তুই বুঝছিস না। জেনেশুনে তোমে আমি একটা বিপদের মধ্যে....,’ দু’হাতে মুখ ঢাকলেন ক্যাপো। তাঁর পরাজয়ের এই ভঙ্গি দেখে বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো ক্লুডিয়ার, কণ্ঠস্বর দৃঢ় রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হলো।

‘তোমাকে আমি একা মরতে দিতে পারি না, বাবা।’

‘তুই বুঝছিস না এই সাফারি আমার জন্যে কতোটা দরকার। এটা আমার জীবনের শেষ চাওয়া। বুড়ো হাতি আর আমি, একসাথে বিদায় নেবো আমরা। বুঝলে এভাবে আমাকে বাধা দিতিস না।’

‘বাধা তো দিচ্ছি না,’ নরম সুরে বললো ক্লুডিয়া। ‘আমি চাই তুমি যাও; তবে আমিও তোমার সাথে থাকবো।’ দুজনেই হঠা আওয়াজটা শুনতে পেলো, মুখ থেকে হাত সরিয়ে ওপর দিকে তাকালেন ক্যাপো।

‘প্লেন ফিরে আসছে,’ বিড়বিড় করে বললেন তিনি। ‘এখনি এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করবে শন।’ হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন। ‘এখানে পৌছুতে একঘন্টা লাগবে ওদের।’

‘কি বলবে ওকে তুমি?’ জিজ্ঞেসা করলো ক্লুডিয়া। ‘বলবে, আমিও তোমাদের সাথে যাচ্ছি?’

\* \* \*

‘প্রশ্নই ওঠে না!’ তীব্র প্রতিবাদ জানালো শন। ‘অসম্ভব! ভুলে যান, ক্যাপো। ক্লডিয়া আমাদের সাথে যাচ্ছে না।’

‘আপনার সাথে আধ মিলিয়ন ডলারের একটা চুক্তি হয়েছে আমার,’ বললেন ক্যাপো। ‘ওর যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারটা তখন চূড়ান্ত হয়নি। এখন আমি বলছি, ও যাবে।’

টয়োটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। ক্যাম্পে ফিরে গাড়ি থেকে নেমেই বাপ-বেটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে শন, ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো ও, দু’জনের চেহারায়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভাব দেখে মনে মনে মস্তক বোধ করলো। কড়া কিছু বলতে যাচ্ছিলো, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো, উপলব্ধি করলো, রাগারাগিকরে কোনো লাভ হবে না। ‘ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করুন, ক্যাপো,’ বললো ও। ‘আপনি জানেন, এ সম্ভব নয়।’

দু’জনেই গম্ভীর, শামুকেরমতো নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেছে; যুক্তি মানবে না।

‘ওখানে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। ওকে আমি নিয়ে যেতে পারি না।’

‘ক্লডিয়া যাবে।’

‘ক্যাপো, আপনি...।’

‘এতো কেন আপত্তি তোমার, এই জন্যে যে আমি একটা মেয়ে?’ এই প্রথম কথা বললো ক্লডিয়া। ‘এমন কোনো কাজ আছে যা পুরুষরা পারে অথচ আমি পারি না?’

‘দাঁড়িয়ে পেশাব করতে পারো তুমি?’ ক্লডিয়াকে খেপিয়ে তুলতে চাইলো শন, কিনউত অমার্জিত উপহাসটুকু অগ্রাহ্য করে এমন সুরে কথা বলে গেলো সে, যেনো শনের কথা শুনতেই পায়নি।

‘আমাকে তুমি মাইলের পর মাইল হাঁটতে দেখেছো, আমি রোদ সইতে পারি, সেথসি মাছিকে ভয় পাই না-বাবার চেয়ে কোনো দিক থেকে অযোগ্য আমি?’

ক্লডিয়ার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ক্যাপোর দিকে তাকারো শন ‘একজন বাপ হিসেবে আপনি অনুমতি দিতে পারেন না। কল্পনা করতে পারেন, একদল রেনামো খুনেদের হাতে পড়লে কি অবস্থা হবে ওর?’

রিকার্ডো শিউরে উঠতে দেখলো শন, তবে ক্লডিয়ার তা দেখতে পেলো এবং বাবা দুর্বল হয়ে পড়ার আগেই তাঁর একটা হাত ধরে দৃঢ়স্বরে বললো, ‘হয় আমিও যাবো, নয়তো কারো যাওয়া হবে না। বাবার সাথে তোমার একটা চুক্তি হয়েছে, সেটা ভঙ্গ করার আগে মাতাউদের জিজ্ঞেস করে দেখো তারা পাঁচ লাখ ডলার হারাতে রাজি আছে কিনা,’ তার এই শেষ কথাটায় চ্যালেঞ্জের সুর চাপা থাকলো না।

‘ক্যাপো, কে আমার সাথে কথা বলবে এখানে, আপনি না ক্লডিয়া?’

‘ও-সব প্যাঁচে কোনো কাজ হবে না,’ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো ক্লডিয়া, যদিও প্রতীকী অর্থে তার ইচ্ছেকরছে শিকারী লোকটাকে খামচে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে

দেয়। ‘এ-ব্যাপারে আমি আর বাবা একমত হয়েছি। হয় দু’জনেই আমরা যাবো, নয়তো কেউ যাবো না-তাই না, বাবা?’ বাপের আরো গা ঘেঁষে দাঁড়ালো সে।

‘হ্যাঁ, শন, রিকার্ডো মনটেরোকে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখালো।’ ক্লডিয়া ঠিক বলেছে। গেলে আমরা দু’জনেই যাবো।’

ঝট করে ঘুরলো শন, নিজের তাঁবুর দিকে ফিরে যাচ্ছে। কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো ও, হাত দুটো উঠে এলো কোমরে।

তর্ক শুনে ক্যাম্পের স্টাফরা মেসের জানালা-দরজা থেকে উঁকি দিচ্ছে সবার চোখে-মুখে একাধারে উদ্বেগ আর কৌতূহল। ‘অমন হাঁ করে কি দেখছো তোমরা? কারো কোনো কাজকর্ম নেই?’ চোখের পলকে ছিটকে পালিয়ে গেলো সবাই।

ঘুরলো শন, ধীর পায়ে ফিরে এলো টয়োটার কাছে। ‘ঠিক আছে,’ বললো ওঠ, ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্লডিয়ার দিকে। ‘নিজের গলায় ছুরি চালাও, তবে ব্যাণ্ডেজের জন্যে আমার কাছে এসো না।’

‘আসবো না, কথা দিলাম,’ ক্লডিয়ার কথায় যেনো মধুর প্রলেপ দেয়া, সরাসরি উল্লাস প্রকাশ পেলে এতোটা বোধ হয় গা-জ্বালা করতো না। দু’জনেই জানে, আপোষের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

‘আমাদের কিছু পেপারওঅর্ক সারতে হবে, রিকার্ডো,’ বলে নিজের তাঁবুর দিকে এগোলো শন, একবারও পিছন ফিরে তাকালো না।

পুরনো একটা রেমিংটন টাইপরাইটার আছে ওর, সেটার সামনে বসে ইনডেমনিটি স্টেটমেন্ট টাইপ করলো, একটা ক্যাপোর জন্যে, আরেকটা ক্লডিয়ার জন্যে। দুটোই শুরু হলো এভাবে, ‘আই অ্যাকনলেজ দ্যাট আই য্যাম ফুলফি অ্যাউয়ার অভ দ্য ডেঞ্জার অ্যাণ্ড দি ইললিগালিটি...।’ সবশেষে একটা স্বাণপত্র টাইপ করলো শন, জোব আর হেড ওয়েটারকে ডাকলো সাক্ষী হিসেবে সই করার জন্যে। সবগুলো কপি মেস টেন্টের ছোট্ট স্টীল সেফ-এ রাখা হলো, প্রথম সুযোগেই রীমার নামে শনের অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

‘তবে, শুরু করা যাক!’ বলে, উঠে দাঁড়ায় শন।

\* \* \*

সব মিলিয়ে সাতজন ওরা। নতুন লোকটার নাম ডেডান, নদী পারপার থেকে এই তুকুটেলার খবর নিয়ে এসেছিল। ‘দল ভারি হয়ে গেলো,’ বললো শন, ‘তবে ঈশ্বর নেই, একেকটা আইভরি একশো ত্রিশ পাউণ্ড ওজন। পোর্টার হিসেবে মাতাউ কোনো কাজে আসবে না। আইভরি দুটো আনতে চারজন সমর্থ লোক লাগবে হামাদের।’

মালপত্র টয়োটার তোলার আগে সব আবার খুলতে বললো শন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করলো। ক্লুডিয়ার ব্যাগে হাত দিতেই প্রতিবাদ করলো সে, ‘আমার প্রাইভেসিতে হামলা চালানো হচ্ছে। কোনো মেয়ের ব্যক্তিগত জিনিস হাতড়ানো অভদ্রতা।’

‘যাও, সুপ্রীম কোর্টে মামলা ঠুকে দাও, ডাকি।’ প্রতিবাদে কান না দিয়ে ব্যাগ খুলে বিশটা কসমোটিকস-এর শিশি, টিউব আর কৌটা নামালো শন, সেগুলো থেকে বাছাই করলো মাত্র তিনটে টিউব, বললো, বাকি সতেরোটা নেয়া যাবে না। অতিরিক্ত আগুয়োর নিতে পারবে একটা’ অর্থাৎ বাকি পাঁচটা রেখে যেতে হবে। প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা হলো ক্লুডিয়ার। এখানো প্রচণ্ড রেগে আছে শন, তার এই অবস্থা দেখে খানিকটা তৃপ্তিবোধ করলো ও।

এক সময় শেষ হলো কাজটা। মুধু একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সাথে নেয়া হচ্ছে। সতর্কতার সাথে মাপা হলো প্রতিটি ব্যাগ ও বোঝা, বহনকারীদের শারীরিক সামর্থ্যে ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে বরাদ্দ সেগুলো। শন, জোব, পিউমুলা আর ইনসুতা, প্রত্যেকে বহন করবে ষাট পাউণ্ড করে। ক্যাপো আর মাতাউ চল্লিশ পাউণ্ড। ক্লুডিয়াকে দেয়া হলো পঁচিশ পাউণ্ড।

‘আমি আরো বেশি নিতে পারবে,’ প্রতিবাদের সুরে বললো সে। ‘মাতাউর মতো আমাকেও চল্লিশ পাউণ্ড দেওয়া হোক।’ শন তার কথার উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না।

‘তাছাড়া আমি খাইও কম!’ কিন্তু শন ততোক্ষণে পিছন ফিরে টয়োটায় মাল তোলার তদারকি শুরু করেছে।

\* \* \*

চিউইউই ক্যাম্প ছাড়লো ওরা। দিনের আলো ফুরোতে এখনো চার ঘণ্টা বাকি। অত্যন্ত দ্রুতবেগে গাড়ি চালালো শন, বিরতিহীন ঝাঁকি খেয়ে হাঁপিয়ে গেলো সবাই। ক্লুডিয়ার উপস্থিতির বিরুদ্ধে এটা ওর প্রতিবাদ, তবে সেটা আংশিক কারণ মাত্র, আসল কারণ হলো রাত নামার আগেই সীমান্তে পৌঁছনো।

গাড়ি চালাতে চালাতে কথা বলছে শন, 'মোজাম্বিকের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সবারই একটা প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। আফ্রিকায় সমাজতন্ত্রের ধারক-মোজাম্বিক। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এটা ছিলো পর্তুগীজ কলোনি। প্রায় ৫০০ বছর ধরে তারাই এখানে রাজত্ব করেছে। পনেরো মিলিয়ন মানুষ সুখে-শান্তিতেই ছিলো। জার্মান বা ব্রিটিশদের বিপরীত, পর্তুগীজরা এখানকার লোকদের অনেকটা ভালো চোখে নিয়েছিলো। আইন হয়েছিলো, একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করতে পারলে কালো দের শেতাঙ্গদের মতোই মর্যাদা দেয়া হবে, সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে। অন্যান্য যে জায়গাতেই এই আইন বলবৎ আছে, তাদের মতো এখানেও ব্যাপারটা সফল ছিলো। কলোনিয়াল এই নিয়মে শান্তিতে ছিলো দেশবাসী।'

'হুহ!' মুখ ঝামটা দেয় ক্লুডিয়া। 'ওইসব প্রপাগান্ডা বন্ধ করো।'

'সত্যি কথা হলো,' শন বলে চলে, 'প্রাক্তন ব্রিটিশ কলোনিতে যেমন ছিলো, এখন তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে আফ্রিকার লোকজন। এখানে, মোজাম্বিকে কালোরা এখন অবর্ণনীয় অবস্থায় রয়েছে।'

'অন্তত, তারা মুক্ত তো আছে!' ক্লুডিয়া বলে।

'স্বাধীনতা? মুক্তি? প্রতি বছর এখন লোকসানে চলছে দেশ, যেখানে আগে লোকজন খেয়ে-পড়ে বাঁচতো। সমাজের সবগুলো স্তরে পাকাপোক্ত আসন গেড়ে বসেছে বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা আর দুর্নীতি। বিদেশী ঋণের পরিমাণ জাতীয় উৎপাদনের দ্বিগুণ। শতকরা মাত্র পাঁচভাগ ছেলেমেয়ে অনুমোদিত স্কুলে যাবার সুযোগ পায়। শিশু মৃত্যুর হার প্রতি এক হাজারে তিনশো চল্লিশ। এরচেয়ে খারাপ আছে শুধুমাত্র আর দুটি দেশ- অ্যাঙ্গোলা এবং আফগানিস্তান।'

'একটা দেশের অবস্থা এতোটা খারাপ হয় কি করে?' প্রতিবাদ করলো ক্লুডিয়া।

'আরো দুটো প্রসঙ্গ এখনো তুলিনি-গৃহযুদ্ধ ও এইডস। যাবার সময় পর্তুগীজরা একনায়ক সামুরা ম্যালেস ও তার দল ফ্রেলিমোকে ক্ষমতা দিয়ে যায়। মার্কসিস্ট ম্যালেস মহোদয় নির্বাচন বা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না, তাঁর শাসনেরই সমরাসরি ফল হলো বর্তমান অবস্থা। ন্যাশনাল মোজাম্বিকান রেজিস্ট্যান্স-এর মতো সশস্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন তার আমালেই মাথাচাড়া দেয়। ন্যাশনাল মোজাম্বিকান রেজিস্ট্যান্স-সংসেপে রেনামো। এই সংগঠন সম্পর্কে কারো তেমন কিছু জানা নেই। কে তাদের নেতা, কি তাদের উদ্দেশ্য, এইসবই অস্পষ্ট তবে রেনামোই দেশের বেশিরভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষ করে উত্তরদিকটা। রেনামোর গেরিলাদের কসাই বললেও কম বলা হয়।'

‘সামুয়া ম্যাশেল প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর ফেলিমো পার্টি এখনো চলে আছে, বরং আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। রেনামো গেরিলাদের যদি ~~কম~~ই বলা হয়, ফেলিমোদের বলা যায় জল্লাদ। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ওরা, অর্থাৎ সেখানে সেখানে যুদ্ধ চলছে পোটা মৌজাম্বিক জুড়ে।’

‘কোন নরকে যাচ্ছি তার একটু আভাষ দিলাম। এসো প্রার্থনা করি, ফেলিমো ব রেনামো কারো হাতেই যেনো না পড়ি আমরা।’ চিন্তাটা শনের ঘাড়ের পিছনে শিরশিরে একটা ভাব এনে দিলো, অনুভব করলো রাগ ঝেড়ে ফেলে হালকা হয়ে হচ্ছে ওর মন। আবার মারাত্মক বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে ও, দেহ-মনে ছড়িয়ে পড়ছে উপভোগ্য রোমাঞ্চ। মেয়েটা দলে থাকায় কেন যেনো এখন আর অস্বস্তিবোধ করছে না, বরং তাকে রক্ষা করার একটা কর্তব্যবোধ জাগছে অন্তরের পতীরে। ভাবলো, ক্রুডিয়া আমেরিকায় ফিরে গেলে এই অভিযানের কোথায় যেনো একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যেতো। চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে শন, দেখাদেখি বাকি সবাইও নীরব হয়ে গেলো, এমনকি টয়োটার পিছনে দাঁড়ালো লোকগুলোও। সীমান্ত হতো এগিয়ে আসছে, নিশ্চিন্ততা ততোই যেনো গভীর হয়ে উঠলো।

অবশেষে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকারো শন, সাথে সাথে সাই দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো জোব। ‘দিস ইজ ইট, লেডিস অ্যাও জেন্টেলমেন,’ শান্ত গলায় বললো শন। আরো খানিকটা গাড়িয়ে পাথরবহুল একটা ঢালের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লো টয়োটা।

‘কোথায় পৌঁছলাম আমরা?’ জানতে চাইলেন ক্যাপো।

‘এখান থেকে সীমান্ত তিনমাইল দূরে, তবে গাড়ি নিয়ে আর পাঁচশো গজ যাওয়াও নিরাপদ নয়। শুরু হলো আমাদের পদযাত্রা।’

ট্রাক থেকে নামার জন্যে পা বাড়ালেন ক্যাপো, তীক্ষ্ণকর্মে তাঁকে বাধা দিলো শন। ‘থামুন, ক্যাপো! পাথরের ওই টুকরোটায় পা রাখুন, কোনো ছাপ ফেলবেন না।’

ট্রাক থেকে একজন একজন করে নামলো সবাই, যে যার বোঝা নিয়ে; শনের নির্দেশে প্রত্যেকে তার সামনের লোক যেখানে পা ফেলেছে ঠিক সেখানে পা ফেললো। সবার শেষে নামলো মাতাউ, পিছু হটতে শুরু করলো সে, শুখনো ঘাসের তৈরি ঝাঁটা দিয়ে মুছে ফেলছে সমস্ত দাগ, ওরা যে এখানে ট্রাক থেকে নেমেছে তা যেনো কেউ বুঝতে না পারে।

ট্রাকটা ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে হেড ওয়েটার। রওনা হবার আগে শনের সামনে দাঁড়ালো সে, বললো, ‘নিরাপদে ফিরে আসবেন, বাবু।’

‘আশা কম,’ হেসে উঠলো শন, হাত নেড়ে বিদায় দিলো তাকে। তারপর জোবের দিকে ফিরলো। ‘অ্যান্টি ট্র্যাকিং, লেট’স গো!’

ক্রুডিয়া বা ক্যাপো অ্যান্টিট্র্যাকিং পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই জানে না, কারণ শিকার করার সময় অবোধে শুধু ধাওয়া করেছে তারা। দলটা ঝাঁক বাধলো ইণ্ডিয়ান ফাইল-

এর আকৃতিতে একজনের পিছনে একজন। জোব পথ দেখাচ্ছে, বাকি সবাই তার পা ফেলার জায়গা মাড়িয়ে সামনে এগোলো। ওদের সবার পিছনে রয়েছে মাতাউ, ওস্তাদ জাদুকর, সযত্নে মুছে ফেলছে প্রতিটি চিহ্ন-আঙুলের নরম সম্পর্শে ভাঁজ খাওয়া একটা ঘাসকে সোজা করলো, আগের জায়গায় বসালো ছোট্ট একটা নুড়ি পাথর, খেয়াল রাখলো ওটার শ্যাওলা ধরা গা যাতে ওপর দিকে থাকে, মাটির ওপর ঝাঁটা বুলালো, নিচু ডাল থেকে সদ্য খসে পড়া একটা পাতা বা একটা খেঁতলানো ঘাস তুলে নিলো।

বন্যপ্রাণিদের আসা-যাওয়ার পথ ও নরম মাটি এড়িয়ে গেলো জোব, যদিও তার হাঁটার গতি অসম্ভব দ্রুত। আঁধ ঘন্টার মধ্যে দুই শোভার ব্লেন্ডের সাঝখানে ও শার্টের বোতাম-ঘরের পিছনে তাজা ঘামের ঠাণ্ডা পরশ অনুভব করলো ক্লডিয়া। পথ দেখিয়ে নিচু একটা পাহাড়ে তুলে আনছে ওদেরকে জোব। ইস্তিতে সবাইকে মাথা নিচু করতে বললো শন, আকাশের গায়ে ওদের কারো কাঠামো যাতে ফুটে না ওঠে। পিছনে অস্ত যাচ্ছে সূর্য।

‘মনে হচ্ছে ওরা ওদের কাজ বোঝে?’ পিউম্বা ও ডেডান সম্পর্কে মন্তব্য করলেন ক্যাপো। কেউ নির্দেশ দেয়নি, নিজেরাই তারা জোবের দু’পাশে, বেশ খানিকটা সামনে সরে গেছে, আসলে পাহারা দিচ্ছে গোটা দলটাকে।

‘বোঝে বৈকি,’ বললো শন, ক্যাপো আর ক্লডিয়ার মাঝখানে বসে পড়লো আড়াল হিসেবে সামনে ঝোপ রয়েছে। ‘ওরাও তো যুদ্ধ করেছে।’

‘আমরা এখানে থামলাম কেন?’ জানতে চাইলো ক্লডিয়া।

‘বসে আছি সীমান্তের ওপর,’ বললো শন। ‘দিনের বাকি আলোয় সামনেটা পরীক্ষা করবো। চাঁদ উঠলেই পার হবো আমরা’।

চোখে জিউস বাইনোকুলার তুলে দূরে তাকালো শন। কয়েক ফুট দূরে মাটিতে পেট দিয়ে শুয়ে রয়েছে জোব, সে-ও একই দিকে তাক করেছে তার বাইনোকুলার। মাঝে মধ্যে চোখ রগড়াবার বা লেন্স থেকে ধুলো পরিষ্কার করে জন্যে ওগুলো নামালো ওরা। নিজেদের কাজে এতো মগ্ন, আর কোনো দিকে খেয়াল নেই। গোধূলির লালিমা ফিকে হয়ে আসছে, এই সময় বাইনোকুলারটা বুক পকেটে ভরে রাখলো শন, তাকালো ক্লডিয়ার দিকে।

‘মেকআপ করার সময় হয়েছে তোমার,’ বললো ও। এক মুহূর্তের জন্যে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না ক্লডিয়া, তারপরই ক্যামোফ্লেজ ক্রীমের আঠালো ছোঁয়া অনুভব করলো গালে, ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে আনলো মাথাটা।

‘স্থির হও,’ ধমক দিলো শন। ‘তোমার সাদা মুখ আয়নার মতো চকচক করছে। পোকা আর রোদ থেকেও এটা তোমাকে রক্ষা করবে।’ শুধু মুখ নয়, তার হাতের উল্টোদিকেও ক্রীম লাগালো ও। তারপর নিজেও খানিকটা মাখলো।

‘ওই চাঁদ উঠছে। এবার আমরা রওনা হতে পারি।’

বঁরে আকৃতি ঠিক থাকলেও জায়গা বদল করলো ওরা। দু'পাশে আর সামনে  
হলো জোব ও পিউমুলা, মাঝখানে ট্র্যাকার-এর ভূমিকায় শন, মাতাউ আগের  
মতোই পিছনে-খুশিমনে ওদের ফেলে আসা চিহ্ন মুছে ফেলছে।

চলার পথে একবার থেমে ক্লডিয়ার ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করলো শন। ওর  
বাঁশের একটা স্ট্র্যাপ ঢিলে হয়ে আছে, স্ট্র্যাপের সাথে আটকানো ইস্পাতের হুকটা  
এই পদক্ষেপের সাথে শব্দ করছে, শব্দটা এতোই অস্পষ্ট যে খেয়াল করেনি  
ক্লডিয়া। 'এমন আওয়াজ করছো না!' স্ট্র্যাপটা আটকানোর সময় তার কানে  
নিঃশব্দ ছাড়লো শন।

'অহঙ্কারী শয়তান,' ভাবলো ক্লডিয়া।

নিঃশব্দে হাঁটছে ওরা। এক ঘন্টা পেরিয়ে গেলো, তারপর আরো একটা কোনো  
বৈধি ছাড়াই। ঠিক কখন ওরা সীমান্ত পার হয়েছে বলতে পারবে না। ক্লডিয়া।  
কুমির ফাঁক গলে নিচে নেমে আসা চাঁদের আলো রূপালী, তার সামনে শনের  
চক্কা কাঁধের ওপর গাছপালার ছায়াগুলো কাঁপছে।

ধীরে ধীরে নিস্তব্ধতা ও চাঁদের আরো স্বপ্নে মতো একটা অবাস্তব পরিবেশ  
তৈরি করলো। ক্লডিয়ার মনে হলো পরিবেশটা তাকে যেনো গ্রাস করে ফেলেছে,  
যেনো ঘুমের ভেতর হাঁটছে সে, আর তাই হঠাৎ করে শন দাঁড়িয়ে পড়তে ওর সাথে  
বন্ধা খেলো সে, পুরুষালি শক্ত হাতে শন তাকে জড়িয়ে না ধরলে হয়তো পড়েই  
যতো।

অটল দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা, কান পাতলো, তাকিয়ে আছে বনভূমির গাঢ় ছায়ার  
ভেতর। প্রায় পাঁচ মিনিট পর সামান্য একটু নড়লো ক্লডিয়া, নিজেকে শনের হাত  
থেকে মুক্ত করার জন্যে। কিন্তু সাথে সাথে শনের বাঁধন আরো শক্ত হলো। বাধ্য  
হয়ে পেশীতে ঢিল দিলো ক্লডিয়া। ডান পাশ থেকে একটা পাখি ডেকে উঠলো,  
জোবের সংকেত। নিঃশব্দে মাটিতে বসে পড়লো শন, নিজের সাথে টেনে নিলো  
ক্লডিয়াকেও। আশপাশে কোথাও সত্যিকার বিপদ গুঁত পেতে আছে, উপলব্ধি করে  
আরো টান পড়লো ক্লডিয়ার নার্ভে। এখন আর শনের হাতটা তাকে অস্বস্তির মধ্যে  
ফেলছে না। আরো একটু গা ঘেষে বসলো সে। ভালো লাগলো অনুভূতিটা।

অন্ধকার থেকে আরেকটা পাখি ডেকে উঠলো। ক্লডিয়ার কানে ঠোট ঠেকালো  
শন। 'বসে থাকো,' নিঃশব্দ ফেললো ও।

শরীর থেকে হাতটা সরে যেতেই নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ আর অসহায় লাগলো  
ক্লডিয়ার। ছায়ার মতো আলগোছে শনকে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেতে  
দেখলো সে।

নিচের দিকে বুকে সামনে বাড়লো শন, এক হাতে রাইফেল, অপর হাতে দিয়ে  
মাটি থেকে গুনকো ডাল সরাসরি, পা পড়লে যাতে শব্দ না হয়। জোবের কাছ থেকে  
দশ ফুট পিছনে শুয়ে পড়লো ও। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গাঢ় আকৃতিটার দিকে তাকালো।

হাতের তালু উঁচু করে সংকেত দিলো জোব। তার সামনে ও বাম দিকে মনোযোগ দিলো শন।

কয়েক মিনিট কিছুই দেখতে পেলো না। তবে জোবের প্রতি আস্থা আছে ওর, অপেক্ষায় থাকলো। রাতের বাতাস থেকে হঠাৎ একটা ঝাঁক ঢুকলো নাকে, নাক তুলে জোরে বাতাস টানলো শন। ধৈর্য ধরার ফল পাওয়া গেলো। চুরুটের গন্ধ ওটা। গন্ধ থেকে ব্র্যাণ্ডও চেনা গেলো, বিশেষ করে ফেলিমো গেরিলাদের খুব প্রিয়।

জোবকে সংকেত দিলো শন, তারপর দু'জনেই সামনে বাড়লো। ক্রল করে এগোলো ওরা, নিঃশব্দে। চল্লিশ কদমের মতো এগোবার পর থামলো। তারপরই চুরুটের হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা আগুনটা দেখতে পেলো শন। কাশলো লোকটা, থুতু ফেললো। ওদের সরাসরি সামনে বড় একটা গাছের তলায় রয়েছে সে। এতোক্ষণে তার আকৃতিটাও দেখতে পেলো শন। গাছের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে।

কে হতে পারে লোকটা? স্থানীয় আদিবাসী? পোচার? মধু চোর? রিফিউজি? না, মনে হয় না। লোকটা অতি মাত্রায় সজাগ ও সতর্ক, প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় একজন পাহাড়ার। তারপর আরো সামনে কি যেনো নড়ে উঠতে দেখলো শন। মাটির সাথে সঁটে গেলো শরীরটা।

জঙ্গল থেকে আরেকজন লোক বেরিয়ে এলো, তাকে দেখে গাছের তলা থেকে প্রথম লোকটা উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়াতেই তার কাঁধে ঝোলানো এ/কে ফরটিসেভেন রাইফেলটা দেখতে পেলো শন। দুজন নিচু গলায় কথা বলছে।

পালা বদল, ভাবলো শন। দ্বিতীয় লোকটা গাছতলায় থেকে গেলো, জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হলো প্রথম লোকটা। তারমানে ওদিকে একটা ক্যাম্প আছে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো শন, অনেক দূর থেকে গাছতলায় বসে থাকা লোকটাকে পাশ কাটালো। পেরিমিটারের ভেতরে এসে দাঁড়ালো সোজা হয়ে, হন হন করে এগোলো। পাহাড়ের গা এক জায়গায় ভাঁজ হয়ে আছে, ক্যাম্পটা তার ওপর। অস্থায়ী ক্যাম্প, কোনো ঘর বা তাঁবু নেই। দু'জায়গায় আগুন জ্বলছে, কয়লা হয়ে গেছে কাঠ, কোনো শিখা নেই। আগুনদুটোর ধারে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কিছু লোক। গুণলো শন; এগারোজন। আরো হয়তো পাঁচ-ছয়জন পাহারায় আছে। ছোটো একটা দল।

সাথে অটোমেটিক অস্ত্র নেই, তবু লোকগুলোকে ঘায়েল করার সম্ভব। মাতাউর কাছে ছাল ছাড়াবার ছুরি আছে, বাকিসবার কাছে আছে পিয়ানোর তার দিয়ে তৈরি ফাঁস। ক্যাম্পের প্রতিটি লোক ঘুমের মধ্যেই মারা পড়বে।

ক্ষোভে মাথা নাড়লো শন, বুঝতে পারছে হয় ওরা ফেলিমো ট্রুপ, নয়তো রেনামো গেরিলা। পরিচয় যাই হোক, তার সাথে ওর কোনো বিবাদ নেই, অন্তত হাতি শিকারে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ালো পর্যন্ত। পিছিয়ে এলো শন, পেরিমিটারের কাছে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে জোব। নিঃশ্বাস ফেললো ও, 'আগুনের ধারে এগারোজন।'

‘আরো দু’জন সেন্ত্রিকে দেখেছি আমি,’ জানালো জোব।

‘ফেলিমো?’

‘কি করে বলি!’ কাঁধ ঝাঁকালো জোব। তার হাত ছুঁলো শন, দু’জন পিছিয়ে এলো আরো খানিকটা।

‘কি ভাবছে তুমি, জোব?’ তার মতামত জানতে চাইলো শন।

‘ছোট্ট একটা দল, গ্রাহ্য না করলেও চলে। ওদেরকে পাশ কাটাতে পারি আমরা।’

‘বড় কোনো দলের অ্যাডভান্সড গার্ড হতে পারে।’

‘তবে ক্র্যাক ট্রুপ নয় ওরা,’ বিড়বিড় করলো জোব। ‘পাহারায় বসে চুরুট খাচ্ছে, আগুনের ধারে ঘুমাচ্ছে। উঁই, সোলজার হতে পারে না। ট্যুরিস্ট।’

‘তুমি তাহলে যেতেই চাও?’ জিজ্ঞেস করলো শন।

‘যেতে চাই বা না চাই, পাঁচ লাখ ডলার আমাকে টেনে নিয়ে যাবে,’ চাপা গলায় হেসে উঠলো জোব।

\* \* \*

ভয় পেয়েছে ক্লডিয়া। আফ্রিকার কালো রাত কতো রকম অজানা রহস্য আর অনিশ্চয়তার ভরা। এখন যদি গা বেয়ে একটা সাপ ওঠে, কি করার আছে তোমার? কিংবা যদি ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে কোনো সিংহ? অপেক্ষার সময়টা অসহ্য লাগলো তার, যতো রকম ভীতিকর আশঙ্কা আছে সব ভিড় করলো মনে। শন যাবার পর প্রায় এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, অথচ এখনো তার ফেরার নাম নেই। নিজেকে একাকী ও অসহায় লাগছে তার।

তারপর হঠাৎ ফিরে এলো শন, ওকে দেখে এতোটা স্বস্তিবোধ করলো ক্লডিয়া যে মনে মনে ভারি লজ্জা পেলো। তার ইচ্ছে হলো, হাত বাড়িয়ে ছোঁয় শনকে, ওকে ধরে বুলে পড়ে। বাবার কানে ফিসফিস করছে শন, শোনার জন্যে কাছে সরে এলো সে। তার বাহু শনের বাহুতে ঠেকলো, যদিও শন তা লক্ষ্য করেছে বলে মনে হলো না, কাজেই হাতটা সরালো না সে। ছোঁয়াটা তার মনে আশ্চর্য একটা অনুভূতির সৃষ্টি করলো, যেনো এখন আর কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, সম্ভাব্য সব রকম বিপদ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ সে।

প্রথম দলটার আকার সম্পর্কে বললো শন, তারপর রিকার্ডের মতামত জানতে চাইলো। 'ব্যাপারটা আপনার ওপর নির্ভর করে। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এগোবেন, নাকি ফিরে যাবেন?'

'তুকুটেলাকে আমার চাই-ই।'

'ফিরে যাবার এটাই কিন্তু শেষ সুযোগ,' সাবধান করে দিলো শন।

'আপনি সময় নষ্ট করছেন,' বললেন ক্যাপো।

বাবার সিদ্ধান্ত দ্বন্দ্ব ফেলে দিলো ক্লডিয়াকে। এখন ফিরে যেতে হলে মনটা খারাপ হয়ে যাবে, সন্দেহ নেই। অথচ আফ্রিকার আসল মজার প্রথম স্বাদ তার কাছে তেমন উপবোগ্য লাগেনি। আবার যাত্রা শুরু হলো শনের। সরাসরি পিছনে থাকলো সে, উপলব্ধি করলো জীবনে এই প্রথম সভ্যতার নিরাপদ আশ্রয় ও সুযোগ-সুবিধে থেকে অনেক দূরে রয়েছে। এখানে তাকে রক্ষা করার জন্যে পুলিশ নেই, নেই আইনের সহায়তা বা সুবিচারের আশ্বাস। সাপের সামনে ব্যাঙ যেমন অসহায়, রহস্যময় ও বিপদসংকুল আফ্রিকার জঙ্গলে সে-ও তেমনি অসহায়। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো ক্লডিয়া, শনের যতোটা সম্ভব কাছাকাছি থাকতে চায়। মনে হলো, এতোদিন তার বেঁচে থাকার মধ্যে যেনো পরিপূর্ণতা ছিলো না, এতোটা সচেতন আগে কখনো হতে পারেনি সে। জীবনে এই প্রথম সে তার অস্তিত্বের শেষ ধাপে পৌঁছেছে, এটাকেই বোধহয় লেভেল অভ সারভাইভাল বলে অনুভূতিটা আনন্দঘন, যেনো একটা নেশায় পেয়েছে তাকে।

দিকভ্রান্ত হয়ে পড়লো ক্লডিয়া। কখনো আঁকারাকা পথ ধরে এগোলো দলটা, কখনো পিছু হটলো, আবার কখনো ঘন ঘন বাঁক ঘুরলো প্রায়ই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে ওরা, পাশ থেকে পাখির ডাক না শুনলে নড়ছে না এক চুল। ক্লডিয়া লক্ষ্য করলো, আকাশের দিকে মুখ তুলে তারাগুলোকে দেখে দিক নির্ণয় করছে শন।

তারপর এক সময় খেয়াল হলো তার, অনেকক্ষণ হলো তারা থামেনি বা দিক বদল করেনি, সোজা হাঁটছে। বোঝা গেলো, আপাতত বিপদের কোনো ভয় নেই। উত্তেজনা কমে আসার সাথে সাথে পা দুটো অসম্ভব ভারি লাগলো তার, পিঠে ব্যথা অনুভব করলো। হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালো চোখ রেখে হিসাব করলো, গোপন ক্যাম্পটাকে পাশ কাটাবার পর পাঁচ ঘন্টা ধরে হেঁটেছে তারা।

খোলা একটা ঘাসবন পেরুলো ওরা। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপ ধরে গেলো। বুটের ফাঁক গলে শিশির ঢুকলো ভেতরে, ভিজে গেলো মোজা।

‘থামবো কখন?’ শনের পিঠের ওপর চোখ রেখে ভাবলো ক্লডিয়া। কিন্তু শনের মধ্যে থামার কোনো লক্ষণ নেই। এক সময় ক্লডিয়ার মনে হলো, তাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে থামছে না শন। থামবে, সে যদি করুণ সুরে আবেদন জানায়।

‘ঠিক আছে, দেখাবো মজা! ব্যাগ খুলে জ্যাকেটটা বের করলো ক্লডিয়া, হাঁটার গতি একটুও কমলো না। তারপর হঠাৎ অবাক হয়ে গেলো সে। ঘাড়ের ঝুলে থাকা শনের চুলগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কিভাবে?’

চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো ক্লডিয়ার, যেনো আর কোনোদিন ভোর হবে বলে আশা করেনি সে। এই সময় অবশেষে থামলো শন। নিজেই তাকে পাশে টেনে আনলো ক্লডিয়া, ক্লান্তিতে পায়ের পেশীগুলো কাঁপছে।

‘দুর্গন্ধ, ক্যাপো,’ বললো শন। ‘একটু বেশি কষ্ট দিলাম। আলো ফোটার আগে লোকগুলোর কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে সরে আসার দরকার ছিলো। কেমন বোধ করছেন আপনি?’

‘নো প্রবলেম,’ বিড়বিড় করলেন ক্যাপো, তবে ভোরের প্রথম আলোয় তাঁকে ক্লান্ত, স্নান ও বিধ্বস্ত দেখালো। বাবার দিকে তাকিয়ে আতঙ্ক বোধ করলো ক্লডিয়া, তাকেও কি ওরকম দেখাচ্ছে?

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে পড়লেন ক্যাপো। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্লডিয়ার দিকে ফিরলো শন, ঠেটে মৃদু হাসি।

‘কেমন বোধ করছি জিজ্ঞেস করো না আমাকে,’ ভাবলো ক্লডিয়া। ‘স্বীকার করার বদলে নর্দমার পানি খেতেও রাজি আছি।’

মাথাটা একটু পিছিয়ে নিলো শন, ভঙ্গিটা প্রশংসাসূচক নাকি সহানুভূতিসূচক ঠিক বুঝতে পারলো না ক্লডিয়া। প্রথম আর তৃতীয় দিনটাই কষ্টকর, বললো শন।

‘আমার কোনো অসুবিধা নেই,’ আড়ষ্ট কাঁধ দুটো সামান্য ঝাঁকালো ক্লডিয়া। ‘চমৎকার আছি। আরো অনেকক্ষণ হাঁটতে পারবো।’

‘পারবে বৈকি,’ ঠোঁট টিপে হাসলো শন। ‘তুমি বরং তোমার বাবার একটু যত্ন নাও।’ ঝটপট আগুন জ্বাললো জোব, ওদেরকে চা দিয়ে গের পিউমুলা। কাপে চুমুক দিয়ে শন সাবধান করলো, ‘কয়েক মিনিটের মধ্যে রওনা হবো আমরা।’ ক্লডিয়ার চোখে হতাশা লক্ষ্য করলো ও। তারপর ব্যাখ্যা দিলো, ‘আমরা কখনো আগুনের ধারে ঘুমোই না। ধোঁয়া অনেক দূর থেকে দেখা যায়।’

আরো পাঁচ মাইল হাঁটলো ওরা, তারপর বিশ্রামের জন্যে থামলো। জায়গাটা উঁচু, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ক্রুডিয়ার জন্যে শুকনো ঘাস কেটে আনলো শন, ব্যাগটাকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করার পরামর্শ দিলো। শোবার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

শনের ডাকেই ঘুম ভাঙলো ক্রুডিয়ার। প্রচণ্ড রাগ হলো তার, এই তো মাত্র ক'মিনিট আগে ঘুমিয়েছে! 'চারটে বাজে,' বললো শন, অবিশ্বাস হওয়ায় নিজের হাতঘড়ি দেখলো সে। আরে তাই তো, এরইমধ্যে পাঁচ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে! ওর হাতে আরো এক কাপ চা ও ভুট্টার তৈরি কেক ধরিয়ে দিলো শন। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নাও।

তাড়াহুড়ো করে স্লিপিং ব্যাগ গুটিয়ে ছোট্ট আয়নাটা বের করলো ক্রুডিয়া। আয়নাটা ফেলে দিয়েছিল শন, ওর চোখকে ফাঁকি দিয়ে কুড়িয়ে রেখেছিল সে। নিজের চেহারা দেখে আঁতকে উঠলো ক্রুডিয়া। ক্যামোফ্লেজ ক্রীম শুকিয়ে গেছে, ঘামের রেখাগুলো ক্রিম গায়ে ফুটে আছে স্পষ্টভাবে। চুল আঁচড়ে মাথায় একটা স্কার্ফ জড়ালো সে।

দিনের বাকি সময় কোনো বিরতি ছাড়া হাঁটলো ওরা। ক্রুডিয়া ভাবলো, রাতে বোধহয় ঘুমানোর সুযোগ হবে। কিন্তু শনের নির্দেশে সারাটা রাতই হাঁটতে হলো ওদেরকে, দু'ঘন্টা পরপর একবার করে বিশ্রাম, তা-ও অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। সকালে চা খেলো ওরা। এমনতে কফির ভক্ত ক্রুডিয়া, কিন্তু লক্ষ্য করেছে চা খেলে ক্লাস্তি দূর হয়ে যায় দ্রুত।

চা খেতে থামলেও এখানে বিশ্রাম নেয়ার কোনো ইচ্ছে শনের মধ্যে দেখা গেলো না। ক্রুডিয়ার ইচ্ছে হলো শুয়ে পড়ে, আর এক পা হাঁটারও শক্তি নেই তার। এই সময়ে শনকে বলতে শুনলো, 'প্লেন থেকে তুকুটেলাকে যেখানে আমরা দেখেছিলাম, ওখানে পৌঁছে ঘুমোবার জন্যে থাকবো না। তবে, আমাদের কারো কারো চোহারা দেখে মনে হচ্ছে...'। কথটা শেষ করলো না শন, একবার শুধু ক্রুডিয়ার দিকে তাকালো।

'নাস্তার পর আরেকটু হাঁটতে পারলে খুশি হই,' মুখে হাসি টেনে বললো ক্রুডিয়া, মনে মনে গাল দিলো শনকে, বাস্টার্ড! তুমি ভেবেছো হার মানবো আমি?

ক্রুডিয়ার দিকে আরেকবার তাকিয়ে আগুনের ধারে ফিরে গেলো শন। মগে চুমুক দিয়ে মেয়ের দিকে একবার তাকালেন ক্যাপো, বললেন, 'ওর খপ্পরে পড়ো না, মাই ট্রেজার। অন্য কোনো মেয়ে তো ছার, এমনকি তুমিও ওকে সামলাতে পারবে না।'

বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলো ক্রুডিয়া, রাগে দিশেহারা বোধ করছে, হতভম্ব। ওর খপ্পরে পড়বো? তোমার কি মাথা খারাপ হলো বাবা? ওকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না!'

'ঠিক সেটাই আমি বোঝাতে চাইছি,' মৃদু শব্দে হাসলেন ক্যাপো।

লাফ দিয়ে সোজা হলো ক্লডিয়া, অকারণ ব্যস্ততার সাথে ব্যাগটা পিঠে ঝোলালো, তারপর তীক্ষ্ণ ও চাপা গলায় বললো, ‘শুধু শুকে নয়, ওর মতো আরো পাঁচজনকে সামলাতে পারি আমি- চোখ বন্ধ করে, একটা হাত পিঠের সাথে বাঁধা থাকলেও। কিন্তু আমার রুচি আরো অনেক উন্নত।’

‘তোমার জন্যে সেটা শুভ লক্ষণ,’ এতো নিচু গলায় বললেন ক্যাপো, ঠিক কি বলেছেন বুঝতে পারলো না ক্লডিয়া।

সেদিন দুপুরের খানিক পর পথ দেখিয়ে ওদেরকে একটা ঘাসবনে নিয়ে এলো মাতাউ, জলমগ্ন বিলের চারধারে মাথা উঁচু করে আছে। এই বিলটাই আকাশ থেকে দেখেছিল ওরা। তুকুটেলার রেখে যাওয়া পায়ের ছাপ দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো গোটা দল। ‘দেখেছেন?’ মাতাউ বললো ‘প্লেনের আওয়াজ শুনে এখানে দাঁড়িয়ে পড়ছিল তুকুটেলা।’ আরো কয়েকটা ছাপ দেখালো সে। ‘এখানে আর এখানে পা ফেলে ঘুরেছে সে, ওপর দিকে তাকাবার জন্যে।’ তুকুটেলার অনুকরণে জায়গা বদল করলো সে, ঘাড় বাঁকা করে আকাশের দিকে তাকালো, পিঠটা কুঁজো হয়ে আছে, দু’পাশে হাত তুলে বোঝাতে চাইছে ওগুলো হাতির কান। ক্লান্ত হলেও, তার ভঙ্গি দেখে হেসে উঠলো সবাই। সব ভুলে হাতাতালি দিলো ক্লডিয়া।

‘তারপর কি করলো তুকুটেলা?’ জানতে চাইলো শন।

সামনে এগিয়ে যাওয়া ছাপগুলোর দিকে হাত লম্বা করলো মাতাউ। ‘ছুটলো হাতি। ছুটলো তুকুটেলা। গায়ের জোরে। পায়ের জোরে,’ পদ্যের সুরে বলে গেলো সে। ‘অনেক দূরে, বহু দূরে।’

‘আমার হিসেবে বলে,’ ক্যাপোর দিকে তাকালো শন। ‘আটচল্লিশ ঘন্টা পিছিয়ে আছি আমরা। এখন আমরা ঘুমোবো, তারমানে আবার যাত্রা শুরু করার সময় পিছিয়ে থাকবো পঞ্চান্ন ঘন্টা।’

\* \* \*







‘কি হলো?’ ঘাসবনের ভেতর থেকে চিৎকার করলেন ক্যাপো। ‘শন, ঠিক আছে তো? কি ঘটেছে? ক্লডিয়া কোথায়?’

বাবার গলা পেয়ে লাফ দিয়ে শনের কাছ থেকে দূরে সরে গেলো ক্লডিয়া, চেহারা অপরোধী ভাব, এই প্রথম দু’হাত দিয়ে নিজের নগ্নতা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করলো

‘সব ঠিক আছে, ক্যাপো,’ পাল্টা চিৎকার করলো শন। ‘বিপদ কেটে গেছে ক্লডিয়ার।’

ছোঁ দিয়ে প্যান্টিটা তুলে নিয়ে ব্যস্ত হাতে পরতে শুরু করলো ক্লডিয়া, কাদার ওপর এক পায়ে লাফালো কিছুক্ষণ। কাদা থেকে শার্টাও তুললো, পরার সময় পিছন ফিরলো শনের দিকে। আবার যখন ওর দিকে ঘুরলো সে, রাগটা নতুন করে ফিরে এসেছে চেহারায়ে।

‘হঠাৎ ভয় পেয়েছিলাম,’ শনকে জানালো সে। ‘আসলে ঠিক ওভাবে জড়িয়ে ধরতে চাইনি। ব্যাপারটাকে খুব বড় করে দেখে না, বা অন্য কোনো অর্থে নিয়ে না।’

‘ঠিক আছে, ডাকি, পরের বার হামলা হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবো আমি। হামলাটা কুমীর করুক বা সিংহ, কি এসে যায়।’

‘তোমার কোনো অভিযোগ থাকার কথা নয়,’ জলহস্তীদের পথ ধরে হাঁটা ধরলো ক্লডিয়া, কাঁধের ওপর দিয়ে শনের দিকে তাকালো। ‘দু’চোখ ভরে দেখে নিয়েছো-আমি লক্ষ্য করেছি, রীতিমতো গিলছিলে, কর্নেল।’

‘ঠিক বলেছো। দেখিয়েছো তুমি ভালোই, অস্বীকার করবো না। মন্দ নয়, একটু হয়তো রোগা, তবে মন্দ নয়।’ নিঃশব্দ হাসিটা চওড়া হলো শনের, ক্লডিয়ার ঘাড়ের পিছনটা রাগে লালচে হয়ে উঠতে দেখলো ও।

পথ ধরে ছুটে এলেন ক্যাপো, উদ্বেগে কালো হয়ে গেছে চেহারা। মেয়েকে ধরলেন তিনি, তার কিছু হয়নি দেখে আনন্দে আলিঙ্গন করলেন। ‘কি হয়েছে, মাই ট্রেজার? তুমি ভালো আছো তো?’

‘আপনার আদরের মেয়ে কুমীরের খোরাক হতে চেয়েছিল,’ বললো শন। ‘ঠিক ত্রিশ সেকেন্ড পর রওনা হচ্ছি আমরা। গুলির শব্দটা দশ মাইলের মধ্যে সবাই শুনতে পেয়েছে।’

\* \* \*







বুট পরেই গুয়েছিল ওরা, তৈরি হতে দু'মিনিটের বেশি লাগলো না। 'মাতাউ আপনাদের সরিয়ে নিয়ে যাবে,' ব্যাখ্যা করলো শন। আমি আর জোব একটা ফলস ট্রেইল তৈরি করবো, লোকগুলো যাতে ওটা ধরেই এগোয়। তারপর, ভোরের আলো ফুটলেই, আরেক পথ ধরে ফিরে আসবো আপনাদের কাছে।'

ক্যাপো কিছু বলার আগে আঁতকে উঠলো ক্লডিয়া। 'আমাদের তুমি একা ফেলে যাচ্ছে?'

'একা কোথায়? তোমাদের সাথে মাতাউ, পিউমুলা আর ডেডান থাকছে।

'কিন্তু আমার তুকুটোলা?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইলেন ক্যাপো। 'আপনি কি শিকার অভিযান বাতিল করে দিচ্ছেন, শন?'

'কয়েকজন লোক আর কয়েকটা একে রাইফেলের ভয়ে?' হেসে উঠলো শন। 'চিন্তা করবেন না, ক্যাপো। ওদেরকে ঠিকই খসিয়ে দেবো আমরা। তারপর আবার পিছু নেবো তুকুটোলার।'

\* \* \*



নিলো। আগের ছাপগুলোয় পা রেখে পাথুরে ঢালে ফিরে এলো ও তারপর জোবের নতো একই কায়দায় একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়লো, মাটি ছেড়ে উঠে পড়লো শূন্যে।

পঞ্চাশ গজ দূরে, একটা পাথরের ওপর নামলো শন। উত্তর দিকে রওনা হয়ে গেলো ও, আন্টি-ট্র্যাকিং পদ্ধতির সাহায্য নিতে ভুললো না। এমনকি মাতাউও ওর হ'প খুঁজে বের করতে পারবে না, মস্তষ্টিচিও ভাবলো ও।

দু'ঘন্টা পর জোবের সাথে দেখা হলো ওর, এখানেই তার অপেক্ষা করার কথা ছিলো দুপুরের খানিক পর দলের দ্বিতীয় অংশের সাথে মিলিত হলো ওরা, যেখান থেকে দু'ভাগ হয়েছিল তার পাঁচ মাইল উত্তরে।

‘আপনাকে দেখে ভালো লাগছে, শন। আমরা চিন্তা করছিলাম,’ করমর্দনের সময় বললেন ক্যাপো। এমনকি ক্রুডিয়ার সামান্য হাসলো, তার পাশে ধপাস করে শনকে বসতে দেখে।

‘এক মগ চা পেলে রাজ্য হারাতেও রাজি আছি।’

ধুমায়িত চা-র মগে চুমুক দিচ্ছে শন, ওর পাশে বসে খুদে ট্র্যাকার মাতাউ কিচিরমিচির শব্দ করছে অনবরত।

‘আমাদের ফেলে আসা পিছনের ক্যাম্পটা। দেখতে গিয়েছিল মাতাউ,’ ক্যাপো আর ক্রুডিয়ার উদ্দেশ্যে ভাষান্তর করলো শন। ‘সাহস করে খুব একটা কাছে যায়নি, তবে আড়াল থেকে লোকগুলোকে ক্যাম্পে পৌঁছুতে দেখেছে সে। এবার মাথা গোণার সুযোগ পেয়েছে-বারোজন। ক্যাম্পের চারধারে তল্লাশি চালায় তারা, তারপর টোপ গেলে অর্থাৎ আমাদের তৈরি ফলস ট্রেইল ধরে রওনা হয়।’

‘আমরা তাহলে এখন ঝামেলা মুক্ত?’ জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপো।

‘তাই মনে হচ্ছে। জোর কদমে হাঁটতে পারলে জলার কিনারায় পৌঁছে যাবো আজ সন্ধ্যা থেকে কাল ভোরের মধ্যে।’

‘তুকুটেলার কথা বলুন, শন,’ তাগাদা দিলেন ক্যাপো।

‘তার ছাপ দেখে আন্দাজ করা যায় ঠিক কোনো দিকে থেকে জলায় নামবে সে। আমরা কিনারা ধরে এগোবো, যতক্ষণ না তার ছাপ পাই। তবে, অনেক পিছিয়ে পড়েছি আমরা। তাকে হারিয়ে ফেলতে না চাইলে খুব দ্রুত এগোতে হবে আমাদের। আপনি কি পারবেন ক্যাপো?’

‘সম্পূর্ণ সুস্থ আমি,’ ক্যাপো বললেন। ‘পথ দেখান, শন।’

রওনা হবার আগে অবশিষ্ট বোঝা নতুন করে বিলি-বন্টন করলো শন। ক্যাপোর কাছ থেকে বিশ পাউণ্ড চেয়ে নেয়া হলো, সেটা বহন করবে শন নিজে। দশ পাউণ্ড নেয়া হলো ক্রুডিয়ার কাছ থেকে বহন করবে জোব। বোঝা হালকা হওয়ায় বাপ-বেটি দু'জনেই আগের চেয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারলো। ক্রুডিয়াকে নিয়ে শনের অবশ্য কোনো দৃষ্টিভ্রান্ত নেই, ওকে বিস্মিত করে দিয়ে এখনো চঞ্চল হরিণীর

মতো পা ফেলছে সে, চেহায়ায় তাজা ভাব আগের মতোই অস্মান। এবারও ক্যাপোর পাশে থাকলো শন, মজার মজার গল্প বলে পথ চলার কষ্ট ভুলিয়ে দিতে চাইছে।

খোলা উপত্যকায় পৌঁছুলো ওরা। ওদের সামনে, অনেক দূরে, আকাশের গায়ে স্থির হয়ে থাকা অচল বাষ্প দেখে জলাভূমির আভাস পেলো শন। গায়ের নিচে মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি, পায়ের চাপে ডেবে যাচ্ছে।

‘চিন্তা করে দেখুন, ক্যাপো,’ পথের কষ্ট ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যে কথা ঘোরায়ে শন। ‘আপনি সম্ভবত শেষ ব্যক্তি যিনি চিরন্তন পন্থায় ধাওয়া করে হাতি শিকার করছেন, ল্যান্ড রোভারের জানালা দিয়ে গুলি করে নয়। ঠিক কারামোজো বেল কিংবা সামকি স্যামনের মতো!’

কিংবা, ‘একজন সেরা শিকারী নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে হাতি শিকার করবে।’

কিন্তু যতোই মজার গল্প বলুক শন, এক ঘন্টার মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ক্যাপো, পদক্ষেপ এলোমেলা হয়ে গেলো। একবার হাঁচট খেলেন তিনি, শন ধরে না ফেললে আছাড় খেতেন।

‘পাঁচ মিনিট বিশ্রাম দরকার, দরকার গরম চা,’ ক্যাপোর হাত ধরে ছায়ায় নিয়ে এলো শন।

মগ ভর্তি চা নিয়ে এলো জোব, শনের, দিকে ফিরে জানতে চাইলেন ক্যাপো, ‘আরো দুটো ট্যাবলেট হবে, শন?’

‘ঠিক আছেন তো, ক্যাপো,’ ট্যাবলেটগুলো দিয়ে জানতে চাইলো শন।

‘মাথার সেই ব্যথাটা, অন্য কিছু নয়।’ কিন্তু শনের চোখের দিকে তাকালেন না ক্যাপো।

ক্লডিয়া’র দিকে তাকালো শন, বাবার পাশেই বসে আছে সে। কিন্তু ক্লডিয়া’র এড়িয়ে গেলো শনের দৃষ্টি।

‘তোমরা দু’জন জানো, অথচ আমি জানি না, এমন কিছু আছে নাকি?’ শনের গলায় সন্দেহ। তোমাদের দু’জনকেই চোরের মতো লাগছে কেন?’ উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে দাঁড়ালো শন, আগুনের দিকে হেঁটে গিয়ে জোবের পাশে বসলো। ভুট্টার ময়দা দিয়ে কেক তৈরি করছে জোব, রাতে খাবে সবাই।

‘অ্যাসপিরিন কাজ শুরু করলে ভালো লাগবে তোমার,’ বাবাকে নরম সুয়ে বললো ক্লডিয়া।

‘কোনো সন্দেহ নেই। ক্যানসার ব্রেনে পৌঁছুলে অ্যাসপিরিনই তো মহৌষধ,’ শান্তকণ্ঠে বলার পর ক্লডিয়া’র চেহায়ায় নীল বেদনা ফুটে উঠতে দেখলেন ক্যাপো, তারপর ঝাঁঝের সাথে তিরস্কার করলেন নিজেকে। ‘দুঃখিত। এভাবে কেন বললাম জানি না। নিজেকে করুণা করা আমার স্বভাব নয়।’

‘অতিরিক্ত পরিশ্রম,’ বললো ক্লডিয়া, বাবার প্রতি মায়ায় গলা বুজে আসছে তার। ‘সম্ভবত সেটাই জাগিয়ে তুলেছে ওটাকে। আমাদের ফেরা উচিত, বাবা।’

‘না,’ দৃঢ় কর্তে বললেন ক্যাপো, বলার সুরটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসূচক। ‘এ-প্রসঙ্গে আর কোনো কথা হবে না,’ সম্মতি দিয়ে মাথা ঝাঁকালো ক্লডিয়া।

‘জলাটা আর বেশি দূরে নয়। আমরা হয়তো বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পাবে,’ বললো ক্লডিয়া।

‘বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছে নেই আমার,’ বললেন ক্যাপো। ‘সময় যে আর বেশি নেই, বুঝতে পারছি। যতটুকু আছে তার এক কণাও নষ্ট করতে চাই না।’

ওদের কাছে ফিরে এলো শন। ‘ক্যাপো, আপনি তৈরি? নাকি আরেকটু বিশ্রাম দরকার?’

ঘড়ি দেখলো ক্লডিয়া। এরই মধ্যে আধঘণ্টা পেরিয়ে গেছে! তবু আপত্তি করতো ও কিন্তু ক্যাপো বললেন, কিসের বিশ্রাম! ক্লডিয়া লক্ষ্য করলো, বিশ্রাম মাত্র আধ ঘণ্টা হলেও বাবার চেহারায় রক্ত ফিরে এসেছে।

রওনা হবার কয়েক মিনিট পর খুশি খুশি গলায় ক্যাপো বললেন, ‘জোব যে হ্যামবার্গার তৈরি করলো, গন্ধটা সত্যি দারুণ। ঝিদেটা চাগিয়ে উঠছে।’

‘হ্যামবার্গার মানে ভুট্টার, কেক,’ হেসে ফেললো শন। ‘আপনাকে হতাশ করার জন্যে দুঃখিত, ক্যাপো।’

‘আমাকে বোকা বানাতে পারবে না,’ শনের সাথে ক্যাপোও হাসলেন। ‘গরুর মাংস আর পেঁয়াজের গন্ধ আমি চিনি।’

‘বাবা!’ কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকালো ক্লডিয়া, ভুরু কঁচকালো। হাসি থামিয়ে মনমরা হয়ে গেলেন ক্যাপো।

‘দৃষ্টি ও মস্তিষ্ক দেখা দিতে পারে,’ ক্লডিয়াকে সাবধান করে দিয়েছেন ডা. অ্যান্ড্রুজ। ‘বিভিন্ন গন্ধ কল্পনা করবেন, চোখের সামনে একটা জিনিস নেই অথচ দেখতে পাবেন।’ রোগটা ঠিক কিভাবে বাড়বে সে-সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা দিতে পারেননি তিনি, তবে বলেছেন যে মাঝে মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকবেন ক্যাপো, তারপর আবার লক্ষণগুলো দেখা দেবে।

সন্ধ্যায় থামলো না ওরা, ফলে চা-ও ঝাণ্ডা হলো না, হাঁটতে হাঁটতেই কেক আর পানি খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো সবাইকে। বেশ ঝানিকটা সময় নষ্ট হয়েছে, সেটা পুথিয়ে নিতে চাইছে শন। ‘বিরাট একটা হ্যামবার্গার, সাথে গ্লাসভর্তি হুইস্কি আসছে, ক্যাপো,’ ঠাট্টা করলো ও! ওর দিকে কটমট করে তাকালো ক্লডিয়া, তবে মুখভর্তি কেক নিয়ে হেসে উঠলেন ক্যাপো।

ওরা কোনো ছাপ অনুসরণ করছে না, কাছেই রাত নামার পরও অনেকক্ষন ধরে হাঁটলো শন। দীর্ঘ, কষ্টকর মাইলগুলো পিছনে ফেলে এলো ওরা, দক্ষিণ আকাশের তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে ওদের মাথার ওপর। প্রায় মাঝরাতের দিকে

থামলো দলটা, গুটানো স্লীপিং-ব্যাগ খুলে ভেতররে ঢুকে পড়লো সবাই, কোনো কথা হলো না।

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে সবার ঘুম ভাঙলো শন। চারদিকের দৃশ্য বদলে গেছে। রাতের অন্ধকারে দেখতে পায়নি ওরা, তবে ভোরের আলোয় গোটা এলাকার ওপর বিশাল জাম্বোজি নদীর প্রভাব সহজেই চোখে পড়লো। বর্ষা মওসুমে দু-কূল ছাপিয়ে প্রবাহিত হয় নদীটা, আশপাশের সমস্ত নিচু এলাকা ডুবে যায়। এখন শুকনো বটে, তবে প্রায় গাছপালা শূন্য। মরা কয়েকটা মোপের ও কাঁটাবহুল অ্যাকেশিয়া গাছ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু। হাঁটার সময় শুকনো কাদা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। এখনো চোখের আড়ালে, তবে বাতাসে জলাভূমির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পচা লতাপাতা আর কাদার গন্ধ।

খোলা প্রান্তরে কোনো আড়াল নেই, মনে মনে শঙ্কিত হলো শন। ফেলিমোদের পেট্রোল প্লেন রেনামো গেরিলাদের ঝোঁজে আসতে পারে এদিকে। তাহলে আর রক্ষে নেই। হাঁটার গতি বাড়াতে চাইলো ও, কিন্তু ক্যাপোর দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারলো বিশ্রামের জন্য আবার ওদেরকে থামতে হবে।

সামনে থেকে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন ক্যাপো।

তাঁর দিকে ফিরে হাসলো শন। ‘সে-ই, আমাদের তুকুটেলা! ছাপটা যেখানে থাকবে বলেছিল মাতাউ, ঠিক সেখানেই পাওয়া গেলো।’ ছাপের চারধারে হাঁটাইটি করলো ও, এতোই পরিষ্কার ওগুলো যে সামনের ও পিছনের পায়ের ছাপ আলাদাভাবে চিনতে পারা যাচ্ছে, পিছনের চাপগুলো আরো বেশি গোলা। ‘সোজা জলার দিকে যাচ্ছে সে।’ কপালে হাত তুলে দূরে তাকালো শন। পেন্সিল দিয়ে দাগ টানার মতো একটা রেখা দেখা যাচ্ছে দূরে, দিগন্তরেখার কাছে এক সারিতে অনেকগুলো গাছ। ওখানে বাঁকা আঙুলের মতো আরেকটা কি যেনো রয়েছে-উঁচু জমি, খোলা প্রান্তরের দিকে বেরিয়ে আছে বেশ খানিকটা।

‘কতো পিছিয়ে আছি আমরা?’ জানতে চাইলেন ক্যাপো।

‘ভাগ্য ভালো যে তুকুটেলার পায়ের ছাপ সোজা ওই গাছগুলোর দিকে এগিয়েছে,’ বললো শন। ‘খানিকটা হলেও আড়াল পাওয়া যাবে,’ ছাপ ধরে এগোবার জন্যে মাতাউকে নির্দেশ দিলো ও। ‘আর খুব বেশি দূরে নয়।’

খোলা প্রান্তরে এবার পিপড়ের ঢিবি দেখা যাচ্ছে, একেকটা ছোটোখাটো পাহাড়ের মতো উঁচু। ঢিবিগুলোকে পাশ কাটিয়ে একেবঁকে এগিয়েছে ছাপ। খানিকক্ষণ পর গাছগুলোকে আলাদাভাবে চেনা গেলো। তারপর জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়লো ওরা। এখানে একবার থেমেছে তুকুটেলা, মল ত্যাগ করেছে, ছোটো কয়েকটা গাছ শিকড় সহ উপড়ে খাওয়াদাওয়া করেছে। ‘বুড়োটা বিশ্রাম নিয়েছে এখানে,’ বিড়বিড় করলো মাতাউ। ‘বয়স হয়েছে, একটুতেই হাঁপিয়ে যায়।’

দেখছেন না, বারবার পা তুলেছে সে? তারমানে এখানে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়েছে সে।  
তরপর, ঘুম থেকে জেগে, ধুলো মেখেছে গায়ে।’

‘কতোক্ষণ ছিলো এখানে সে?’ জানতে চাইলো শন।

জবাব দেয়ার আগে মাথাটা এক দিকে কাত করলো মাতাউ। ‘কাল বিকেল পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়েছে এখানে, সূর্যটা তখন ওখানে ছিলো,’ বলে পশ্চিম দিগন্তের শানিকটা ওর দিকে আঙুল তাক করলো সে। ‘কিন্তু আবার যখন হাঁটা ধরলো, খুব দীর গতিতে এগোলো। জলার কাছে পৌঁছে নিরাপদ বোধ করেছে তুকুটেলা।’

রিকার্ডোকে উৎসাহ দেয়ার জন্যে মাতাউর হিসাবের ওপর রঙ চড়ালো শন। ‘তুকুটেলা আমাদের নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। সে জলাতীরে চলে যাবার আগেই আমরা তাকে ধরতে পারবো বলে আশা করছি। যদি কোনো কারণে সময় নষ্ট না হয়।’

গাছপালার ভেতর দিয়ে হন হন করে এগোলো মাতাউ। রিকার্ডো ছেড়ে তার পিছু নিলো শন, হাঁটার গতি কমাতে বলবে তাকে। এই সময় হঠাৎ পিছন থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো। চরকির মতো আধপাক ঘুরলো শন।

ফুলে উঠেছে ক্যাপোর মুখ, টকটকে লাল। জ্বলন্ত চোখজোড়া যেনো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। প্রথম যে চিন্তাটা এলো শনের মাথায়, ভদ্রলোক প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু না, উন্মত্তের মতো সামনের দিকটা হাত তুলে দেখাচ্ছেন তিনি, অসম্বব উদ্বেজনায়া লম্বা করা হাতটা কাঁপছে তাঁর। ‘ওই যে!’ কর্কশ, বেসুরো গলায় বললেন তিনি। ‘ফর গডস সেক, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?’

আবার ঘুরলো শন, ক্যাপোর হাত অনুসরণ করে তাকালো। ‘কি দেখতে পাবো?’

সামনের দিকে তাকিয়ে আছে শন, কাজেই ক্যাপোর কাণ্ড ওর চোখে পড়লো না। ছোঁ দিয়ে পিউমুলার কাঁধ থেকে রিগবিটা তুলে নিলেন তিনি। চেম্বারে কার্টিজ ভরছেন, ধাতব শব্দটা শুনতে পেলো শন।

‘ক্যাপো, কি করছেন আপনি?’ কয়েক পা এগিয়ে তাকে বাধা দিতে গেলো শন, কিন্তু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন ক্যাপো। তৈরি ছিলো না শন, পড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে ভাল সামলালো।

সবাইকে ছাড়িয়ে ছুটে গেলেন ক্যাপো, দাঁড়ালেন, রাইফেল তুললেন কাঁধে লক্ষ্যস্থির করছেন।

‘ক্যাপো, না!’ ছুটলো শন, কিন্তু ক্যাপোর নাগাল পাবার আগেই গর্জে উঠলো রিগবি। ওপর দিকে লাফ দিলো ব্যারেল, একপা পিছিয়ে এলেন ক্যাপো। ‘আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?’ শন পৌঁছবার আগে দ্বিতীয় গুলিটাও হয়ে গেলো। বিশাল একটা বেইওব্যাব গাছের কাণ্ড থেকে ভিজে সাদা ছাল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে

পড়লো চারদিকে। প্রান্তরের ওপর দিয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো গুলির আওয়াজ।

‘ক্যাপো!’ ছুটে গিয়ে রাইফেলটা আঁকড়ে ধরলো শন, গায়ের জোরে মাজলটা আকাশের দিকে তুললো, কিন্তু তৃতীয় বারও ট্রিগার টেনে দিয়েছেন তিনি।

ধস্তাধস্তি করে রাইফেলটা কেড়ে নিলো শন। ‘আশ্চর্য!’ সত্যি আপনি পাগল হয়ে গেছেন? একি কাণ্ড করলেন!’

গুলির শব্দে সবারই কানে তাল লেগে গেছে, শনের চিৎকার অস্পষ্ট শোনালো।

‘তুকুটেলা,’ মুখ নাড়লেন ক্যাপো। ‘আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আপনি আমাকে বাধা দিলেন কেন?’ তাঁর মুখ এখনো টকটকে লাল, ম্যালেরিয়ার রোগীর মতো থরথর করে কাঁপছেন। রাইফেলটা নেয়ার জন্যে আবার তিনি হাত বাড়ালেন, পিছিয়ে তাঁর নাগালের বাইরে সরে এলো শন।

‘নিজেকে সামলান, ক্যাপো,’ রাগে চিৎকার করলো শন, রিগবিটা ছুঁড়ে দিলো জোবের দিকে। ‘উনি যেনো ছুঁতে না পারেন,’ ক্যাপোর দিকে ফিরলো আবার। ‘ঠিক করে বলুন তো, ঘটনাটা কি?’ এগিয়ে এসে ক্যাপোর কাঁধ ধরলো। ‘গুলির শব্দ কয়েক মাইল পর্যন্ত শোনা যাবে।’

‘ছাড়ুন, আমাকে!’ ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলেন ক্যাপো। ‘তুকুটেলাকে আপনি দেখতে পাননি, বলতে চান?’

তাঁর কাঁধ ধরে ঝাঁকালো শন। ‘নির্ধাৎ পাগল হয়ে গেছেন আপনি! ওটা তো একটা গাছ!’

‘রাইফেলটা দিন আমাকে!’ আবেদন জানালেন ক্যাপো।

তাঁকে ধরে সজোরে গাছটার দিকে ঘোরালো শন। ‘ভালো করে দেখুন। কোথায় তুকুটেলা?’ ধাক্কা দিয়ে কয়েক পা সামনে ঠেলে দিলো। ‘কি দেখছেন?’

ছুটে এলো ক্লুডিয়া, বাধা দিলো শনকে। ‘ছেড়ে দাও ওকে! দেখছো না বাবা অসুস্থ?’

‘আসলেও পাগল হয়ে গেছেন!’ হাত দিয়ে ক্লুডিয়াকে ঠেকালো শন। ‘পনেরো মাইলের মধ্যে যতো ফ্রেলিমো আর রেনামো গেরিলা আছে সবাইকে উনি ডেকে পাঠিয়েছেন! একজনও আমরা বাঁচবো না...।’

‘ছাড়ো ওকে,’ বাবাকে উদ্ধার করার জন্যে আবার সামনে বাড়লো ক্লুডিয়া। এবার রিকার্ডোকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এলো শন।

‘ঠিক আছে, ডাকি, তোমার জিম্মায় তুলে দিলাম ওঁকে।’

ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরলো ক্লুডিয়া। ‘সব ঠিক আছে, বাবা! সব আবার ঠিক হয়ে যাবে!’

গাছটার দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপো, ছাল ওঠা গা থেকে রস গড়িয়ে নামছে। ‘আমি ভাবলাম ওটা...,’ দুর্বলভাবে মাথা নাড়লেন তিনি। ‘কেন করলাম কাজটা? আমি আসলে...কিন্তু দেখে তখন মনে হচ্ছিলো ওটা তুকুটেলা...!’

‘জানি, বাবা, জানি! বাবাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ক্লডিয়া। ‘শান্ত করো নিজেকে, অস্থির হয়ো না। প্লিজ, বাবা!’

জোব ও হান্টিং টিমের বাকি সবাই চূপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, মন ভালো নেই কারো। অদ্ভুত নাটকটা চোখ বড় বড় করে দেখছে বটে, কিন্তু অর্থ বুজে পাচ্ছে না। রাগে মুখ ফিরিয়ে নিলো শন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেলো। তারপর মাতাউর দিকে ফিরলো ও। ‘তোমার কি মনে হয়, তুকুটেলা এতো কাছে আছে যে গুলির শব্দ শুনতে পাবে?’

‘জলাটা কাছেই,’ বললো মাতাউ। ‘খোলা মাঠ, আওয়াজটাও বাধা পায়নি। বলা কঠিন, শুনতেও পারে।’

‘জোব, লোকগুলো কি শুনতে পেয়েছে?’

‘নির্ভর করে আমাদের কতোটা পিছনে রয়েছে ওরা। সময় হলে জানা যাবে, বাওয়ানা।’

‘এখানে বিশ্রাম নেবো আমরা। ক্যাপো অসুস্থ বোধ করছেন। চা চড়াও, কি করা হবে পরে ঠিক করবো।’

ফিরে এলো শন, ক্লডিয়া এখনো তার বাবাকে দু’হাতে জড়িয়ে আছে।

‘আপনাকে ধাক্কা দেয়ার জন্যে দুঃখিত, ক্যাপো,’ শান্তভাবে বললো শন। ‘আপনি আমাকে সাংঘাতিক ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।’

‘আমি বুঝিনি,’ বিভ্রিড় করলেন ক্যাপো। ‘কিরে খেয়ে বলতে পারতাম ওটা তুকুটেলাই ছিলো। এতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম..।’

‘রোদটাই বোধহয় দায়ী,’ বললো শন। ‘প্রচণ্ড গরমে মানুষের মাথা ঠিকমতো কাজ করে না,’ ক্লডিয়ার দিকে তাকালো ও। ‘চলো, তোমার বাবাকে ছায়ায় নিয়ে গিয়ে বসাই।’

বেগুন্যাব গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন ক্যাপো। স্নান হয়ে গেছে চেহারা, বিস্ময়ের ভাবটা এখনো স্পষ্ট ফুটে আছে। চোখ বুজলেন তিনি। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা যাচ্ছে ঠোঁটের ওপর, চিবুকের বাঁজে। ক্লডিয়ার দিকে ফিরে পিছু নেয়ার ইঙ্গিত দিলো শন।

‘বাবার আচরণ একটুও অবাক করেনি তোমাকে, করেছে কি?’ ক্যাপোর কাছ থেকে দূরে সরে এসে অভিযোগ করলো শন। ক্লডিয়া কোনো কথা বলছে না দেখে আবার বললো, ‘কি রকম মেয়ে তুমি, শনি? তুমি জানো উনি অসুস্থ, তারপরও এ-ধরনের একটা অভিযানে আসতে দিয়ে?’















‘এ আমি নিতে পারি না, মাই ট্রেজার,’ বিড়বিড় করে বলরেন ক্যাপো। কর্কশ শোনালো তাঁর গলা, মনের ভাব গোপন করার জন্যে মাথাটা নিচু করে রাখলেন।

‘বাবাকে যেতে বাধ্য করো না, শন,’ জেদ করলো ক্লডিয়া। ‘বলো জোব আমার পাহারায় থাকবে। সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবো আমি ওর কাছে।’

‘ক্যাপো, আরেকবার চিন্তা করে দেখবেন? জিজ্ঞেস করলো শন। ‘তবে, সিদ্ধান্তটা আপনাদের, আমার তরফ থেকে কিছু বলার নেই’

‘শন, আমরা একা কথা বলতে পারি?’ জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া, উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বাবার দিকে ফিরলো সে। ‘আমার পাশে এসে বসো, বাবা,’ পাশের মাটিতে হাত চাপড়ালো সে। দাঁড়ালো শন, হেঁটে চলে গেলো আরেকদিকে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

এক ঘন্টা কেটে গেলো। জোবের সাথে বসে আছে শন। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। এমন সময় ওদের দিকে এগিয়ে এলেন রিকোর্ডো ‘ঠিক আছে, শন,’ বললেন তিনি। ক্লডিয়ার জেদই টিকলো। কাল সকালে তাহলে রওনা হবো আমরা, কেমন? আর জোব, আমার মেয়ের ওর খেয়াল রাখবে তো?’

‘অবশ্যই রাখবো, সাহেব,’ শনের পাশ থেকে উঠলে দাঁড়ালো জোব। ‘আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, বাওয়ানা। ফিরে এসে দেখবেন ডোন্ না বহাল তবিয়েতে আছেন।’

\* \* \*

\*



জিনিস-পত্র কমই হলে কি হবে, চারজনকে ঠাই দেয়ার পর ডিঙিতে আর এক ইঞ্চি জায়গাও অবশিষ্ট নেই হঠাৎ- কেউ নড়লেই কলকল করে পানি উঠছে। পানির স্বেচ্ছা সার্বক্ষণিক একটা চাকরি হয়ে দাঁড়ালো।

নলখাগড়ার মাথার ওপর সূর্য উঠলো, তবে কুয়াশায় ঢাকা। ওয়াটার লিলি পাপড়ি মেললো, সূর্যের দিকে মুখ করে। দু'বার কুমির দেখতে পেলো ওরা। পানির ওপর শুধু নাক তুলে শুয়ে আছে, আকারে বিরাট। ডিঙিটাকে আসতে দেখে পানির তলায় ডুব দিলো।

বেলা যতো বাড়লো, পান্না দিয়ে বাড়লো তাপ, দরদর করে ঘামতে শুরু করলো ওরা। কোথাও কোথাও পানি মাত্র কয়েক ইঞ্চি গভীর, কাদায় নেমে ডিঙিটাকে ঠেলতে হলো, যতোক্ষণ না আরেকটা লেগুন বা গভীর স্রোত পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেলো কাদায়। কোথাও কোথাও পানির ওপর জেগে আছে কাদা, সে-সব জায়গায় বিশাল পায়ের ছাপ রেখে গেছে তুকুটেলা। -

সারাদিন ডিঙি নিয়ে এগোবার পর রাত নামলো আবার। ডিঙিতে একজন মাত্র লম্বা হতে পারবে। রাতে ঘুমোবার সুযোগ পেলেন একা শুধু ক্যাপো, বাকি সবাই কোমর পর্যন্ত কাদায় ডুবে বসে থাকলো, ডিঙির গায়ে হেলান দিয়ে, বিশ্রাম পেলো ততোটুকুই মশার কালো মেঘ যতোটুকু সদয় হলো ওদের ওপর।

ভোরে কাদা থেকে ওঠার পর শন দেখলো, ওর খালি পা জোঁকে ঢাকা পড়ে গেছে, রক্ত চুষে ঢোল হয়ে আছে একেকটা। কোনো কোনোটি উপরে উঠে কামড়ে ধরে ঝুলছে ওর অভ্যর্থনা থেকে। ধীরে ধীরে কেটে ফেললো শন ওগুলোর মাথা।

‘হেই শন, এই প্রথম বোধহয় তোমার ওটা চোষার অপরাধে কাউকে দন্ড দিলে!’ হেসে উঠে বললেন রিকার্ডো।

\* \* \*













না, পেটের নিচে কোনো অনুভূতি নেই, এমনকি মাথাতেও নেই কোনো ব্যথা। শুধু সামনেটা অন্ধকার হয়ে আসছে। আলো একেবারে নিভে যাবার আগে শনের মুখটা চোখের সামনে ভাসতে দেখলেন তিনি।

‘ক্যাপো! ক্যাপো!’ যেনো বহুদূর থেকে ভেসে আসছে শনের গলা। কথা বলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন রিকার্ডো মনটেরো।

‘ও তোমাকে ভালোবাসে। আমার মেয়েটাকে দেখো ভূমি, শন!’

কর্নেল রিকার্ডো মনটেরোর এই ছিলো শেষ কথা। পরমুহূর্তে অনন্ত অন্ধকারে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললেন তিনি।

\* \* \*

















































থেকে বেশিক্ষণ বাইরে থাকার উপায় নেই আমার। আলোচনা পরে হবে, আমি কথা দিচ্ছি। আপাতত আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আমার লোকরা আপনার যত্ন নেবে।’

ঘুরলো কমরেড চায়না, আলোর পিছনে হারিয়ে গেলো। তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে হচ্ছে করলো ওর। কমরেড চায়না এমন এক প্রকৃতির লোক যার কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা বোকামি হবে। কোনো রকম দুর্বলতা টের পেলেই সেটার সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করবে সে। ‘মূল দলের সাথে শিগীগর দেখা হবে’, নিজেকে সান্ত্বনা দিলো ও।

‘নিজের চোখেই দেখতে পাবো ক্লডিয়া আর জোব কেমন আছে।’

\* \* \*







সে-ও এবার শনের কৌশল অবলম্বন করলো, এগিয়ে থাকা শনকে ধরে ফেললো। এরপর দু'জনেই পথ ছেড়ে সরাসরি চূড়ার দিকে ছুটলো ওরা।

সার্জেন্টকে তিন ফুট পিছনে রেখে চূড়ায় উঠলো শন, পাথুরে মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো, গড়িয়ে দিলো শরীরটাকে। চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে, ঘন ঘন ওঠানামা করছে বুক। এক মিনিট পর বসলো শন, তাকালো সার্জেন্টের দিকে, চেহারায়ে অনিশ্চিত ভাব।

হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠলো শন। এক সেকেণ্ড ইতস্ততঃ করার পর সার্জেন্টও শুরু করলো। দলের বাকি সবাই এসে দেখলো, দু'জনেই ওরা পাগলের মতো হাসছে।

এক ঘন্টা পর আবার শুরু হলো দৌড়। পথ ছেড়ে বোল্ডার টপকে ছুটছে দলটা, শনকে পাশে নিয়ে। দিক বদলে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা।

শন উপলব্ধি করলো, পরীক্ষায় পাস করেছে ও।

\* \* \*















































‘কুত্তার বাচ্চা, আবার যদি ওর গায়ে হাত তুলিস, টেনে ছিঁড়ে আনবো তোর জিভ’, শাস্তানি ভাষায় হিসহিস করে উঠলো ও। শাস্তানি ট্রুপার হকচকিয়ে গেলো, যতোটা না হুমকি তারচেয়ে ভাষাটা অবাক করেছে তাকে। শনের পাশ থেকে গলা ছেড়ে হেসে উঠলো শাস্তানি সার্জেন্ট।

‘জিভটা বাঁচাতে চাইলে ওর কথা মনে রেখো’, ট্রুপারকে বললো সে। শনের দিকে ফিরে নিঃশব্দে মুচকি হাসলো, বললো, ‘আপনি তাহলে আমাদের ভাষা জানেন তারমানে আমাদের সব কথাই আপনি বুঝতে পেরেছেন! কথা দিচ্ছি, এ-ধরনের ভুল আর করবো না।’

\* \* \*



‘গ্যাংগ্রিন অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা ব্যাপার। তাছাড়া, বন্দীদের আমরা চিকিৎসার সুবিধে দিতে অভ্যস্ত নই। তেমন কিছু যদি ঘটে, আমরা বড়জোর একটা করাত ধার দিতে পারি, হাতটা কেটে ফেলার জন্যে।’

‘ঠিক আছে’, ভারি গলায় বললো শন। ‘আমি কথা দিচ্ছি।’

‘পূর্ণ সহযোগিতা?’

‘হ্যাঁ।’

কমরেড চায়নার নির্দেশে হ্যাণ্ডকাফ খানিকটা ঢিলে করা হলো। তারপর বললো সে, ‘নিয়ে যাও ওকে।’ মহিলা ট্রুপার ও সার্জেন্ট ধরলো তাকে, টেনে হিঁচড়ে দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

‘দাঁড়াও’, চিৎকার করলো শন, কিন্তু ওকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না। দরজার দিকে পা বাড়ালো ও, পিছন থেকে দশাসই শাস্ত্রানি সার্জেন্ট ওর হাত দুটো শক্ত করে ধরে ফেললো।

দরজার বাইরে থেকে ক্লুডিয়া চিৎকার ভেসে এলো, ‘শন! শন!’

‘আমি ভালোবাসি তোমাকে!’ চিৎকার করে বললো শন, হাত দুটো ছাড়বার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে সার্জেন্টের সাথে। ‘চিন্তা করো না, ডার্লিং, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে মুক্ত করার জন্যে যা করার সব আমি করবো।’ কথাগুলো নিজের কানেই ফাঁপা শোনালো। হতাশায় দুর্বল বোধ করলো ও, ঢিল পড়লো পেশীতে।

শনকে ধরা সার্জেন্টের হাত দুটো শিথিল হলো, কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো শন, তারপর জেনারেল চায়নার দিকে তাকালো। ‘ইউ বাস্টার্ড!’

‘দেখতে পাচ্ছি ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করার মতো অবস্থায় নেই আপনি’, বলে হাতঘড়ি দেখলো জেনারেল চায়না। ‘তাছাড়া, রাতও অনেক হয়েছে। আপনাকে শান্ত হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত।’ সার্জেন্টের দিকে ফিরলো সে, শাস্ত্রানি ভাষায় বললো, ‘নিয়ে যাও ওদেরকে’, ইঙ্গিতে শন আর জোবকে দেখালো। ‘খেতে দাও, ওকনো কাপড় দাও, কম্বল আর চাদর দাও। লক্ষ্য রাখবে, রাতটুকু যাতে ভালো করে ঘুমাতে পারে। কাল সকালে নিয়ে আসবে আমার কাছে।’

স্যালুট করলো সার্জেন্ট, ওদেরকে নিয়ে দরজার দিকে এগোলো।

‘ওদেরকে দিয়ে কাজ করাবো আমি’, পিছন থেকে সতর্ক করলো চায়না ‘লক্ষ্য রাখবে, যেনো বহাল তবিয়তে থাকে।’

\* \* \*









আপনাকে আমি আরো একটা মূল্যবান তথ্য দিতে পারি, দেখুন হয়তো যুদ্ধ না করেও মিসাইলগুলো এনে দিতে পারবেন।’

‘কি তথ্য?’

‘বিমানে করে মাঝে মধ্যেই স্টিংগার নিয়ে যাওয়া হয় ওখান থেকে’, বললো জেনারেল চায়না। ‘আগামী সপ্তায়ও কয়েকটা স্টিংগার নিয়ে যাওয়া হবে বলে খবর আছে আমার কাছে। ঠিক সময়মতো যদি পৌঁছতে পারেন, লোড করা একটা প্লেন হাইজ্যাক করা আপনার দ্বারা অসম্ভব বলে আমি মনে করি না।’

‘হিন্দ বা ফাইটার প্লেন ধাওয়া করবে’, বললো জোব।

‘তা করবে,’ একমত হলো কমরেড চায়না, শনের দিকে তাকালো। ‘আপনি একজন দক্ষ পাইলট, আপনার জানা আছে যে হারকিউলিস বিমানের গতি হিন্দের চেয়ে বেশি। ফাইটার প্লেন নয়, আপনারদেকে প্রথমে ধাওয়া করবে হিন্দ, কারণ ফাইটার প্লেনগুলোর অবস্থা খুব সুবিধের নয় ওদের। তাছাড়া, এয়ার বেসটা থেকে রেনামোদের বিরুদ্ধে বেশিরভাগ সময় হিন্দকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। খানিকদূর এসে জঙ্গলে নামবেন আপনারা, পাংশুয়ে নদীর তীরে তারপর ট্রাকে তুলবেন মিসাইলগুলো, গিরিখাদের ভেতর ঢুকে পড়বেন। গিরিখাদ থেকে বেরিয়ে আবার জঙ্গলে ঢুকবেন, পৌঁছে যাবেন রেনামো লাইনে।’ প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করার সময় ম্যাপের সাহায্য নিলো সে।

এরপর ব্রিটিশ মেজরের ইউনিফর্ম ও কাগজ-পত্র দেখতে চাইলো শন।

ইউনিফর্মটা একটু ঢিলে হলেও, গায়ে দেয়ার মতো। কাগজ-পত্রেও কোনো খুঁত পেলো না শন। মেজর ভদ্রলোকের নাম ছিলো গ্যাভিন ডাফি। তিন্ত হাসি ফুটলো শনের ঠোঁটে। ‘এবার, যারা আমার সাথে থাকবে, তাদের দেখতে চাই ওদেরকে আপনার বলে দিতে হবে যে নেতৃত্ব দেবো আমি।’

‘আসুন আমার সাথে, কর্নেল কোর্টনি’, ওদেরকে নিয়ে বাংকার থেকে বেরিয়ে এলো কমরেড চায়না। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আবার ওরা নদীর কিনারায় এসে দাঁড়ালো।

‘সার্জেন্ট আলফনসোর নেতৃত্বে দশজন লোক আছে, কিন্তু বেসে ডাইভারশন্যাল অ্যাটাকের জন্যে আরো বেশি লোক লাগবে আমার’, বললো শন। ‘অন্তত আরো একটা ডিটাচমেন্ট...।’ হঠাৎ চুপ করে গেলো ও, চারদিকে ছুটোছুটি শুরু হয়েছে দেখে।

‘হিন্দ!’ চিৎকার করলো জেনারেল চায়না। ‘টেক কভার!’ গাছপালার ভেতর বালির বস্তা লক্ষ্য করে ছুটলো সে। ওখানে একটা ১২.৭ এমএম অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান রয়েছে, জোড়া ব্যারেল। হিন্দের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হবে ওটা, তাই আরেক দিকে ছুটলো শন, অন্য কোনো আড়াল দরকার ওর।





নিয়ে নদীর তীরে, বাংকার কমপ্লেক্সে চলে এলো শন ও জোব। চল্লিশজন রেনামো, পুরো এক কোম্পানী গেরিলা, প্যারেড থ্রাউও ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। বোঝা গেলো, আগেই ওদেরকে জড়ো হবার নির্দেশ দিয়েছিল জেনারেল চায়না। প্রথম সারিতে সার্জেন্ট আলফনসো ও তার শাস্ত্রানি গেরিলাদের দেখতে পেলো শন। এগিয়ে এসে কমরেড চায়নাকে স্যালুট করলো সার্জেন্ট।

সংক্ষেপে গেরিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলো জেনারেল চায়না। জানালো, বিশেষ একটা অপারেশনে শন কোর্টনির নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে তাদেরকে। গেরিলারা কেউ কোনো কথা বললো, না, ঠাঙা চোখে তাকিয়ে থাকলো শনের দিকে। হাসি দেখা গেলো শুধু শাস্ত্রানি সার্জেন্টের মুখে।

\* \* \*



থেকে টেক-অফ করে ওগুলো। ‘মাতাউ, ওগুলোর আস্তানা খুঁজে বের করতে পারবে তুমি?’ জানতে চাইলো ও।

‘খোজাখুঁজির কাজে মাতাউর জুড়ি নেই।’

‘যাও তাহলে’, নির্দেশ দিলো শন। ‘জায়গাটা বার করো খুঁজে। ওখানে ট্রাক থাকবে, কড়া পাহারা থাকবে। দেখো, ধরা পড়ো না।’

ঘাসবনে সোজা হলো মাতাউ, তার কাঁধে একটা হাত রাখলো শন। ‘জায়গাটা খুঁজে পেলে জেনারেল চায়নার ক্যাম্পে চলে যাবে তুমি, পান্ডুয়ে নদীর কাছে। ওখানে তোমার সাথে আমার দেখা হবে।’

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যান্সারুর মতো লাফ দিলো মাতাউ, হারিয়ে গেলো ঘাসবনের ভেতর। মাতাউ চলে যেতেই ক্লুডিয়ার কথা মনে পড়লো শনের। তার ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। কিন্তু কিছুই করার নেই ওর।

‘আরেকটু ধৈর্য ধরো, ডাকি’, বিড়বিড় করলো শন। ‘আমি অবশ্যই তোমার কাছে ফিরবো — যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।’

\* \* \*



এটাকে কাজে লাগালো ও। সিংগার মিসাইল সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা ছিলো ওর, ব্যবহার বিধি লেখা ম্যানুয়াল হাতে আসায় আরো সুবিধে হলো।

অনেকগুলো ম্যানুয়াল পেলো ও, তার মধ্যে একটা শিরোনাম,

‘সিংগার  
গাইডেড মিসাইল  
সিস্টেম/টার্গেট  
সিলেকশন অ্যাণ্ড  
রুলস অভ  
এনগেজমেন্ট/  
অপারেশনাল  
রিপোর্ট।’

এতে বলা হয়েছে মিসাইলগুলো কোনো কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার ফলাফলই বা কি হয়েছে। আরেকটা ম্যানুয়ালের শিরোনাম,

‘সিংগার গাইডেড মিসাইল সিস্টেম/ পোস্ট মডিফিকেশন সফটওয়্যার।’

পালিয়ে আসছে ওরা, পাগুয়ে নদীর ওপর একটা এক্সপেরিমেন্ট করলো শন, বাধ্য হয়েই। হিন্দুগুলো রাশিয়ার তৈরি, চালাচ্ছে ভাড়াটে শ্বেতাঙ্গ পাইলট, কোনোরকম অপরাধবোধ স্পর্শ করলো না ওকে। যখন দেখলো কোনোমতেই পিছু ছাড়ছে না, একের পর এক এ/টি-টু সোয়্যাটার মিসাইল ছুঁড়ছে ওদেরকে লক্ষ্য করে, ওটাকে আকাশ থেকে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো সে। আফ্রিকার আকাশ থেকে এই প্রথম একটা হিন্দ গানশিপ ভূপাতিত হলো।

পাগুয়ে নদীর কিনারা ধরে আরো বিশ কিলোমিটার এগোবার পর জঙ্গলে নিয়ে নামলো ওরা। এখানেই ওদের সাথে মিলিত হবার কথা আলফনসো বাহিনীর। টাকে পানিতে ডুবিয়ে দিলো শন, শত্রুরা ওটাকে দেখতে পেলো ওদের অবস্থান আন্দাজ করতে পারবে। লোকজন কম, অথচ থেকে নামানো হয়েছে ছত্রিশটা বড় আকারের কাঠের বাস্তু। কি করা যায় ভাবছে শন। আলফনসোর জন্যে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো ও।

কিন্তু বারো ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও আলফনসো বাহিনী পৌছুলো না। শন ধরে নিলো, যুদ্ধে তারা মারা গেছে অথবা বন্দী হয়েছে। অগত্যা বেশিরভাগ বাস্তু

মাটির ভেতর পুঁতে রাখার নির্দেশ দিলো ও, মাত্র দশটা বাস্ত্র নিয়ে রওনা হলো রেনামো লাইনের দিকে।

ফেরার পথে ধরা পড়ে গেলো দলটা। ভাগ্য এবারও ওদের পক্ষে। ধরা পড়েছে ওরা রেনামোদের হাতেই। জানা গেলো, ফেলিমোদের আক্রমণে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে জেনারেল চায়না, আর মাত্র ছ'মাইল দূরেই তার হেডকোয়ার্টার। রেনামোদের মেজর, তাকাউইরার সাথে দেখা হলো শনের। তাকে পিছনে ফেলে আসা মিসাইলগুলোর অবস্থান ম্যাপ একঁকে দেখিয়ে দিলো ও, সেগুলো উদ্ধার করার দায়িত্ব পেয়ে গর্ব অনুভব করলো মেজর। তার বিশ্বাস, শুধু মাটি খুঁড়ে ওগুলো বের করে আনতে পারলেই তার পদোন্নতি ঘটবে।

বিজয় শোভাযাত্রা নিয়ে হেডকোয়ার্টারে প্রবেশ করলো শন, ওদের সাফল্যের কাহিনী আগেই পৌঁছে গেছে। রাস্তার দুই পাশে উৎফুল্ল রেনামোরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে শনের সাথে করমর্দনের জন্যে, রঙিন পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধের গান ধরেছে মহিলা গেরিলারা।

নতুন তৈরি কমাণ্ড বাংকারের সামনে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল জেনারেল চায়না। তার পরনে সদ্য ভাঁজ ভাঙা ইউনিফর্ম, পিতলের পদকগুলো ঘষে-মেজে চকচকে করা হয়েছে। মাথার ক্যাপ কাত হয়ে রয়েছে একদিকে, প্রায় ঢেকে দিয়েছে একটা চোখ।

‘আমি জানতাম আপনি আমাকে হতাশ করবেন না, কর্নেল কোর্টনি’, পরিচয়ের পর এই প্রথম মনে হলো শনের, চায়নার হাসিটা কৃত্রিম নয়।

‘সার্জেন্ট আলফনসো আর তার ত্রিশজন গেরিলাকে হারিয়েছি আমরা’, গম্ভীর সুরে বললো শন। ‘বাধ্য হয়ে তাদেরকে আমরা ফেলে এসেছি।’

‘না! না, কর্নেল!’ শনের কাঁধ চাপড়ে আদর করলো জেনারেল চায়না। ‘আলফনসো নিরাপদেই বেরিয়ে এসেছে। সেন্ট মেরিন মিশনে পৌঁছেছে সে, মাত্র তিনজন লোক মারা গেছে। এইমাত্র তার সাথে রেডিওতে কথা হয়েছে আমার। কাল সন্দের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবে বলে আশা করছি।’ পোর্টাররা তার পায়ের কাছে কাঠের বাস্ত্রগুলো নামিয়ে রাখছে, সেগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালো জেনারেল। ‘এবার আসুন দেখা যাক কি এনেছেন আপনি আমার জন্যে। অ্যাঁই, বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন তোমরা? খোলো ওগুলো তাড়াতাড়ি খোলো!’

ছেলেমানুষের মতো এরকম উত্তেজনা কোনো গেরিলা কমাণ্ডারের কাছ থেকে আশা করা যায় না। বিশেষ করে জেনারেল চায়নার কাছ থেকে তো নয়ই, কারণ কঠিন নির্লিপ্ত ও শীতল একটা ভাব ছাড়া তার চেহারায় আর কিছু দেখা যায় না।

সাদা কাঠের বাস্ত্রগুলোকে জড়িয়ে আছে স্টীলের পাত, খুলতে গলদঘর্ম হয়ে উঠলো পোর্টাররা। দেরি হচ্ছে দেখে ধৈর্য হারিয়ে ফেললো চায়না, পোর্টার ও

অফিসারদের ঠেলা দিয়ে সরিয়ে নিজেই হাত লাগালো কাজে। উদ্বেজনা ও পরিশ্রমে একটু পরই ঘেমে গোসল হয়ে গেলো সে।

অবশেষে খোলা গেলো একটা বাস। ভেতরে কি আছে দেখে উল্লাসে নেচে উঠলো স্টাফরা।

মিসাইল টিউব সহ স্টিংগার লঞ্চার পুরোপুরি সংযোজিত অবস্থায় রয়েছে। আই.এফ. ইন্টারোগেটর আলাদাভাবে একটা এনভেলপে রাখা হয়েছে, ছোট্ট তারটা কনসোল হেড-এ ঢুকিয়ে দিলেই হয়। চারটে অতিরিক্ত টিউব দেখা গেলো, প্রতিটিতে একটা করে মিসাইল। মিসাইল ছোঁড়ার পর খালি টিউব ফেলে দিতে হবে, আবার তুলে নিতে হবে নতুন টিউব। প্রতিটি টিউবের সাথে রয়েছে একটা করে ষোলো পাউণ্ডের মিসাইল।

হাসি ও নাচ এক সময় থামলো, ভিড় করে সামনে বাড়লো জেনারেল স্টাফরা, জিনিসগুলো তারা পরীক্ষা করবে। সবার মধ্যেই আড়ষ্ট একটা ভাব দেখা গেলো, যেনো পাথরের তলায় এইমাত্র একটা কাঁকড়া বিছে আবিষ্কার করেছে তারা, ভয় পাচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে কামড়ের দবে।

ধীরে ধীরে মাটিতে একটা হাঁটু গেড়ে নিচু হলো জেনারেল চায়না, সংযোজিত একটা লঞ্চার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফোম থেকে তুলে নিলো সে। বিদ্যুটে আকৃতির অস্ত্রটা কাঁধে তুলছে, স্টাফরা বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মিসাইল টিউবটা ডার পিছনে লম্বা হয়ে থাকলো, আর অ্যান্টেনা সহ কনসোলটা তার প্রায় পুরো চেহারা ঢেকে দিলো। কনসোল-এর এইমিং স্ক্রীনে গভীর মনোযোগের সাথে তাকালো সে, ট্রিগারড পিস্তলের স্টকটা মুঠোর মধ্যে ধরলো।

আকাশের দিকে স্টিংগার তাক করলো জেনারেল চায়না, প্রশংসা ও উৎসাহ সূচক শব্দ বেরিয়ে এলো স্টাফদের গলা থেকে। 'ফেলিমোদের বাজপাখিকে আসতে দাও এবার!' গর্বের সাথে বললো সে। 'ওগুলোকে আমরা আগুনে জ্বলতে দেখবো।' গলা থেকে হেলিকপ্টার আর মেশিন-গানের আওয়াজ ছাড়লো সে, যেনো একটা বাচ্চা ছেলে খেলছে; আকাশে চক্কর দিতে থাকা কাল্পনিক হিন্দ গানশিপগুলোকে লক্ষ্য করে একের পর এক মিসাইল ছোঁড়ার ভঙ্গি করলো। 'বুম-বাম! ব্রুম-ব্রুম, সুইশ!'

'বুম-বুম!' ব্যঙ্গ করলো শন। দেখাদেখি অফিসারাও আওয়াজ নকল করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো। তারপর কে যেনো রণসঙ্গীত ধরলো, রেনামোদের অত্যন্ত প্রিয়। প্রায় দুশো লোক যোগ দিলো কোরাসে। এক সময় তা-ও স্তিমিত হয়ে এলো, একজন অফিসারের হাতে লঞ্চারটা ধরিয়ে দিয়ে শনের সাথে করমর্দনের জন্যে এগিয়ে এলো জেনারেল চায়না।

‘সহস্র অভিনন্দন, কর্নেল কোর্টনি!’ শনের পিঠ চাপড়ে দিলো সে। ‘আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন তার কথা চিরকাল মনে রাখবে রেনামোরা। আপনি আমাদের অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্য করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।’

‘তনে খুশি হলাম, কমাগার চায়না’, ঠাণ্ডা সুরে বললো শন। ‘কিন্তু শুধু মুখে বললে চলবে না, কাজেও কিছুটা দেখান।’

‘ও, হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম — মাফ করবেন’, বিনয় ও ভদ্রতা দেখাতে কসুর করলো না জেনারেল চায়না। ‘আপনার সাথে দেখা করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে একজন।’

শনের নিঃশ্বাস মাঝপথে থেমে গেলো, মোচড় দিয়ে উঠলো বুকের ভেতরটা। ‘কোথায় সে?’

‘আমার বাংকারে, কর্নেল’, বললো জেনারেল চায়না, গাছপালার ভেতর সযত্নে লুকানো বাংকারের প্রবেশপথটা হাত তুলে দেখিয়ে দিলো সে।

উত্তেজিত সৈনিকদের ভিড় ঠেলে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো শন, বাংকারের মুখে পৌঁছে মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকলো, তারপর আর ধৈর্য ধরতে পারলো না, প্রতি লাফে তিনটে করে ধাপ টপকে নেমে এলো নিচে।

রেডিও রুমে রয়েছে ক্লডিয়া, দেয়াল ঘেঁষে ফেলী লম্বা একটা বেঞ্চে বসে আছে, দু’পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন মহিলা পেরিলা। দেখামাত্র তার নামটা শনের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো ক্লডিয়া, অপলক তাকিয়ে আছে ওর দিকে, অবিশ্বাসে সাদা হয়ে আছে চেহারা। তার মুখ আর চোয়ালের হাড় পদ্যরাগের মতো গাঢ়। এগিয়ে আসছে শন, ক্লডিয়ার কজির ওপর চোখ পড়লো, ফুলে লাল হয়ে আছে মাংস — সাথে সাথে সীমাহীন আনন্দের সমান হয়ে উঠলো রাগের মাত্রা। এক ঝটকায় তাকে নিজের বুকে টেনে নিলো শন, অসম্ভব রোগা আর ভঙ্গুর লাগলো শরীরটা, যেনো সময়ের আগে বেড়ে ওঠা ছোট্ট একটা মেয়ে। এক মুহূর্ত নড়লো না ক্লডিয়া, তারপরই প্রবল আবেগে শনের গলাটা জড়িয়ে ধরলো দু’হাতে, বুকের সাথে সজোরে পিষে ফেলতে চাইলো ওকে। তার শক্তি অনুভব করে বিস্মিত হলো শন। ক্লডিয়ার ঘাড়ের গভীরে গাল ঘষার সময় টের পেলো খরখর করে কাঁপছে শরীরটা।

পরস্পরকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ওরা, অনেকক্ষণ কোনো কথা বললো না বা নড়লো না। তারপর শন অনুভব করলো, ওর শার্টের সামনের দিকটা ভিজে যাচ্ছে।

‘কেঁদো না, প্রিয়।’ দু’হাতের তালুতে ধরে ক্লডিয়ার মুখটা তুললো শন, আঙুল দিয়ে চোখের জল মুছে দিলো।

‘আমি আনন্দে কাঁদছি’, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বললো ক্লডিয়া, হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। ‘তুমি ফিরে এসেছো, আর কিছু চাই না আমি। এরপর যাই ঘটুক না কেন, আমার কোনো দুঃখে নেই।’

ক্লডিয়ার হাত দুটো ধরে নিজের মুখের সামনে তুললো শন, ফুলে ওঠা কজিতে আলতোভাবে চুমো খেলো।

‘এখন আর ওরা আমার ওপর অত্যাচার করতে পারবে না’, বললো ক্লডিয়া, পরম বিশ্বাসে শনের কাঁধে মাথা রাখলো সে। মহিলা গেরিলা দু’জনের দিকে তাকালো শন। চোখ গরম করে বললো, ‘বেরিয়ে যাও তোমরা।’

কথা না বলে মাথা নিচু করলো দুই তরুণী, কিন্তু বেঞ্চ ছেড়ে উঠলো না। পিস্তলের বাঁটে হাত দিলো শন, বললো, ‘মরতে চাও নাকি?’

একযোগে লাফিয়ে উঠলো তরুণীরা, পড়িমরি করে বেরিয়ে গেলো কামরা থেকে ক্লডিয়ার দিকে ফিরলো শন, এই প্রথম চুমো খেলো তার ঠোঁটে। চুমোটো দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হলো, তারপর এক সময় ক্লডিয়া ফিসফিস করলো, ‘ওরা যখন হ্যাণ্ডকাফ খুলে হাত-মুখ ধোয়ার সুযোগ দিলো তখনই বুঝলাম তুমি ফিরে আসছো।’

‘বাস্টার্ড! অসহায় একটা মেয়ের ওপর অত্যাচার করার শাস্তি ওদের পেতেই হবে। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি...।’

‘না, শন। মাথা গরম করো না। আবার আমরা এক হতে পেরেছি, এটাই আসল কথা। এরইমধ্যে সব ভুলে গেছি আমি।’

আর মাত্র কয়েক মিনিট একা থাকার সুযোগ হলো ওদের, ঝড়ের বেগে রেডিও রুমে ঢুকলো জেনারেল চায়না, সাথে একদল অফিসার, এখনো তারা সবাই হাসছে। শন আর ক্লডিয়াকে পথ দেখিয়ে নিজের প্রাইভেট অফিসে নিয়ে এলো সে। তার সবিনয় ও অতিথিপরায়ণ ভাব-ভঙ্গিতে ওরা যে মুগ্ধ হচ্ছে না, এটা যেনো খেয়ালই করলো না। ডেস্কের সামনে শান্তভাবে বসলো ওরা, পরস্পরের হাত ধরে আছে, মিষ্টি কথার উত্তরে চুপ করে থাকলো।

‘আপনাদের জন্যে সুন্দর একটা কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করেছি’, ওদেরকে বললো জেনারেল চায়না। ‘সত্যি কথাটাই বলি, আমার একজন সিনিয়র অফিসারকে সরিয়ে দিয়ে তার ডাগআউট আপনাদের বরাদ্দ করেছি। আশা করি, ওখানে আরামের সাথে থাকতে পারবেন আপনারা।’

‘থাকার প্রশ্ন উঠছে কেন?’ জিজ্ঞেস করলো শন, তিক্ত কণ্ঠস্বর। ‘ক্লডিয়াকে নিয়ে সীমান্তের দিকে রওনা হতে চাই আমি, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমার ইচ্ছে, কাল ভোরেই।’

অমায়িক হাসি ফুটলো জেনারেল চায়নার মুখে। ‘এ আপনার ভাবি অন্যায় কর্নেল কোর্টনি!’ তার গলায় অভিমান। ‘আপনি আমার এতো বড় উপকার করলেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগটুকুও কি দেবেন না? এখনি যাই যাই করলে চলবে কেন বলুন তো! এখন থেকে আপনারা আমার পরম আত্মীয় ও মেহমান। মুক্তির কথা যদি বলেন, অবশ্যই আপনারা তা অর্জন করেছেন। তবে, যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে আপনাদের বিদায় জানাতে ক’টা দিন দেরি হবে, এই যা। ফেলিমোদের বিশাল একটা বাহিনী এদিকে রওনা হয়েছে কিনা।’

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকালো শন। ‘ঠিক আছে, মেনে নিলাম। একটা বা দুটো দিন না হয় থাকলাম। তবে, আমার বাহুবীর জন্যে নতুন কাপড়চোপড় দরকার।’

‘অবশ্যই, কর্নেল কোর্টনি। আপনাকে বললাম না, আপনারা আমার পরম আত্মীয়?’

ভাগ আউটের পথে যেতে যেতে ক্লডিয়া বললো, ‘ওকে দেখলে আমার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যায়, শন!’

‘আর অল্প ক-দিন, ডার্লি!’ শন বলে।

\* \* \*

কোয়ার্টারটা বেশ সাজানো-গোছানো, সংলগ্ন বাথরুমও আছে। আলাদা বাবুর্চি দেয়া হয়েছে ওদেরকে। ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যে রয়েছে দু'জন গেরিলা-একজন তরুণী, একটা যুবক।

বাথরুম থেকে বেরুলো শন, ওদের বাবুর্চি জানালো, 'ডিনার রেডি, মেমসাহেব।'

দুই প্রস্থ পরিচ্ছেদ দেয়া হয়েছে শনকে, রেনামোদের ইউনিফর্ম ও সিভিল ড্রেস। সাদা শার্ট আর জিনসের প্যান্ট পরেছে শন।

ঘরে আসবাব বলতে দুটো চেয়ার আর একটা টেবিল। একধারে কাঠের তক্তা দিয়ে মাচা মতো তৈরি করা হয়েছে, মশারি দিয়ে ঢাকা, ওটাই ওদের বিছানা।

টেবিলে বসে নিঃশব্দে খেলো ওরা। বাবুর্চির রান্নার হাতটা ভালো, রন্ধেছেও অনেক রকম। খাওয়া শেষ হয়েছে, এই সময় একজন গেরিলা ঢুকলো ভেতরে, হাতে কাঠের একটা বাস্র। বাস্রের ভেতর ছ'টা বিয়ারের ক্যান দেখলো শন। বিয়ারের সাথে একটা চিরকুট পাটিয়েছে জেনারেল চায়না, আগামী কাল রাতে অফিসার্স মেসে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছে ওদেরকে।

মশারিটা যেনো একটা তাবুর মতো। একান্ত এক মন্দির, ওদের দুজনার জন্যেই যেনো তৈরী। লণ্ঠনের আলো চারিদিকে নরম সোনালী আভা ছড়াচ্ছে। ক্লডিয়ার শরীরের খাদ আর উপত্যকাগুলোকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে ছায়া। অনেকটা শুকিয়ে গেছে মেয়েটা — তবু, ওর শরীর অনন্য।

নরম, ছোট বুকজোড়ার একটায় কামড় বসালো শন, অনুভব করলো বৃত্তের দৃঢ় হয়ে উঠা। ওর উপড়ে চড়লো ক্লডিয়া।

ভালোবাসলো অনেকক্ষণ।

\* \* \*

অফিসার্স মেসে পরিবেশটা উৎসবমুখর হয়ে উঠলো। প্রথমেই জেনারেল চায়না ঘোষণা করলো, কর্নেল কোর্টনি ও তার বান্ধবী মিস মনটেরোর সম্মানে এই ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে। শন ও ক্লুডিয়াকে খুশি করার জন্যে খুবই ব্যস্ত দেখা গেলো তাকে।

বড় একটা গোল টেবিলের চারধারে বসলো সবাই। বিশাল গামলায় পরিবেশন করা হলো গো-মাংস। ভুট্টার রুটি রাখা হলো তামার থালায়। সাথে আছে প্রচুর বিয়ার। ডিনার শুরু আগে সবাই কষে ধূমপান করছে আর বিয়ার খাচ্ছে। এরইমধ্যে বেসামাল হয়ে পড়েছে অফিসারদের কেউ কেউ। বাৎকারটা বড় হলেও, ধোঁয়া আর পুরুষালি ঘামের গন্ধে দম আটকে আসার অবস্থা হলো ক্লুডিয়ার।

জেনারেল চায়না বিয়ার ছুঁলো না। অফিসারদের চোঁচামেচি শুনেও না শোনার ভান করলো সে। ক্লুডিয়া এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও, চায়না তাকে তার রাজনৈতিক বক্তব্য না শুনিয়ে ছাড়লো না।

অফিসারদের খাওয়ার ভঙ্গি দেখে গা ঘিন ঘিন করে উঠলো তার। প্রচণ্ড খিদে থাকা সত্ত্বেও মুখে প্রায় কিছুই দিতে পারলো না। একই জায়গা থেকে রুটি নিয়ে গোল পাকাচ্ছে সবাই, পাকানো রুটি গামলায় ডোবাচ্ছে, ঝোলে ভালো করে ভিজিয়ে নিয়ে মুখে পুরছে অর্ধেকটা, বাকি অর্ধেকটা আবার ডোবাচ্ছে ঝোলে। চর্বিবহুল আঠালো ঝোল তাদের চোঁট ও চিবুক বেয়ে নিচের দিকে গড়াচ্ছে, কিন্তু সেদিকে কারো খেয়াল নেই। খাবার চিবানোর সময় বাক-সুংখমের ধার ধারছে না কেউ, ফলে খাদ্যকণাগুলো মুখ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে টেবিলের ওপর, গামলায় ও হাতে ধরা রুটিতে।

হাত গুটিয়ে বসে থাকলো ক্লুডিয়া, লক্ষ্য করলো শনও সিদ্ধান্ত নিয়েছে অভুক্ত থাকার। অগত্যা জেনারেল চায়নার কথা শুনে সময়টা কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

‘গোটা দেশটাকে আমরা তিনটে ওঅর জোন-এ ভাগ করেছি’, ব্যাখ্যা করলো কমরেড চায়না। ‘উত্তরের কমান্ডার জেনারেলতাকাউইরা ডস আলভিস, তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন নিয়াসা ও কাবো ডোগাডো প্রদেশ। দক্ষিণে রয়েছেন জেনারেল টিপপো টিপ, আর আমি নিয়ন্ত্রণ করছি মধ্য প্রদেশ। আমরা তিনজন দখল করে রেখেছি গোটা মোজাম্বিকের শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ। বাকি চল্লিশ ভাগকে আমরা ডেস্ট্রাকশন জোন হিসেবে চিহ্নিত করেছি, অবলম্বন করেছি পোড়ামাটি নীতি, ফেলিমোরা যাতে নিজেদের প্রয়োজনে চাষাবাদ করতে না পারে।’

‘তাহলে আমেরিকায় বসে আমরা যে অত্যাচারের খবর পাই, তা সত্যি?’ জিজ্ঞেস করলো ক্লুডিয়া। ‘ডেস্ট্রাকশন জোনে আপনার সৈন্যরা নিরীহ লোকজনকে পুড়িয়ে মারছে, তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে।’

‘না, মিস মনটেরো। আমরা বরং ডেস্ট্রাকশন জোন থেকে অনেক সিভিলিয়ানকে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে এনেছি। সিভিলিয়ানদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে ফেলিমোরা।’

‘ফেলিমোরা মোজাম্বিক শাসন করছে, তারা কেন নিজেদের লোকজনের এভাবে পুড়িয়ে মারবে?’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো ক্রুডিয়া।

‘বিশ্বাস না হওয়াই স্বাভাবিক’, বললো জেনারেল চায়না। ‘কিন্তু কমিউনিস্টদের চিন্তাধারা বড় অদ্ভুত খাতে বয়, মিস মনটেরো। আপনি বললেন শাসন করছে, কিন্তু বাস্তব সত্য হলো শাসন করার যোগ্যতা তাদের নেই। শহরের বাইরে লোকজনকে তারা নিরাপত্তা বা খাবার, দুটোর কোনোটাই দিতে পারছে না — স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, পরিবহন সুবিধে বা যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা না হয় বাদই দিলাম। খেতে দেয়ার চেয়ে মানুষকে মেরে ফেলা অনেক সহজ। আর ঠিক সেটাই তার করছে, করে নাম দিচ্ছে রেনামোদের।’

‘কিন্তু ফেলিমো মোজাম্বিকের নির্বাচিত সরকার...’

হেসে উঠলো জেনারেল চায়না। ‘আফ্রিকায় নির্বাচিত সরকার বলে কিছু নেই, মিস মনটেরো।’

কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকলো ক্রুডিয়া, তারপর বললো, ‘আচ্ছা, বলুন তো, এই যুদ্ধে ফেলিমোরা যদি হেরে যায়, রেনামোরা যদি জেতে, আপনারা যদি নতুন সরকার গঠন করেন, তখন কি আপনি গণতন্ত্রের চর্চা করবেন, ব্যবস্থা করবেন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের?’

‘এতো বড় ধরে, এতো পরিশ্রম করে সরকার গঠন করবো, একদল গ্রাম্য চাষার হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার জন্যে? না, মিস মনটেরো, না। একবার ক্ষমতা পেলে তা নিষ্পদ হাতে ধরে রাখা হবে।’ জেনারেল চায়না তার পেশীবহুল হাত দুটো উঁচু করে দেখালো।

‘তারমানে অন্যেরা যতোটুকু খারাপ, আপনিও তাদের চেয়ে কম খারাপ নন।’ রাগে মুখের চেহারা লালচে হয়ে উঠলো ক্রুডিয়া। এই লোক তাকে মাটির তলায় একটা খুপির ভেতর দিনের পর দিন আটকে রেখেছিল, হাতের হ্যাণ্ডকাফ গুলিতে রাজি হয়নি, একটা অসহায় মেয়েকে যতো রকমভাবে সম্ভব অপমান করেছে।

‘আফ্রিকায় ভালো লোক বা মন্দ লোক বলে কিছু নেই’, বললো জেনারেল চায়না। ‘আলো শুধু বিজয়ী ও বিজিত। আমি বিজয়ীদের একজন হতে চাই, মিস মনটেরো।’

এমন সময় হঠাৎ করে বাৎকারে ঢুকলো একজন সিগন্যাল অফিসার জেনারেল চায়নার কাছে জানতে কি যেনো বললো সে। তাকে নিয়ে অফিসার্স মেন্স থেকে বেরিয়ে গেলো জেনারেল, অতিথিদের কাছে ক্ষমা না চেয়েই। তাকে চলে যেতে দেখে শব্দেব দিল, ফুটলো ক্রুডিয়া, ফিসফিস করে বললো, ‘লোকটা আমাকে আভ্যেক্সের মতো দেখলেই ভয় লাগে। আবার ফিরে আসার আগে আমরা চলে পেরিয়ে

কুড়িয়াকে নিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে শন, পিছন থেকে কুকুর-বিড়ালের ডাক ছাড়লো অফিসাররা। ওদেরকে বাধা দেয়া হলো দরজার বাইরে। অন্ধকার ফুঁড়ে সামনে বেরিয়ে এলো জেনারেল চায়না।

‘আপনারা এখনি বিদায় নিচ্ছেন নাকি?’ জিজ্ঞেস করলো সে, তারপর বললো, দু’জনের জন্যেই খারাপ খবর রয়েছে আমার কাছে।’

‘আপনার উদ্দেশ্য ভালো নয়’, ঠাণ্ডা গলায় বললো শন। ‘আমি জানতাম, আপনি কথা রাখবেন না।’

‘পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে’, শান্তভাবে বললো জেনারেল। ‘আমি নাচার। সার্জেন্ট আলফনসো এইমাত্র রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সে ফিরবে বলে আশা করেছিলাম আমি। ফিরলে সীমান্ত পর্যন্ত আপনাদেরকে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব দিতাম তাকে। কিন্তু...।’

‘ঠিক আছে, বলুন, আসলে কি চান আপনি?’ প্রায় ঝঁকিয়ে উঠলো শন। ‘নতুন কি অজুহাত দাঁড় করাবেন?’

অপমানটা গায়ে মাখলো না কমরেড চায়না। ‘আমাদের পশ্চিমে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। হিন্দ গানশিপের সফলিমো ও নিয়মিত জিম্বাবুই বাহিনী একযোগে বড় ধরনের আক্রমণ শুরু করবে বলে মনে হচ্ছে। আমরা সম্ভবত এরইমধ্যে জিম্বাবুই সীমান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমাদের দখল করা এলাকাগুলোয় যে — কোনো মুহূর্তে শত্রুরা ঢুকে পড়বে। সার্জেন্ট আলফনসো তার কিছু লোককে হারিয়েছে, তারপরও চেষ্টা করছে ফিরে আসার। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এখন যদি যেতে দেয়া হয়, আপনারা সীমান্তে পৌছানোর আগেই সফলিমোদের হাতে ধরা পড়বেন। একবার ভেবে দেখেছেন, মিস মনটেরোকে হাতে পেলে কি করবে ওরা?’

‘আসলে কি চান, বলবেন?’ আবার জিজ্ঞেস করলো শন। ‘আপনার কোনো মতলব আছে। কি সেটা?’

‘আমার ওপর আপনার বিশ্বাসের বহর দেখে খুশি হতে পারছি না’, বললো জেনারেল, যদিও হাসছে। ‘কি জানেন, কর্নেল কোটনি, যতো তাড়াতাড়ি হিন্দ গানশিপগুলো ধ্বংস করা যাবে ততো তাড়াতাড়ি ব্যর্থ করে দেয়া সম্ভব হবে সফলিমোদের আক্রমণ। তারপর আর দেরি কিসের, আপনারাও সীমান্তের দিকে চলে যেতে পারবেন।’

‘আমি শুনছি’, বললো শন।

‘আপনি আর ক্যাপটেন জোব, শুধু এই দু’জনই সিংগার সম্পর্কে জানেন। সিংগার পেয়েছি, কিন্তু ওগুলো ছুঁড়বে কে? আমি চাই, বাছাই করা একদল লোককে আপনি ট্রেনিং দিন।’

‘শুধু এই, নাকি আরো কিছু আছে? কিছু লোককে মিসাইল ছোঁড়া শিখিয়ে দিলে আমাদেরকে ছেড়ে দেবেন?’

‘দেবো।’

‘কি করে বুঝবো আবার আপনি গোল পোস্ট সরাবেন না?’

‘আপনি আমাকে অপমান করছেন, মেজর।’

‘যতোটা করতে চাই তার ধারেকাছেও যেতে পারছি না।’

‘তাহলে সে-কথাই রইলো। আপনি আমার লোকদের ট্রেনিং দেবেন, বিনিময়ে আপনাদেরকে আমি প্রথম সুযোগেই সীমান্ত পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবো।’

‘কাল সকাল থেকে শুরু করবো আমি’, বললো শন। ‘ভালো হয় যদি আলফনসো আর তার লোকজনকে পাই। ওদেরকে আমি ভালো করে চিনি, ওরা আমার ভাষা বোঝে। আলফনসোর সাথে ফার্দিনান্দকেও চাই আমি।’ ফার্দিনান্দকে শিক্ষানবিশ ড্রাইভার হিসেবে ট্রেনিং দিয়েছে শন।

‘কি রকম সময় নেবেন?’ জানতে চাইলো জেনারেল চায়না। ‘বুঝতেই পারছেন, এখন প্রতিটি ঘন্টাই ভাইটাল।’

‘আলফনসোর লোকদের পেলে এক সপ্তার মধ্যে ট্রেনিং শেষ করা সম্ভব’, বললো শন।

‘অতো সময় আপনি পাবেন না।’

‘তার আগেই, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, স্টিংগার ছোঁড়ার ব্যবস্থা করবো আমি’, শনের গলায় ঝাঁঝ। ‘প্রয়োজনের চেয়ে এক মিনিটও বেশি থাকার ইচ্ছে আমার নেই। এবার আমরা বিদায় নেবো।’ ক্লুডিয়ার হাত ধরে ঘুরলো ও।

‘শন!’ ফিসফিস করলো ক্লুডিয়া। ‘কেন যেনো আমার মনে হচ্ছে, এই ফাঁদ থেকে কোনোদিনই আমরা বেরুতে পারবো না...।’ শন ওর বাহুতে চাপ দিয়ে থামিয়ে দিলো।

‘ওপরে তাকাও’, নরম সুরে বললো ও। আকাশের দিকে মুখ তুললো ক্লুডিয়া।

‘তারা?’ জিজ্ঞেস করলো ক্লুডিয়া। ‘তুমি আমাকে তারা দেখতে বলছো?’

‘হ্যাঁ’ আকাশ জুড়ে তারার মেলা বসেছে, কালো মখমলের ওপর ছড়িয়ে থাকা মুক্তোর মতো। ‘আত্মাকে শান্ত করে ওগুলো।’

বড় করে নিঃশ্বাস ফেললো ক্লুডিয়া। ‘হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। আজ আমরা বাঁচি এসো, ভালোবাসি, কাল কি হবে পরে দেখা যাবে।’

মশারির ভেতর নিরাপদ বোধ করলো ক্লুডিয়া, জৈবিক তাড়না মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় সমস্ত ভয় ও দৃষ্টিভ্রান্ত আপাতত মুখ লুকালো। এক সময় ক্লুডিয়ার শনের কানে কানে বললো, ‘এভাবে আমরা যদি দশ হাজার বারও ভালোবাসি, তোমাকে পাওয়ার এই যে আমার আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি তাতে একটুও মরচে ধরবে না।’ তারপর ঘুমিয়ে পড়লো সে।

হঠাৎ ঘুম ভাঙলো তার গায়ে লেগে থাকা শনের পেশী হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে ওঠায়। সাথে সাথে তার ঠোঁটে একটা আঙুল চেপে ধরলো শন, যাতে কোনো শব্দ



‘বাজপাখির আস্তানার ভেতর অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সবুজ কাপড় পরা সাদা চামড়ার লোকজন বারবার বাজপাখির ভেতর ঢুকে কি যেনো দেখছে।’ মোবাইল ওঅর্কশপ, ফুয়েল ট্যাংকার, ভাড়াটে সৈনিক ও টেকনিশিয়ানদের বর্ণনা দিলো মাতাউ।

‘মাতাউ, তুমি কি পাহাড়ের কাছাকাছি লাইনে রেলগাড়ি দেখেছো?’ জানতে চাইলো শন।

‘দেখেছি’, জবাব দিলো মাতাউ। ‘বগিগুলোয় শুধু বিয়ার রয়েছে— বাজপাখি ওড়বার সময় ওদের গলা বোধহয় শুকিয়ে যায়।’ শনের সাথে একবার হারারেতে বেড়াতে গিয়েছিল মাতাউ, বেশ কয়েক বছর আগে। ওখানে একটা ট্যাংকারকে বিয়ার আনলোড করতে দেখে সে। সেই থেকে তার ধারণা হয়েছে ট্যাংকার মাএই বিয়ার বহন করে। তার ভুলটা ভেঙে দিতে চেষ্টা করেছে শন, কিন্তু পারেনি। ট্যাংকারে যে গ্যাসোলিন থাকতে পারে, এটা সে বিশ্বাস করবে না।

অন্ধকারে হাসলো শন। বড় আকারের ট্যাংকারে করে ফুয়েল আনা হচ্ছে হারারে থেকে, তারপর ছোটো ট্যাংকারে ভরে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে সড়কপথে গ্যারিসনে। তারমানে, বোঝা যাচ্ছে, হিন্দ গানশিপের আস্তানাতেই মজুদ রাখা হয়েছে ফুয়েল। বেশ বড় ধরনের একটা বুঁকি নিচ্ছে ফেলিমোরা। তথ্যটা মনে গেঁথে রাখলো শন।

আরো প্রায় এক ঘন্টা মশারির ভেতর থাকলো মাতাউ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত তথ্য তার কাছ থেকে জেনে নিলো শন। মাতাউ নিশ্চিত, আস্তানায় মোট এগারোটা হিন্দ গানশিপ আছে। হিসাবটা মিলে গেলো, বাকি একটা হিন্দকে স্টিংগারের সাহায্যে ভূপাতিত করেছে শন, বিমান থেকে। মাতাউ জানালো, আসলে মাত্র নয়টা গানশিপ আকাশে উড়ছে। ছোটো একটা পাহাড়ের মাথায় নিজেকে লুকিয়ে রেখে ভোরবেলা ওগুলোকে আকাশে উড়তে দেখেছে সে। প্রতিটি হিন্দ সারাদিনে কয়েকবার ফুয়েল নিতে আসে, শেষবার ফেরে সন্ধ্যার দিকে। শন জানে, মাত্র বিশ পর্যন্ত গুনতে পারে মাতাউ, তার বেশি হলে ‘অনেক’ বা ‘অসংখ্য’ বলে চালিয়ে দেয়।

শন ধারণা করলো, দুটো হিন্দ অচল হয়ে পড়েছে, সম্ভবত স্পেসয়ার পার্টস না আসা পর্যন্ত উড়তে পারবে না। তবে রেনামোদের বারোটা বাজাবার জন্যে নয়টাই যথেষ্ট।

‘হুকুম করুন, বাওয়ানা’, বললো মাতাউ। ‘আর কি করার আছে আমার?’

চুপচাপ চিন্তা করলো শন। মাতাউকে নিজের লোক বলে শাস্তানিদের দলে ভিড়িয়ে দিতে পারে ও। কিন্তু ওর মন বলছে, মাতাউকে কমরেড চায়নার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখলে ভবিষ্যতে লাভ হতে পারে। ‘তুমি আমার তুরূপ, মাতাউ’, ইংরেজীতে বললো শন, তারপর সোয়াহিলি ভাষায় জানালো, ‘আমি চাই সবার

চোখের আড়ালে থাকো তুমি। কেউ যেনো তোমাকে দেখতে না পায়। আমি আর জোব ছাড়া।’

‘শুনলাম, বাওয়ানা।’

‘আজকের মতো, রোজ রাতে আমার সাথে দেখা করবে। তোমার জন্যে খাবার রাখবো আমি, বলবো কি করতে হবে। আপাতত চোখ খোলা রাখো, কি দেখছে সব জানাও আমাকে।’

এমন নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো মাতাউ, বাংকারের মুখের কাছে পর্দাটা একবার শুধু একটু খসখস করে উঠলো।

‘ওর কিছু হবে না তো?’ উদ্বেগে কেঁপে গেলো ক্লডিয়ার গলা। ‘আমার খুব ভয় লাগছে। লোকটাকে আমার এতো ভালো লাগে!’

‘আমাদের মধ্যে একা ও-ই হয়তো শেষ পর্যন্ত বাঁচবে’, সঙ্কেহে হাসলো শন।

‘আমার আর ঘুম আসবে না’, আদুরে বিড়ালের মতো শনের গায়ে সঁটে এলো ক্লডিয়া। ‘মাতাউ আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ায় আমি খুশি। সত্যি কথা বলতে কি, ওর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ.....’



\* \* \*

খুব ভোরে জোবের ঘুম ভাঙলো শন। ‘ওঠো, অনেক কাজ পড়ে আছে।’ বুটের ফিতে বাঁধছে জোব, পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলো ও।

‘তারমানে কান-কাটা চায়না পদোন্নতি দিয়ে আমাদেরকে ইন্সট্রাকটর বানিয়েছে’, চাপা গলায় হেসে উঠলো জোব। ‘অঁথচ সিংগারগুলো সম্পর্কে শুধু ওই ম্যানুয়াল দেখে যা কিছু শিখেছি।’

এবার হাতে-কলমে শিখতে হবে’, বললো শন। ‘তারপর শাস্ত্রানিদের ট্রেনিং দেবো আমরা। তার আগে আমাদের ছাড়বে না চায়না।’

‘তারপরও কি ছাড়বে?’ জিজ্ঞেস করলো জোব, আড়চোখে তাকালো শনের দিকে।

‘চলো, ফার্দিনান্দ আর তার লোকজনকে এক জায়গায় জড়ো করি’, প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললো শন। ‘প্রতিটি দলে দু’জন করে লোক থাকবে- একজনের দায়িত্বে থাকবে লঞ্চার, অপর লোকটা অতিরিক্ত মিসাইল বহন করবে। দ্বিতীয় লোকটাকে দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য হতে হবে, লিডার যদি ধরাশায়ী হয়।’ মোমবাতি জ্বলে নোটবুক বের করলো শন।

বাঘের ছাপ মারা প্যান্টের ভেতর শার্ট গুঁজলো জোব। ‘আলফনসো কখন পৌঁছবে বলে আশা করছেন আপনি?’ জানতে চাইলো সে।

‘আজ কোনো এক সময়, আদৌ যদি পৌঁছায়’, বললো শন।

‘রেনামোদের মধ্যে একমাত্র সেই একটু ভালো’, মন্তব্য করলো জোব।

‘ফার্দিনান্দও খারাপ নয়’, বললো শন, সেকশন লিডার হিসেবে তাদের নাম তালিকার মাথায় লিখলো শন। ‘ত্রিশজন লোক দরকার আমার, নাম বলো’

ভোরের আলো ফোটার পর লোকগুলোকে প্যারেড করালো শন। এরা সবাই গ্র্যাণ্ড রীফ অপারেশনে শনের সাথে ছিলো। ফার্দিনান্দের সাথে রয়েছে আঠারো জন লোক, তাকে পদোন্নতি দিয়ে পুরোপুরি সার্জেন্ট বানালো শন। আনন্দে শনকে স্যালুট করলো ফার্দিনান্দ, গর্বের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কালো চেহারা। ‘সার্জেন্ট’, এই প্রথম ফার্দিনান্দকে সার্জেন্ট বলে সম্বোধন করলো শন। ‘ওদিকে ওই পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছে?’ গাছপালার ফাঁক দিয়ে কোনোরকমে, অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে দূরবর্তী পাহাড়টা। ‘তোমার লোকজনদের নিয়ে ছোটো, পাহাড়টাকে একবার চক্কর দিয়ে দু’ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসো এখানে। প্রত্যেকের সাথে অস্ত্র ও ফুল ফিল্ড-প্যাক থাকবে।’

দলটা ছুটলো, তাদের দিকে চোখ রেখে শন বললো, ‘আজ সন্দের মধ্যে আলফনসো যদি না ফেরে, অন্য লোকদের রিক্রুট করবো আমরা।’

‘এখন কি করবো?’ জানতে চাইলো জোব।

‘শিখবো’, বললো শন। ‘বের করো ম্যানুয়াল।’

ডাগআউটে ওদের সাথে যোগ দিলো ক্লুডিয়া। অনেকগুলো ম্যানুয়াল, লাল প্লাস্টিক মোড়কে মোড়া। নিজেদের কাজে লাগবে, শুধু সে-ধরনের তথ্যগুলো







‘ঠিক আছে, মিস আলাস্কা’, তিক্ত কণ্ঠে বললো শন, ‘এইমাত্র তোমাকে ইনস্ট্রাকটরের পদে নিয়োগ করা হলো। এখন থেকে ইকুইপমেন্টগুলোর দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে চাপলো। আমি আর জোব শাস্তানিদের ক্লাস নেবো, ওদেরকে হাতে-কলমে শেখাবার দায়িত্ব তোমার।’

এই সময় থিয়েটারে হাজির হলো জেনারেল চায়না। ‘আমি সাবধান করতে এসেছি’, বললো সে। ‘ফ্রেলিমোরা আক্রমণ শুরু করেছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে এদিকে আসছে তারা। পাহাড় আর নদীর কাছ থেকে আরো দুর্গম এলাকায় হটিয়ে দিতে চায় আমাদেরকে। রেনামোদের সমতল এলাকায় পেলে হিন্দ গানারদের খুব সুবিধে হয়।’

‘ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছেন মনে হচ্ছে?’ বিদ্রূপ করলো শন।

‘আমরা পিছু হটছি’, বললো জেনারেল চায়না, ‘তার চোখ দুটো পলকের জন্যে জ্বলে উঠলো।’ ‘স্টিংগার ছোঁড়ার মতো অপারেটর তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আর কিছু করার নেই আমাদের। চারদিকের সমস্ত ঘাঁটি থেকে রেডিও মেসেজ আসছে, হিন্দ গানশিপের আক্রমণে আমার লোকজন টিকতে পারছে না। ওদেরকে আমি কবে নাগাদ স্টিংগার পাঠাতে পারবো?’

‘দু’দিন পর।’

‘দু’দিন? সময়টা কমিয়ে আনা যায় না?’ সে যে ধৈর্য ধরতে পারছে না, বোঝাবার জন্যে হাতের স্টিকটা দিয়ে তালুর ওপর বারবার বাড়ি মারলো কমরেড চায়না। ‘অন্তত একটা দলকে তাড়াতাড়ি ট্রেনিং দেয়া যায় না?’

‘আপনি আসলে বোকার মতো কথা বলছেন, জেনারেল চায়না’, বললো শন। ‘স্টিংগারের ওপর এতোটা ভরসা করা কি উচিত হচ্ছে আপনার?’

‘কি বলতে চান?’

‘হিন্দগুলো এখানে কারা অপারেট করছে জানেন? আফগানিস্তানে ওরাই ওগুলো অপারেট করেছিল। স্টিংগারের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা কিভাবে নিতে হয় জানা আছে ওদের। এখন পর্যন্ত ওরা সতর্ক নয়, কিন্তু যে-ই আকাশে একটা স্টিংগার দেখা যাবে, সাথে সাথে পাল্টে যাবে পরিস্থিতি। আপনি হয়তো একটাকে ফেলতে পারবেন, কিন্তু বাকিগুলো আপনার জন্যে তৈরি হয়ে থাকবে।’

চিন্তিতভাবে শনের দিকে তাকিয়ে থাকলো কমরেড চায়না। ‘আপনার পরামর্শ কি?’

‘আপনার যা কিছু আছে, সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত হানুন।’

‘কোথায়? কখন?’

‘যেখানে ওরা কোনো হামলা আশঙ্কা করেছে না। আ ফুল স্কেল সারপ্রাইজ অ্যাটাক। ওগুলোর আস্তানায়।’



আছে, যার সাহায্যে আমাদের বুলেট আর রকেটগুলোকে ওরা গলিয়ে ছাতু করে দিতে পারে।’

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালো শন। হিন্দের গানাররা নিশ্চই রেনামোদের ভয় দেখাবার জন্যে অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার করছে। এই কৌশল আফগানিস্তানেও ব্যবহার করা হয়েছে।

‘আমাদের পুরো লাইন বরাবর রেনামোরা কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, নয়তো দৌড়াচ্ছে। বাজপাখির বিরুদ্ধে লড়া সম্ভব নয়।’

‘সম্ভব’, আলফনসোর শার্টের সামনেটা চেপে ধরলো শন। ‘এসো, কিভাবে লড়তে হবে তোমাকে শিখিয়ে দিই। তোমার লোকদের ঘুম ভাঙাও। ঘুমোবার অনেক সময় পাওয়া যাবে, তার আগে যাও রাশিয়ান পাখীগুলোকে আকাশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে এসো।’

\* \* \*

শন ও জোব লোকগুলোকে চেনে, তাদের নাম জানে, কার কি বৈশিষ্ট্য তা-ও বোঝে। আলফনসো ও ফার্দিনান্ডের নেতৃত্বে তাদেরকে দুটো দলে ভাগ করলো শন। দলনেতাদের সাহায্যে শুরু হলো বাছাই পর্ব। যাদের শেকার অগ্রহ আছে, বুদ্ধিমান, তারাই টিকলো স্টিংগার ট্রেনিং পাবার জন্যে। বিশজনের একটা শিক্ষানবিশ দল তৈরি করতে তিন ঘন্টা লাগলো ওদের। ঠিক হলো, বাকি সবাই প্রচলিত অস্ত্র নিয়ে আক্রমণে অংশগ্রহণ করবে। ইতিমধ্যে হিন্দ গানশিপের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কৌশল সবাই তারা শিখে নিয়েছে।

মিসাইল হোঁড়ার ট্রেনিং দেয়ার জন্যে একটা দলের দায়িত্ব নিলো শন, অপরটার জোব। ঘন্টার পর ঘন্টা স্টিংগারের অ্যাকশন দেখানো হলো তাদেরকে। শেখানো হলো লক্ষ্যের কিভাবে লোড করতে হয়, কিভাবে লক করতে হয়, কিভাবে লক্ষ্যস্থির করতে হয়। শেষ বিকেলের দিকে পাঁচজনের একটা দলকে ক্লুডিয়ার কাছে পাঠানো হলো ট্রেনিং ইকুইপমেন্টের সাহায্যে নকল আক্রমণে অংশগ্রহণের জন্যে। পাঁচজনের মধ্যে আলফনসো ও ফার্দিনান্দও থাকলো।

আলফনসো পরপর তিনবার লক্ষ্যভেদ করলো, সাথে সাথে ক্লুডিয়ার সহকারী ও অনুবাদক হিসেবে নির্বাচন করা হলো তাকে। সন্দের আগে বাকি চারজনও পরপর তিনবার লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হলো, তাদেরকে হামলায় অংশগ্রহণের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করলো ক্লুডিয়া।

ক্লাস্ত পায়ে নিজেদের বাংকারে ফিরে এলো শন ও ক্লুডিয়া। বাবুর্চি ও আর্দালিদের বিদায় করে দিয়ে খেতে বসলো ওরা, অঙ্কার থেকে হামাঙড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকলো মাতাউ। তাকে খেতে দিলো ক্লুডিয়া।

খাওয়া শেষ হতে শন বললো, ‘চলো, কাজ আছে।’

অঙ্কার অ্যাক্সিথিয়েটারে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল জোব। হিন্দ গানশিপের আস্তানা দেখে এসেছে মাতাউ, শনের নির্দেশে তাকে একটা মডেল তৈরি করতে হবে। মডেল তৈরির উপকরণ আগেই যোগাড় করে রেখেছে জোব। প্যারাক্সিন ল্যাম্পের আলোয় কাজ শুরু করলো ওরা। কাদা দিয়ে পাহাড় বানাতে মাতাউ, গাছগুলোর প্রতিনিধিত্ব করলো গুনকো ঘাসের ডগা, সরু কাঠি ব্যবহার করা হলো রাস্তা বোঝাবার জন্যে, সরু করে কাগজ কেটে তৈরি করা হলো রেলপথ। শনেশন জানে, লেখাপড়া না জানলে কি হবে, প্রথর স্মরণশক্তির অধিকারী মাতাউ, একবার একটা জিনিস দেখলে ভোলে না। ক্লুডিয়ার আরো একটা গুণের কথা প্রকাশ হয়ে একটা জিনিস দেখলে ভোলে না। ক্লুডিয়ার আরো একটা গুণের কথা প্রকাশ হলো পড়লো, কাদা দিয়ে অবিকল হিন্দ হেলিকপ্টার তৈরি করলো সে। মাতাউর সাহায্য নিয়ে পাহাড়ের মাথায় সেগুলো বসানো হলো। এক গাদা নুড়ি পাথর কুড়িয়ে আনলো জোব, প্রতিটি পাথর প্রতিনিধিত্ব করবে রেনামো সৈনিকদের।

মাঝরাতের অনেক পরে মশারির তেতর ঢুকলো ওরা। এতোই ক্লান্ত যে সহজে ঘুম এলো না। শনকে নিজের ছেলেবেলার কথা শোনালো ক্লডিয়া, বাবা-মা'র বনিবনা না হওয়ায় কি বৃকম মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তাকে। 'বারো বছর বয়েসেই বুকে ফেলি আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। বাবা আর মামির ক্রটি-বিচ্যুতি এতো বেশি চোখে বাজতো যে প্রতিটি কাজে ষোলো আনা নিখুঁত হবার একটা জেদ চেপে গিয়েছিল আমার। সেজন্যে খুব কম মানুষকেই আমি সহ্য করতে পারি।' শনের কোলের তেতর সরে এলো ক্লডিয়া।

শেষ রাতের দিকে ঘুমালো ওরা। মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুম হলো, তবু জাগার পর তাজা ও ঝরঝরে লাগলো শরীর। অ্যাক্সিথিয়েটারে বাকি রেনামোদের ট্রেনিং দেয়ার কাজ শুরু হলো তোর বেলা। দুপুরের দিকে বাকি সবগুলো লোককে হাতে কলমে মিসাইল ছোঁড়া শিখিয়ে দিলো ক্লডিয়া। আধ ঘণ্টা ঝাওয়া ও বিশ্রাম, তারপর শুরু হলো প্ল্যান তৈরি। মডেলটার চারপাশে সবাইকে জড়ো হতে বললো শন। গোটা এলাকা চিনিয়ে দেয়া হলো সবাইকে। কিভাবে আক্রমণ করা হবে ব্যাখ্যা করা হলো। তারপর কে কি বুঝেছে পরীক্ষা করার জন্যে প্রত্যেককে ডাকা হলো, মডেল দেখিয়ে আক্রমণটা ব্যাখ্যা করতে বলা হলো।

ট্রেনিংয়ের ধরন ও শনের ক্লান্তিহীন ধৈর্য লক্ষ্য করে শাক্সানিরা এতোই মুগ্ধ হলো যে কেউ কেউ ওকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করলো, শুনে লালচে হয়ে উঠলো শনের চেহারা। সার্জেন্ট আলফনসো ব্যাখ্যা করলো, অফ্রিকায় বাবা মানে ঠিক পিতা, নয়, সঠিক প্রতিশব্দ হতে পারে শুরু। সে নিজেও শনকে 'মহান শিক্ষক', 'সর্দার' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করলো, তারপর ছোটোখাটো একটা ভাষণ দিয়ে ফেললো সে। তার ভাষণের সারমর্ম হলো, শাক্সানিরা চায় তাদের সাথে আক্রমণে শনও যেনো অংশগ্রহণ করে, তা না হলে নিজেদের অসহায় লাগবে।

সবিনয়ে তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলো শন, বললো, 'তোমরা পুরুষমানুষ, পুরুষমানুষ নিজেকে কখনো অসহায় মনে করে না। আমার পথ আত্মরক্ষা দিকে চলে গেছে, কাজেই আমাকে তোমরা পাবে না। যা কিছু শেখাবার সব আমি তোমাদের শিখিয়েছি, বিশ্বাস করি বাজপাখিগুলোকে পুড়িয়ে দিয়ে বিজয়ী হয়ে ফিরবে তোমরা। তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসা রইলো।'

বিষম হতে উঠলো পরিবেশ, নিচু স্বরে ফিসফাস করলো শাক্সানিরা। ঘুরে দাঁড়ালো শন, এতোক্ষণে দেখলো কখন যেনো নদীর কিনারায় একটা গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে জেনারেল চার্না। তার সাথে দশ-বারোজন অফিসার রয়েছে, তারা সবাই তার দেহরক্ষী, প্রত্যেকের পরনে মেরুন রঙের বেরেট।

অফিসারদের পিছনে রেখে এগিয়ে এলো জেনারেল। 'দেখতে পাচ্ছি আপনার প্রস্তুতি শেষ হয়েছে, কর্নেল কোটনি', বললো সে।

‘হ্যাঁ, ট্রেনিং শেষ হয়েছে’, বললো শন। ‘যে-কোনো মুহূর্তে, আপনি অর্ডার দিলেই, রওনা হতে পারে ওরা।’

‘আপনি কি দয়া করে আরেকবার ব্যাখ্যা করবেন প্ল্যানটা, আমার বোঝার সুবিধের জন্যে?’

আলফনসোর দিকে আঙুল তুললো শন। ‘হামলার প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করো’, নির্দেশ দিলো ও।

হেলিকপ্টার ঘাঁটির মডেলের সামনে দাঁড়ালো জেনারেল চায়না, হাত দুটো পিছনে, শক্ত করে ধরে আছে স্টিংকটা। আক্রমণ ব্যাখ্যা করছে আলফনসো, তাকে থামিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে নানা প্রশ্ন করছে শনকে সে। ‘আপনি দেখছি মাত্র অর্ধেক মিসাইল ব্যবহার করছেন, কারণ কি?’

‘রেইডিং কলামকে ফেলিমো লাইন পেরিয়ে যেতে হবে, কারো চোখে ধরা না পড়ে। মিসাইলগুলো আকারে বিরাট, খুব ভারিও। সবগুলো বইতে হলে আরো লোক লাগবে, তারমানে দলটা বড় হয়ে যাবে-তাতে ফেলিমোদের চোখে ধরা পড়ার আশঙ্কা আরো বাড়বে।’

মাথা ঝাঁকালো জেনারেল চায়না।

তারপর শন বললো, ‘আক্রমণটা সফল হবেই, এ নিশ্চয়তা কোউ দিতে পারেন না। যদি ওরা ব্যর্থ হয়...।’

‘হ্যাঁ, ব্যর্থ হলেও আমাদের হাতে স্টিংগার থাকবে। খন্যবাদ, মোকদ্দম। যা আধার শুরু করো।’

ধীরে ধীরে, কয়েক স্তরে ভাগ করে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলো আলফনসো। মাথানো নুড়ি পাথর দেখিয়ে বললো, এগুলো মিসাইল টিম। মিসাইল টিম পজিশন নেবে তা-ও দেখালো সে। হিন্দের ঘাঁটি থেকে পাঁচশো মিটার ঢাকা দিয়ে থাকবে তারা।

লাল ফ্লোর ছুঁড়ে সংকেত দেয়া হবে। সংকেত পেয়ে অ্যাসল্ট টিম রাস্তা দিক থেকে আক্রমণ শুরু করবে, আঘাত হানবে রেললাইনের ওপর যদি কোনো ফুয়েল ট্যাংকার থাকে। একই সাথে ঘাঁটিতে মর্টার ছুঁড়বে ওরা। তারপর দক্ষিণ পেরিমিটারে হানা দেবে। ‘গোলাগুলি শুরু হওয়ামাত্র হিন্দগুলো আকাশে উঠবে’, ব্যাখ্যা করলো আলফনসো। ‘আকাশ-পথে পালাবার চেষ্টা করবে ওগুলো। তবে মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠার পর কিছুটা সময় দেবে ওরা, কিছুক্ষণ স্থির ভেসে থাকবে শূন্যে, ঠিক ওই সময় ওগুলোকে শিকার করবে আমরা।’

প্ল্যানটা নিয়ে আরো অনেকক্ষণ আলোচনা করলো জেনারেল চায়না, তারপর মাথা ঝাঁকালো সে। জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনি তাহলে হামলা করবেন রওনা হওয়ার ছয় মিনিটের মধ্যে?’

‘আমি নই, ওরা’, কঠিন সুরে বললো শন। ‘আক্রমণের নেতৃত্বে দেবে আলফনসো। সন্দের দু’ঘন্টা আগে রওনা হবে ওরা, রাতে ফেলিমো লাইন পেরুবে। কাল সারাদিন ওরা গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করবে। হানা দেবে রাতে।’

‘ভেরি ওয়েল’, সায় দিলো জেনারেল চায়না। ‘এখন আমি গেরিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবো।’

ভাষণে কমরেড চায়না বললো, এই যুদ্ধে ফেলিমোরা জিতে গেলে যোদ্ধা হিসেবে শুধু রেনামোদের নয়, আত্মীয়-স্বজন হবার অপরাধে যোদ্ধাদের মা-বাপ-ভাই-বোনকেও জ্যান্ত কবর দেবে তারা। কাজেই আত্মহুতি দিয়ে হলেও হিন্দ হেলিকপ্টারের ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়ে আসতে হবে তাদের। রেনামোদের রণসঙ্গীত গেয়ে ভাষণ শেষ করলো সে।

শনকে বললো, ‘কর্নেল কোর্টনি, আপনার সাথে একান্তে আলাপ আছে। আমার সাথে আসুন, গ্লিঙ্ক।’

ক্লডিয়া ও জোবকে কয়েকটা কাজ বুঝিয়ে দিয়ে জেনারেল চায়নার সাথে রওনা হলো শন। খেয়াল করলো না যে জেনারেলের দেহরক্ষীরা ওদের পিছু পিছু আসছে না। অ্যাক্সিয়েটোরের মুখে দাঁড়িয়ে আছে তারা, চেহারা থমথম করছে।

কমাণ্ডে বাংকারে পৌঁছলো ওরা, শনকে পথ দেখিয়ে আগারগাউণ্ডে অফিসে নিয়ে এলো জেনারেল। একজন আর্দালি চা পরিবেশন করলো ‘কি বলবেন জেনারেল?’ মগে চুমুক দিয়ে জানতে চাইলো শন।

শনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে কমরেড চায়না, সামনের ওয়াল ম্যাপটা দেখছে। ম্যাপের গায়ে রঙিন পিন আটকে ফেলিমোদের আক্রমণ দেখানো হয়েছে। শনের প্রশ্নের জবাব দিলো না সে। শনও সাথে সাথে আর কিছু বললো না।

রেডিও রুম থেকে একজন সিগন্যাল অফিসার এলো, কমরেড চায়নার হাতে একটা মেসেজ ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে। মেসেজটা পড়ার সময় বিড়বিড় করে কাকে যেনো অভিশাপ দিলো জেনারেল, ম্যাপের রঙিন কয়েকটা পিন খুলে অন্য জায়গায় বসালো। দ্রুত এগিয়ে আসছে ফেলিমোরা।

‘ওদেরকে আমরা ঠেকাতে পারছি না’, শনকে বললো জেনারেল চায়না, এখনো ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে সে।

বাংকারে আরেকজন অফিসার ঢুকলো, পরনে মেরুন রঙের বেরেট। লে জেনারেলের দেহরক্ষীদের একজন। ফিসফিস করণ কি যেনো বললো সে জেনারেলকে। শন শুধু একটা মাত্র শব্দ অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলো-আমেরিকান।

ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক করে মূঁদু হাসলো কমরেড চায়না, তারপর হাত নেড়ে বিদায় করে দিলো অফিসারকে। লোকটা বাংকার থেকে বেরিয়ে যেতে শনের দিকে ফিরলো সে।

‘এতে কাজ হবে না,’ বিড়বিড় করে বললো, তাকিয়ে আছে শনের দিকে।

‘কিসে কাজ হবে না?’

‘আপনার প্ল্যানে।’

‘যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না’, স্বীকার করলো শন। ‘তবে, আমার বিশ্বাস হামলাটা সফল হবে। শতকরা সত্তর ভাগ সম্ভাবনা হিন্দুগুলো ধ্বংস করে দিয়ে ফিরে আসবে ওরা।’

‘সফল হবার সম্ভাবনা শতকরা নব্বুই ভাগ হতে পারতো, আপনি যদি নেতৃত্ব দিতেন’, বললো জেনারেল। ‘আপনার ওপর আমার আস্থা আছে।’

‘ধন্যবাদ। কিন্তু কি হতে পারতো তা নিয়ে কথা বলে কি লাভ! আমি তো থাকছিই না। আজই আমরা রওনা হবো।’

‘না, কর্নেল। আপনাকে যেতে দিতে পারলে খুশিই হতাম, কিন্তু তা সম্ভব নয়। আক্রমণে আপনি থাকছেন, আপনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন।’

এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো শন। তারপর বললো, ‘আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন।’

‘কথা দিয়েছি?’ ঠোট টিপে হাসলো কমরেড চায়না। ‘কথা দিয়েছি তো কি হয়েছে? জানেন না, যুদ্ধে অন্যায় বলে কিছু নেই? কথা দিই, কথা ভাঙি, তো কি হলো? প্রয়োজনে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবো না?’

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লো শন, রাগে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। ‘আমি যাচ্ছি’, বললো ও, প্রচণ্ড রাগের মধ্যেও গলার আওয়াজ শান্ত রাখতে পারলো। ‘আমার লোকদের নিয়ে এই মুহূর্তে রওনা হবো। থামাতে হলে আমাকে আপনার খুন করতে হবে।’

কাটা কানটা স্পর্শ করলো জেনারেল চায়না, আবার ঠোট টিপে হাসলো। ‘আপনার উদ্বেজনা আমাকে স্পর্শ করছে না, কর্নেল কোর্টনি। আমার স্বভাবই হলো, যা বলি তাই করি। আক্রমণে আপনি নেতৃত্ব দেবেন, এর কোনো বিকল্প নেই। কি বললেন? আপনাকে খুন করতে হবে? না, আমি তা মনে করি না। আপনি স্বেচ্ছায় রাজি হবেন, কর্নেল কোর্টনি।’

‘দেখা যাক’, বলে চেয়ারটায় লাথি মারলো শন, ডিগবাজি ঝেঁতে ঝেঁতে দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেলো সেটা। দরজার কাছে এসে মাথা নিচু করলো, বেরিয়ে এলো বাইরে।

‘আপনি এখনুই আবার ফিরে আসবেন, কর্নেল কোর্টনি’, পিছন থেকে সহাস্যে বললো জেনারেল চায়না।

রোদে বেরিয়ে এসে হন হন করে আফিথিয়েটারের দিকে এগোলো শন। কাছাকাছি এসে বুঝতে পারলো, কিছু একটা ঘটেছে। টালের ওপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে শাস্কানিরা, যেনো মনে হলো শন ওদেরকে শেষবার দেখার পর কেউ

একচুল নড়েনি। আলকনসোর চেহারা হয়েছে পাখুরে মূর্তির মতো, চোখ-মুখে কোনো ভাব নেই।

অ্যাক্সিথিয়েটারের মাঝখানে টেবিলটা, সেটার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে রয়েছে জোব। তার ইউনিফর্মে ধুলো লেগে রয়েছে, মাথার ক্যাপটা পড়ে রয়েছে টেবিলের নিচে। মাথাটা ধীরে ধীরে নাড়ছে সে, যেনো আচ্ছন্ন বোধ করছে। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

‘কি হয়েছে?’ ছুটে কাছে চলে এলো শন। কয়েক সেকেন্ড চেষ্টা করার পর চোখ দুটো পুরোপুরি মেলতে পারলো জোব, দৃষ্টি ফিরে পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে বলে মনে হলো। প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে তাকে। ঠোঁট দুটো ফুলে বেচপ আকৃতি পেয়েছে, মুখের ভেতর রক্ত, লাল হয়ে আছে সব ক’টা দাঁত, ছিঁড়ে গেছে নাকের একটা ফুটো। আলুর মতো ফুলে আছে কপালটাও। ‘জোব, একি অবস্থা হয়েছে তোমার?’ নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে শনের। জোবের কাঁধ খামচে ধরলো ও। ‘কে?’

‘আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, বাওয়ানা’, বললো জোব, তারপরই ফুঁপিয়ে উঠলো সে। ‘বিশ্বাস করুন...।’

‘শান্ত হও, জোব। কি হয়েছে বলো আমাকে।’

ছোট্ট করে উচ্চারণ করলো জোব। ‘মেমসাহেব!’

বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো শনের। ‘ক্লডিয়া!’ জোবকে ছেড়ে সোজা হলো ও, উদভ্রান্তের মতো তাকালো চারদিকে। ‘কোথায় সে, জোব?’ বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠলো শনের। ‘কি ঘটেছে?’

‘ওরা তাকে নিয়ে গেছে’, বললো জোব। ‘চায়নার দেহরক্ষীরা। আমি ওদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করি...।’

কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তলটা শনের হাতে চলে এলো। ‘কোথায় সে, জোব?’

টেবিলের ওপর উঠে বসলো জোব। ‘জানি না, বস।’ আন্ত্রিন দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছলো সে। ‘আমার জ্ঞান ছিলো না, কোনো দিকে নিয়ে গেছে দেখিনি...।’

‘চায়না, বেজিয়া কুকুর, আজ তোকে মরতে হবে!’ চরকির মতো আধপাক ঘুরলো শন, কমাণ্ড বাংকারে ফিরে যাবার জন্যে তৈরি।

‘স্যার, চিন্তা করুন!’ পিছন থেকে আবেদন জানালো জোব। ছুটে গিয়েও নিজেকে সামলে রাখলো শন। ‘ঈশ্বরের দোহাই, বিপদের সময় মাথা গরম করবেন না। চিন্তা করুন, স্যারি।’

ধীরে ধীরে জোবের দিকে ফিরলো শন। তার মুখে কি যেনো খুঁজলো ও।

‘ম্যানুয়াল, স্যার!’ টেবিল থেকে ধীরে ধীরে নামলো জোব, এখনো তার মুখ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। ‘ওগুলো পুড়িয়ে ফেলুন!’

‘পুড়িয়ে ফেলবো!’ বিড়বিড় করলো শন, উপলব্ধি করলো প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছে শরীর। মাথাটা ঠাণ্ডা করা দরকার। ‘ওগুলো আমাদের বীমা, জোব! শুধু আমরা জানি!’

ব্যথায় কঁচকে থাকা চেহারা হঠাৎ নির্ভাজ হয়ে উঠলো, ফিসফিস করে বললো জোব, ‘ক্যাসেটগুলোও, স্যার।’

‘হ্যাঁ, ক্যাসেটগুলো। দাও আমাকে!’

দ্রুত হাতে অ্যাটাক ক্যাসেটগুলো কেসে ভরলো জোব। আলফনসোর সামনে এসে দাঁড়ালো শন, তার বেল্ট থেকে তুলে নিলো একটা ফসফরাস গ্রেনেডে।

ক্যাসেট ভরা কেস-এর ভেতর ফসফরাস গ্রেনেড ও পিস্তলের ল্যানিয়ার্ড-এর সাহায্যে একটা ডিভাইস তৈরি করলো শন। পিস্তল ল্যানিয়ার্ড-এর হুকটা গ্রেনেডের পিনে আটকালো, গ্রেনেডটা রাখলো কেস-এর ভেতর। কেস-এর ঢাকনির ওপর বেয়োনেটের ডগা দিয়ে একটা গর্ত তৈরি করলো, ল্যানিয়ার্ড-এর মুক্ত প্রান্তটা বেরিয়ে থাকলো গর্তের বাইরে। কেস বন্ধ করলো শন, ল্যানিয়ার্ডটা জড়িয়ে নিলো কজির সাথে। ‘চায়না চেষ্টা করে দেখুক নিতে পারে কিনা’, কর্কশ সুরে বিড়বিড় করলো ও। কেসটা যদি ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, বা যদি ফেলে দেয় ও, সাথে সাথে টান পড়বে গ্রেনেডের পিনে। শুধু যে কেসের ভেতর ক্যাসেটগুলো ধ্বংস হবে তা নয়, আশপাশে যারা থাকবে তারাও কেউ বাঁচবে না।

ইতিমধ্যে ম্যানুয়ালগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে জোব। তাকে নির্দেশ দিলো শন, ‘সব পুড়ে ছাই না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়বে না।’ ক্যাসেট ভরা কেসটা বুকের সাথে চেপে ধরে কমাণ্ড বাৎকারের উদ্দেশ্যে রওনা হলো ও।

‘বলিনি, আবার আপনাকে ফিরে আসতে হবে?’ শনকে দেখে মুচকি হাসলো জেনারেল চায়না। পরমুহূর্তে শনের হাতে কেসটা দেখে ভুরু কঁচকালো সে, হাসিটা ধীরে ধীরে মুছে গেলো চেহারা থেকে। কেসের ঢাকনিতে ফুটো, ফুটো থেকে বেরিয়ে আছে ল্যানিয়ার্ড, সবই লক্ষ্য করলো।

কেসটা তুলে কমরেড চায়নার মুখের সামনে নাড়লো শন। ‘এর ভেতর হিন্দ স্কোয়াড্রনের প্রাণ রয়েছে, চায়না’, বললো ও। ‘ক্যাসেট ছাড়া স্টিংগারগুলো মূল্যহীন, আপনার কোনো কাজেই লাগবে না।’

চট করে দরজার দিকে তাকালো জেনারেল চায়না।

‘ও-সব ভুলে যান’, বললো শন। ‘কেসের ভেতর একটা গ্রেনেড রয়েছে। ফসফরাস গ্রেনেড। ল্যানিয়ার্ডটা ফায়ারিং-পিনের সাথে আটকানো। এটা যদি আমি ফেলে দিই বা কেউ যদি আমার হাত থেকে কেড়ে নেয়, কি ঘটবে বলুন তো? গ্রেনেড ফাটলে কি ঘটে আপনার জানা আছে।’

ডেস্কের দু’দিক থেকে পরস্পরের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলো ওরা।

তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙলো জেনারেল চায়না।

‘তারমানে চালমাত, কর্নেল কোটনি?’ আবার হাসি ফুটলো তার চেহারা, আগের চেয়ে ঠাণ্ডা ও ভীতিকর লাগলো।

‘ক্লডিয়া কোথায়?’ কঠিন সুরে জানতে চাইলো শন।

গলা চড়িয়ে একজন আদালিকে ডাকলো জেনারেল। ‘মেয়েটাকে নিয়ে এসো এখানে!’

দু’জনেই আড়ষ্ট ও সতর্ক হয়ে আছে, তাকিয়ে আছে পরস্পরের চোখের দিকে।

‘ক্যাসেটের কথা মনে রাখা উচিত ছিলো আমার’, ঘরোয়া আলাপের সুরে বললো জেনারেল। ‘সত্যি, আপনার প্রশংসা করতে হয়। খুব দেখিয়েছেন। শুভ। ভেরি শুভ। বুঝতে পারছেন তো, কেন আমি চাই আপনি নেতৃত্ব দিন।’

‘আপনার আরো জানা দরকার’, বললো শন, ‘ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়ালগুলোও আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। আমরা মাত্র তিনজন-আমি, জোব ও ক্লডিয়া-স্টিংগার সম্পর্কে জানি।’

‘কেন, শাস্কিনিরা তাহলে কিসের ট্রেনিং পেলো? আলফনসো, ফার্দিনান্দ?’ চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করলো কমরেড চায়না।

নিঃশব্দে হাসলো শন। ‘কোনো লাভ নেই, চায়না। ওরা শুধু মিসাইল ছুঁড়তে জানে, কিন্তু মাইক্রো প্রসেসর কিভাবে প্রোগ্রাম করতে হয় সে-সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখেনা। আমাদেরকে আপনার দরকার, কান-কাটা জেনারেল। আমরা না থাকলে হিন্দ গানশিপ অনবরত আসতে থাকবে, পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া আপনার কিছু করার থাকবে না। কাজেই আমার সাথে লাগতে আসবেন না। আপনার অস্তিত্ব আমার হাতের মুঠোয়।’

পায়ের আওয়াজ পেলো শন। রেডিও রুম থেকে কারা যেনো পাশের রুমে চলে এলো। দরজার দিকে তাকালো ও। ক্লডিয়াকে দেখা গেলো, পিছন থেকে কেউ ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকালো তাকে।

আবার তার হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরানো হয়েছে। মাথায় ক্যাপটা নেই, মুখ আর ঘাড় ঢাকা পড়ে আছে এলোমেলো চুলে। তার দু’পাশে দু’জন গার্ড এসে দাঁড়ালো।

‘শন!’ ওকে দেখেই ছুটে আসতে চেষ্টা করলো ক্লডিয়া। গার্ড দু’জন ধরে রাখলো তাকে। ধস্তাধস্তি শুরু করলো ক্লডিয়া। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দেয়ালের গায়ে ফেলা হলো তাকে, চেপে ধরে রাখা হলো।

‘আপনার কুস্তাগুলোকে বলুন ওকে যেনো ছেড়ে দেয়’, হিসহিস করলো শন। কুস্তা বলায় প্রচণ্ড রাগের সাথে শনের দিকে তাকালো গার্ড দু’জন।

কমরেড চায়না নির্দেশ দিলো, ‘মেয়েটাকে চেয়ারে বসাও।’

জোর করে টেনে আনা হলো ক্লডিয়াকে, খালি একটা চেয়ারে বসানো হলো। আবার নির্দেশ দিলো জেনারেল চায়না, চেয়ারের হাতলের সাথে হ্যাণ্ডকাফ আটকে দেয়া হলো।

‘আশনার অত্যন্ত প্রিয় একটা জিনিস আমার হাতে রয়েছে, আর আমার একটা অত্যন্ত দরকারী জিনিস আপনার হাতে রয়েছে’, বললো জেনারেল চায়না। ‘আমরা কি একটা চুক্তিতে আসতে পারি না, কর্নেল কোর্টনি?’

‘আমাদের যেতে দিন’, সাথে সাথে বললো শন। ‘সীমান্তে পৌঁছে ক্যাসেটগুলো হস্তান্তর করবো।’

মাথা নাড়লো কমরেড চায়না। ‘আপনার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। আমার পাল্টা প্রস্তাবটা শুনুন। হিন্দু যাঁটি আক্রমণে আপনি নেতৃত্ব দেবেন। অপারেশন পুরোপুরি সফল হবার পর আলফনসো আপনাকে সীমান্তে পৌঁছে দেবে।’

গ্রেনেড ভরা কেসটা মাথা কাছাকাছি তুলে দেখালো শন।

জবাবে হাসলো কমরেড চায়না। বেলেট আটকানো খাপ থেকে একটা ছুরি বের করলো সে। ব্লেন্ডটা পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, হাতলটা আইভরির। হাসতে হাসতেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো সে, হাত বাড়িয়ে ক্লডিয়ার খুলি থেকে এক গোছা চুল কেটে চুল কেটে নিলো। কাটা চুলগুলো ছড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। ‘কি রকম ধার, বুঝতে পারছেন?’ নরমসুরে জিজ্ঞেস করলো সে।

‘ক্লডিয়া খুন হলে গ্রেনেডটা আমি ফাটিয়ে দেবো’, হুমকি দিলো শন, উত্তেজনা কর্কশ শোনালা ওর গলা। ‘ও না থাকলে দর কষার কিছু থাকবে না আপনার।’

‘দর কষার জন্যে আরেকটা জিনিস আছে আমার’, উত্তর দিলো কমরেড চায়না, দরজায় দাঁড়ানো গার্ডের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালো সে।

বাংকারের ভেতর একজনকে নিয়ে এলো ওরা, আগে তাকে কখনো দেখেনি শন। ভৌতিক একটা কাঠামো, ঘাড়ের ওপর ওটা মাথা নয়, যেনো শুধুই খুলি। ঠোঁটগুলো কুঁকড়ে গেছে, অদৃশ্য হয়েছে মুখের ভেতর, ফলে বাইরে বেরিয়ে আছে বড় বড় দাঁত। ভালো করে তাকালে শন দেখলো, খুলির ওপর যেগুলোকে চুল বলে মনে হচ্ছিলো সেগুলো আসলে চকচকে ঘা।

চায়নার নির্দেশে ভৌতিক কাঠামোর গা থেকে ছেঁড়া কম্বলটা টেনে নিলো গার্ড। শুধু ওই কম্বলটাই আঁক রক্ষা করছিল। পুরোপুরি উলঙ্গ হয়ে পড়লো কম্বলটা। এতোক্ষণে বুঝতে পারলো শন, একটা মেয়েমানুষের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও।

মেয়েলোকটা শনকে একটা হরর ফিল্মের কথা মনে করিয়ে দিলো। মানুষ বলে মনে হয় না— লোলচর্মসর্বস্ব কয়েকটা হাড়। পাজরে বুকে আছে শুকনো স্তন, তলপেটটা ভেতর দিকে এতো বেশি ডেবে আছে যে নিচের দিকটায় হাড় ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হলো না। তার হাতে বা পায়ে কোনো মাংস নেই, শরীরের তুলনায় অনেক বড় লাগলো হাঁটু, ও কনুই।

শন ও ক্লডিয়া, দু’জনেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। আতঙ্কে কথা বলতে পারলো না।

‘ওর তলপেটটা ভালো করে দেখুন। কি ওগুলো?’ সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো জেনারেল চায়না।

চামড়ার নিচে থেকে উঁচু হয়ে আছে ওগুলো। কালো, পাকা আঙুরের মতো, শক্ত ও চকচকে। দু’চারটে নয়, অনেকগুলো, আর ঘন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নিচের দিকে।

মর্মবিদারক দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, হঠাৎ কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ছুরি ধরা হাতটা লম্বা করলো কমরেড চায়না, ব্রেডের ডগা দিয়ে ক্লডিয়ার হাতের উল্টোপিঠে খোঁচা মারলো। আঁতকে উঠে হাতটা সরিয়ে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলো ক্লডিয়া। চেয়ারের হাতলের সাথে আটকে আছে হ্যাণ্ডকাফ। খোঁচা লাগা চামড়া থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে, কড়ে আঙুলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়, সেদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকলো ক্লডিয়া।

‘ইউ বাস্টার্ড!’ দাঁতে দাঁত চাপলো শন। ‘ওকে খোঁচা মারলেন কেন?’

‘ভয় পাবার মতো এখনো কিছু ঘটেনি’, মৃদু হেসে ওদেরকে আশ্বস্ত করলো জেনারেল চায়না। ‘সামান্য একটু খোঁচাই তো! ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, কালো মেয়েলোকটার কঙ্কালের দিকে হাত বাড়ালো সে, ছুরির ডগাটা তাক করলো ভেতর দিকে ডেবে থাকা তলপেটের দিকে। ‘শরীরের এই অস্বাভাবিক ক্ষয় ও অতি পরিচিত অঙ্গ-বিকৃতি, বলুন তো, কিসের লক্ষণ?’ শনের দিকে মুখে তুলে হাসলো সে। ‘মেয়েলোকটা ভুগছে...আমরা আফ্রিকার যেটাকে বলি, স্লিম সিকনেসে।’

‘এইডস!’ ফিসফিস করলো ক্লডিয়া, গলা শুনে মনে হলো কেঁদে ফেলবে সে। নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেলো শন।

‘ঠিক ধরেছেন, মিস মনটেরো’, সায় দিলো জেনারেল চায়না। ‘এইডস রোগের সর্বশেষ অবস্থা।’

টোক গিললো শন। ক্লডিয়ার ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ শুনেও তাকাতে পারলো না।

ছুরির ডগা দিয়ে তলপেটে উঁচু হয়ে থাকা একটা ক্ষতে খোঁচা দিলো কমরেড চায়না। খুলে গেলো ক্ষতটা, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই কঙ্কালের। ক্ষতটা থেকে পুঁজ আর বিবর্ণ রক্ত বেরিয়ে এলো।

‘রক্ত’, ফিসফিস করলো কমরেড চায়না, ছুরির ডগায় পুঁজ আর রক্ত মাখালো সে। ‘গরম রক্ত, গিজগিজ করছে ভাইরাস।’ শনকে দেখাবার জন্যে ছুরির ডগাটা ওর মুখের সামনে দোলালো সে। ডগা থেকে রক্ত ঝরছে, আরো এক পা পিছু হটলো শন।

অপর হাতে ক্লডিয়ার কজি ধরলো জেনারেল চায়না। ‘মিস মনটেরোর রক্তের সাথে তুলনা করুন। তার রক্ত সুস্থ, নীরোগ একটা মানুষের রক্ত। সুন্দরীর তাজা, ভাইরাসমুক্ত রক্ত।’

ক্লডিয়ার হাতে উল্টোপিঠে ক্ষতটা টকটকে লার হয়ে আছে, এখনো অল্প অল্প রক্ত বের হচ্ছে।

‘রক্তের সাথে রক্ত’, আবার ফিসফিস করলো কমরেড চায়না। ‘ভালো রক্তের সাথে খারাপ রক্ত।’

রক্তমাখা ছুরির ডগাটা ক্লডিয়ার কজির কাছাকাছি আনলো সে, আতঙ্কে শুঙিয়ে উঠলো ক্লডিয়া, হাতটা সরিয়ে নেয়ার জন্যে মোচড়াতে শুরু করলো, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ছুরির দিকে।

‘রক্তের সাথে রক্ত’, বললো চায়না, ‘মেশাবো। মেশাবো কি?’ চোখে প্রশ্ন নিয়ে শনের দিকে তাকালো সে।

বোবা হয়ে গেছে শন, গলা থেকে কোনো আওয়াজ বেরলো না। নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়লো, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ছুরির ওপর।

‘মেশাবো কি, কর্নেল?’ আবার জিজ্ঞেস করলো কমরেড চায়না। ‘ব্যাপারটা এখন আপনার ওপর নির্ভর করছে’, ক্ষতের আরো কাছাকাছি আনলো ছুরির ডগা।

শনের ঠোঁট কাঁপছে।

‘আর এক ইঞ্চি, কর্নেল কোর্টনি’, বললো চায়না, পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করলো ক্লডিয়া। আতঙ্কে পাগল হয়ে যাচ্ছে সে।

ক্লডিয়া হঠাৎ চিৎকার করলেও কমরেড চায়না চমকালো না। ক্লডিয়ার মুখের দিকে তাকালোই না সে। তাকিয়ে আছে ছুরির দিকে। ছুরি ধরা হাতটা স্থির, একটুও কাঁপলো না। ‘এতো সময় নিচ্ছেন কেন, কর্নেল কোর্টনি? বলুন, কি করবো?’

শনের মুখে কথা নেই।

ছুরির পাতটা ক্লডিয়ার কজিতে ঠেকালো চায়না, ক্ষত থেকে এক ইঞ্চি দূরে চামড়ায় মেঘে গেলো দূষিত রক্ত। এরপর ছুরির ডগাটা ক্ষতের দিকে নিয়ে এলো সে, এক চুল এক চুল করে।

‘কথা বলুন, কর্নেল কোর্টনি। হ্যাঁ বা না কিছু একটা বলুন’, খোলা ক্ষতের দিকে এগোচ্ছে ছুরির ডগা।

‘স্টপ ইট!’ রুদ্ধশ্বাসে বললো শন। ‘স্টপ ইট!’

ছুরির ডগাটা তুলে নিলো কমরেড চায়না, চোখে কৌতূহল ও প্রশ্ন, শনের দিকে তাকালো। ‘এর মানে কি আমরা একটা চুক্তিতে পৌঁছেছি?’

‘ইয়েস’, বললো শন, দরদর করে ঘামছে ও। ‘ইয়েস, ইউ বাস্টার্ড!’

রক্তমাখা ছুরিটা বাংকারের এক কোণে ছুঁড়ে দিলো জেনারেল চায়না। ডেস্কের দেরাজ খুলে অ্যান্টিসেপটিক ডেটলের একটা শিশি বের করলো সে। ডেটল দিয়ে নিজের রুমালটা ভেজালো, ভিজ়ে রুমাল দিয়ে ক্লডিয়ার হাত থেকে দূষিত রক্ত মুছে দিলো।

ক্রুডিয়ার শরীর নেতিয়ে পড়েছে চেয়ারে, হাঁপাচ্ছে সে, কাঁপছে থরথর করে।

‘গুর হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিন’, বেসুরো গলায় বললো শন।

মাথা নাড়লো জেনারেল। ‘চুক্তিটা পাকা হবার আগে নয়।’

‘ঠিক আছে’, বললো শন। ‘আমার প্রথম শর্ত, ক্রুডিয়া আমার সাথে যাবে। ছুঁচোর সাথে কোনো গর্তের ভেতর থাকবে না ও।’

কমরেড চায়না শর্তটা বিবেচনা করার ভান করলো, তারপর বললো, ‘বেশ। কিন্তু আমার পাল্টা শর্ত হলো, আপনি যদি কোনোভাবে আমাকে হতাশ করেন, সাথে সাথে আলফনসো মিস মনটেরোকে খুন করবে।’

‘আলফনসোকে ডেকে পাঠান’, বললো শন। এখনো গুর কপালের ঘাম শুকায়নি, এখনো কর্কশ আর বেসুরো শোনাচ্ছে গলার আওয়াজ। ‘তাকে আপনি কি নির্দেশ দেন শুনতে চাই আমি।’

নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা চেহারা আলফনসোর, শিরদাঁড়া ঝাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করার পর জেনারেল তাকে বললো, ‘আক্রমণটা যদি ব্যর্থ হয়, হিন্দ ঘাঁটিতে তোমরা পৌঁছানোর আগেই যদি ফেলিমোরা তোমার বাধা দেয়, কিংবা যদি কোনো হিন্দ গানশিপ পালিয়ে যায়...।’

বাধা দিলো শন, ‘না, থামুন! শতকরা একশো ভাগ সাফল্য আপনি আশা করতে পারেন না। সব মিলিয়ে আমি যদি ছ’টা হিন্দ ধ্বংস করতে পারি তাহলে ধরে নিতে হবে আমার মিশন সফল হয়েছে।’

ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়লো কমরেড চায়না। ‘ছ’টা ধ্বংস হলে আরো ছ’টা থেকে যাবে, তারমানে আমাদের অস্তিত্ব এখনকার মতোই হুমকির মুখে থাকবে। না, আপনি বড়জোর একজোড়া হিন্দকে পালিয়ে যেতে দেবেন। যদি দুটোর বেশি হিন্দ পালিয়ে যায় বা সচল থাকে, ধরে নেয়া হবে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন, তার মূল্যও আপনাকে দিতে হবে’, আলফনসোর দিকে ফিরলো সে। ‘তুমি, সার্জেন্ট আলফনসো, কর্নেলের সমস্ত নির্দেশ মেনে চলবে। কিন্তু তিনি যদি ব্যর্থ হন, যদি দুটোর বেশি হিন্দ পালায়, নিজের হাতে নেতৃত্ব তুলে নেবে তুমি। লিডার হওয়ার পর তোমার প্রথম কাজ হবে কর্নেল কোর্টনি ও মিস মনটেরোকে গুলি করে মারা। ওদের কালো চাকরটাকেও বাদ দেবে না। গুলি করবে কোনো রকম সময় নষ্ট না করে।’

নির্দেশ শুনে মাথা ঝাঁকালো সার্জেন্ট আলফনসো। চোখ দুটো ঢুলঢুলু হয়ে আছে তার, যেনো ঘুম পেয়েছে। ভুলেও শনের দিকে তাকালো না সে। শন উপলব্ধি করলো, লোকটা সাথে তার সম্পর্ক যতো ভালোই হোক, ব্যর্থ হলে ওকে ঠিকই গুলি করবে সে, চোখের পাতা একটুও কাঁপবে না। কারণটাও বুঝতে পারলো। কমরেড চায়না একজন শাস্ত্রানি, শাস্ত্রনিদের সর্দার-আদিবাসীদের ঐতিহ্য অনুসারে সর্দারের নির্দেশ অমান্য করা মহা পাপ। গলা চড়ালো শন, ‘ঠিক আছে

চায়না-কার কি পজিশন বুঝতে পারছি আমরা। এবার ক্লুডিয়াকে আমার কাছে আসতে দাও।’

দেহরক্ষীরা ক্লুডিয়ার হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিলো, তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো জেনারেল চায়না, বললো, ‘এই কষ্টটুকু দিতে হলো বলে সত্যি আমি দুঃখিত, মিস মনটেরো। আশা করি আপনি বুঝবেন, আমার কোনো উপায় ছিলো না।’

ক্লুডিয়া টলছে। কয়েক পা এগিয়ে শনকে আঁকড়ে ধরলো সে। বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে শন ও ক্লুডিয়াকে স্যালুট করলো কমরেড চায়না।

‘আপনাদের সাফল্য কামনা করি আমি, কর্নেল কোর্টনি’, বললো সে। ‘যাই ঘটুক না কেন, আমাদের আর দেখা হচ্ছে না।’

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না শন। এক হাতে ক্যাসেট ভরা কেস, অপর হাতটা ক্লুডিয়ার কাঁধের ওপর, ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোলো ও।

\* \* \*

হাতে প্রায় দু'ঘন্টা দিনের আলো নিয়ে রওনা হলো ওরা। বেটপ আকৃতির একটা মিছিল, মিসাইল-লঞ্চর ও ব্যাক-আপ মিসাইলগুলো বিদঘুটে বোঝা হয়ে চেপে থাকলো ঘাড়; অসম্ভব ভারি তো বটেই, বোঝার অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যও আড়ষ্ট করে তুললো ওদেরকে, পথ ক্রমশ সরু হয়ে এলে দু'পাশের ঘন ঝোপে বার বার আটকে গেলো, বিপদ বা হুমকি দেখা দিলে দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না।

এক লাইনে এগোচ্ছে ওরা, সবাইকে কাছাকাছি থাকার নির্দেশ দিয়েছে শন কোর্টনি। রেনামো সেনাবাহিনীর ফ্রন্ট-লাইন এখনো কয়েক মাইল সামনে, পদযাত্রার শুরুতে গুরুতর কোনো বিপদের ভয় নেই, তবু মিছিলের সামনে ও পিছনে অ্যাসল্ট ট্রিপসের সতর্ক পাহারা রেখেছে শন, আকস্মিক অ্যামবুশের মধ্যে পড়লে মিসাইল বাহকরা যাতে আত্মরক্ষার সুযোগ পায়। নিশ্চিত হবার কোথাও বিপদ দেখা দিলে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারবে, আবার ক্রুডিয়ার কাছাকাছিও থাকা হলো।

‘মাতাউ কোথায়?’ শনকে জিজ্ঞেস করলো ক্রুডিয়া। ‘লুকিয়ে ছিলো ও, ওকে কিছু না জানিয়ে এভাবে রওনা হওয়া কি উচিত হয়েছে? চিন্তা হচ্ছে আমার।’

‘মাতাউর জন্যে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে’, মৃদু হেসে বললো শন। ‘জানানো হোক বা না হোক, আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবে ও। দেখো, ইয়তো পাশের ঝোপ থেকে নজর রাখছে আমাদের ওপর।

শনের নির্দেশে নতুন একটা ঝাঁকের আকৃতি পেলো দলটা। এদিকেই এগিয়ে আসছে ফ্রেলিমো গেরিলারা, তাদের পিছনে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে।

যুদ্ধটা হচ্ছে ওদের সামনে। ফ্রেলিমো ও জিম্বাবুইয়ান সৈন্যরা সংখ্যায় ছ'হাজার, তিন হাজারেরও কম রেনামো সৈন্যের বাধা পেরিয়ে এগিয়ে আসছে তারা, রণক্ষেত্রের বিস্তৃতি দশ হাজার বর্গমাইলের মতো। ওদের সামনে যুদ্ধ হচ্ছে এখানে সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে, বাকি এলাকা দুর্গম বা পরিত্যক্ত। মাতাউ ও জোবকে পাঠালো শন বড় একটা ফাঁক খুঁজে বের করার জন্যে, যেটার ভেতর দিয়ে গরে রণক্ষেত্রের পিছনে পৌঁছুতে পারবে দলটা। বাকি সবাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওদের দু'জনকে অনুসরণ করলো, সতর্ক পাহারায় থাকলো শাস্তানি অ্যাসল্ট টিম।

সারারাত হাঁটার মধ্যে থাকলো ওরা, দিক পরিবর্তনের বা ঘুরপথ ধরার প্রয়োজন দেখা দিলে মিছিলের মাথায় ফিরে এলো জোব। খানিক পর পর দূর থেকে ভেসে এলো মর্টার ও হেভি মেশিনগানের আওয়াজ, বোঝা গেলো রেনামো ডিফেন্স-এর সামনে পড়ে গেছে ফ্রেলিমো গেরিলারা। অন্ধকার বনভূমির মাথার ওপর ফ্লোর জ্বলে উঠতেও দেখলো ওরা। তবে হেলিকপ্টার রোটরের কোনো আওয়াজ পেলো না। শন অনুমান করলো, ফ্রেলিমোরা শুধু দিনের বেলা হিন্দ

গানশিপ ব্যবহার করছে, কারণ রাতের অন্ধকারে কে শত্রু কে মিত্র বোঝার কোনো উপায় নেই।

ভোর হবার এক ঘন্টা আগে শনের ঝোঁজে মিছিলের মাঝখানে চলে এলে জোব। ‘আলো ফোটান একঘন্টার মধ্যেও আমরা আমাদের প্রথম অবজেকটিভে পৌঁছতে পারবো না। ঘুরপথ ধরে আসতে হয়েছে, তেমন এগোতে পারিনি। এখন কি করতে বলেন আপনি? দিনের আলোয় হিন্দ দেখে ফেলতে পারে। আমরা কি ঝুঁকিটা নেবো?’

জবাব দেয়ার আগে আকাশের দিকে তাকালো শন। ভোরের প্রথম আভাস, স্নান হয়ে যাচ্ছে তারাগুলো। ‘মাথার ওপর ডালপালা কম। এতো লোক, এতো ইকুইপমেন্ট লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। না, আমরা থামবো না। থামবো লুকোবার জায়গায় পৌঁছে। মাতাউকে আরো জোরে হাঁটতে বলো।’

‘কিন্তু হিন্দ?’

‘মূল যুদ্ধটাকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছি আমরা’, বললো শন। ‘হিন্দগুলো এখন সেদিকেই যাবে, কাজেই ঝুঁকিটা নিতে পারি। তবে জোরে হাঁটো।’

ভোরের আলো যতো বাড়লো, ততোই শুকিয়ে গেলো রেনামোদের মুখ, ঘন ঘন মুখ তুলে তাকালো আকাশে। দ্রুত এগোচ্ছে ওরা, প্রায় ছুটছে। সারাটা রাত বিশ্রাম পায়নি কেউ, তবু ভারি বোঝা নিয়ে শাস্ত্রানিরা এখনো তাগড়া ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে এগোচ্ছে, এতোটুকু ক্লান্ত হয়নি। ভোরের আলোয় যখন গাছের মগডাল দেখা যাচ্ছে, তখনই প্রথম টার্বোর আওয়াজ পেলো শন, দূর থেকে ভেসে আসছে, সরে যাচ্ছে, তখনই প্রথম টার্বোর আওয়াজ পেলো শন, দূর থেকে ভেসে আসছে সরে যাচ্ছে পূর্ব দিকে। দিনের প্রথম অভিযানে বেরিয়েছে হিন্দ গানশিপ। মিছিলের মাথা ও লেজ থেকে চিৎকার করলো অ্যাসল্ট টিমের সদস্যরা, সতর্ক করে দিলো সবাইকে। পথ থেকে চোখের পলকে সরে গেলো পোর্টাররা, খুঁজে নিলো সবচেয়ে কাছের আড়ালটা। সেকশন লিডাররা কুঁজো হলো, ফ্রেন্ডমোদের পতাকা বের করে মাথার ওপর নাড়ার জন্যে তৈরি। শনই ওগুলো সরবরাহ করেছে, হিন্দের গানার ওদেরকে দেখতে পেয়ে শেল ছুঁড়তে এলে ব্যবহার করা হবে।

দু’ মাইল দূর দিয়ে চলে গেলো একজোড়া হিন্দ, কাছাকাছি এলো না। কয়েক মিনিট পর গাটলিং-ক্যাননের গোলা ও অ্যাসল্ট রকেট বিস্ফোরিত হলো, শব্দগুলোকে আলাদাভাবে চিনতে পারলো ওরা। ওদের অনেক পিছনে রেনামোদের একটা ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে।

এরপর ওদের হাঁটার গতি আরো বেড়ে গেলো। এক ঘন্টা পর মিছিলের লেজটা প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে এলো একটা খাদে। খাদের তলায় শুকনো একটা নদী, দু’পাশে পাথুরে গুহা-এই গুহার ভেতরই ইউনিমগ ট্রাকগুলোকে লুকিয়ে রেখেছিল রেনামোরা।

গুহায় ঢুকে হাঁফ ছাড়লো সবাই, যে-যার বোঝা নামিয়ে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। ‘আশুন জ্বালা নিষেধ’, নির্দেশ দিলো শন। ‘কেউ সিগারেট খাবে না।’

ভুটার ঠাণ্ডা কেক ও শুকনো মাছ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো রেনামোরা। গুহার পিছনে ক্লডিয়ান্নর জন্যে নিরিবিলা একটা জায়গা পেলো শন, পাথরের উঁচু স্তূপ আড়াল করে রেখেছে। মেঝেতে একটা কম্বল বিছালো ও। বসলো ক্লডিয়া, পা লম্বা করে দিয়ে একটার ওপর অপরটা তুলে দিলো, স্বাদহীন খাবার মুখে নিয়ে ধীরে ধীরে চিবচ্ছে। অর্ধেকটাও খাওয়া হয়নি, কাত হয়ে একদিকে ঢলে পড়লো সে, মাথাটা মেঝেতে ঠেকার আগেই ঘুমিয়ে পড়ছে। তার গলা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে দিলো শন, তারপর দাঁড়ালো।

ছোট্ট, পোর্টেবল টু-ওয়ে রেডিওর অ্যান্টেনা লম্বা করলো আলফনসো। আওয়াজ কমালো, কান পেতে যুদ্ধের খবর শুনছে। রেনামো ফিল্ড কমান্ডাররা জেনারেল চায়নার হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। শনকে দেখে গম্ভীর হলো আলফনসো, বললো, ‘খারাপ খবর। কাল দুপুরের মধ্যে নদীর কিনারায় পৌঁছে যাবে ফ্রেলিমোরা। জেনারেল চায়না যদি পিছু না হটেন, খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে তাঁর হেডকোয়ার্টার....।’ ওদের কল সাইন শুনতে পেয়ে চুপ করে গেলো সে।

‘লোহার মুগুর’, শাস্ত্রানি ভাষায় ডাকা হলো আলফনসোকে। ‘এখানে আমি রণহংকার।’

হাণ্ডমাইকটা মুখের সামনে তুলে আলফনসো বললো, ‘রণহংকার, এখানে আমি লোহার মুগুর। কালো বাতাস।’ কালো বাতাস একটা কোড, মানে হলো ওদের প্রথম গন্তব্যে ওরা নিরাপদেই পৌঁছেছে।

আলফনসো ওকে জানালো, এরপর আবার যোগাযোগ হবে কাল সকালে, ততক্ষণে ওদের ভাগ্যে যা ঘটান ঘটে যাবে, ভালো হোক বা মন্দ হোক।

আলফনসোকে পিছনে রেখে গুহার মুখে এসে দাঁড়ালো শন। জোবের নেতৃত্বে পাঁচজন লোক নদীর বালিময় শুকনো তলা কাঁটাবোপের ঝাঁটা দিয়ে ঝাড়ু দিচ্ছে, মুছে ফেলছে ওদের পায়ের চিহ্ন। খানিক পর ঢাল বেয়ে গুহামুখে উঠে এলো জোব। শন জানতে চাইলো, ‘পাহারা?’

‘পাহাড়ের দু’মাথায়’, হাত তুলে ওদের মাথার ওপর চূড়াগুলো দেখালো জোব। ‘খাদে নামার সবগুলো পথ কাতার দেয়া হচ্ছে।’

‘গুড’, জোবকে নিয়ে গুহার ভেতর ঢুকলো শন। ‘এসো, স্টিংগারগুলো তৈরি করি।’

লঞ্চরগুলো জোড়া লাগাতে প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেলো। দ্রুত হাতে ব্যাটারি-প্যাকে সংযোগ দিলো ওরা, মাইক্রো কমপিউটারের কনসোলে ক্যাসেট ঢোকালো। প্রতিটি লঞ্চর পুরোপুরি আর্মড হলো, প্রেছাম করা হলো ‘টু কালার’ অ্যাটাকি

সিকোয়েন্স-এ, টার্গেট হিন্দ গানশিপ। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে শন বললো, 'কিচুক্ষন ঘুমানো যায়।' বললো বটে, তবে দু'জনের কেউই নড়লো না। তার বদলে, যেনো পরস্পরের সম্মতি নিয়ে, গুহার সামনের দিকে সরে এলো ওরা, সবার কাছ থেকে দূরে, নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো নদীর গুহকনো তলার দিকে। সকালের রোদ লেগে নদীর বালি মিহি তুষারকণার মতো চিকচিক করছে।

পুরানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করলো ওরা। বারবার ফিরে এলো যুদ্ধ প্রসঙ্গ। জিম্বাবুইয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে ওরা, পরস্পরকে কাতার দিয়েছে, একজনের বিপদে অপরজন ঝুঁকি নিয়েছে মৃত্যুর। শনকে 'বাওয়ানা' বলে সম্বোধন করলেও, জোব আসলে ওর বন্ধুর মতো। জিম্বাবুই স্বাধীন হবার পর কনসেশন ভাড়া করলো শন, শিকারের শখ মেটানো ও গা ঢাকা দেয়ার একটা জায়গা সংরক্ষিত রাখাই ছিলো লক্ষ্য, সেনাবাহিনী থেকে নাম কাটিয়ে ওর কনসেশনে যোগ দিলো জোব, কারণ শনকে ভালোবাসে সে।

'তোমাকে আমি একটা কঠিন দায়িত্ব দিতে চাই', হঠাৎ অতীত থেকে বাস্তবে ফিরে এসে বললো শন, থমথম করছে চেহারা। 'তোমার ওপর আমার আস্থা আছে, জানি তুমি আমাকে হতাশ করবে না।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো জোব। কোনো প্রশ্ন করলো না।

শনের গলা নরম হয়ে এলো, প্রায় ফিসফিস করে কথা বলেছে, 'হেলিকপ্টার ঘাঁটিতে কঠিন যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে আমি মারা যেতে পারি, শত্রুদের হাতে ধরা পড়তে পারে ক্লডিয়া। কিন্তু আমি চাই না ফেলিমোরা ওকে ধরুক। এ-ব্যাপারেই তোমার সাহায্য দরকার আমার, তখন যদি আমি উপস্থিত না থাকি।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেলো জোবের, যেনো বুঝে ফেলেছে শন কি বলতে চায়। 'এ-ধরনের আশঙ্কা সম্পর্কে আমি চিন্তা করতে চাই না।'

'উপরকারটা করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো শন। 'পরিষ্কার উত্তর পেতে হবে আমাকে।'

'আপনার কোনো নির্দেশ আমি কখনো অমান্য করিনি', বিড়বিড় করেন বললো জোব।

'কি করতে হবে তুমি জানো', বললো শন। 'কথা দাও।'

এক সেকেণ্ড পর নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো জোব, তারপর বললো 'কথা দিলাম।'

'কাজটা যদি করতেই হয়, ক্লডিয়াকে টের পেতে দিয়ো না, কোনো কথা বলবে না, হঠাৎ সারবে।'

'ক্লডিয়া ডোন' না জানবে না কি ঘটতে যাচ্ছে', প্রতিশ্রুতি দিলো জোব। 'বা কি ঘটলো।'

‘ধন্যবাদ’, বলে জোবের কাঁধ চাপড়ে দিলো শন। ‘এবার আমরা খানিক বিশ্রাম নিতে পারি।’

এখনো ঘুমিয়ে আছে ক্লডিয়া, এতো নিঃশ্বাস ফেলছে যে ভয় পেয়ে গেলো শন, মুখটা তার নাকের সামনে নামিয়ে নিঃশ্বাসের স্পর্শ নিলো, তারপর কপালে চুমো খেলো আলতোভাবে। ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কি যেনো বললো ক্লডিয়া, ওর নাগাল পাবার জন্যে হাতড়ালো, আলিঙ্গনের মধ্যে শনকে পেয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে শনের ঘুম ভাঙালো জোব। ‘সময় হয়েছে।’

ক্লডিয়ার বাহুবন্ধন থেকে সাবধানে নিজেকে মুক্ত করলো শন।

গুহামুখে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা। মাতাউ ও আলফনসোর সাথে সেকশন লিডাররা রয়েছে। চুপিসারে দ্রুত এগোবার জন্যে হালকা স্ত্র নিয়েছে সবাই। ‘চারটে বাজে’, বললো জোব। নদীর শুকনো বুক থেকে সরে গেছে ব্রোদ, ঢালের গায়ে লম্বা ছায়া পড়েছে গাছপালার। ‘আবার দেখা হবে’, বিড়বিড় করলো জোব। প্যাক-এর স্ট্র্যাপ লাগাচ্ছে শন, একবার গুধু মাথা ঝাঁকালো।

ভূতের মতো নাচতে নাচতে এগোলো মাতাউ, গুহা থেকে বেরিয়ে তার পিছু নিলো দলটা, ঢুকে পড়লো জঙ্গলে, ছুটন্ত একটা ঝাঁকের আকৃতি, যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে।

দু’বার হিন্দের শব্দ পেলো ওরা, ভেসে এলো অনেকটা দূর থেকে। মাত্র একবারই গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিতে হলো ওদেরকে, একটা হিন্দ মাথার ওপর চলে আসায়। চোখে বাইনোকুলার তুলে চার হাজার ফুট ওপর দিয়ে তীরবেগে গুটাকে ছুটে যেতে দেখলো শন, ফুয়েল নেয়ার জন্যে আন্তানায় ফিরে যাচ্ছে, মিসাইল ব্যাক ঝালি।

মাতাউ ওদেরকে যদিকে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেদিকেই চলে গেলো হিন্দটা। চোখ থেকে বাইনোকুলার না নামিয়ে গুটার দিকে তাকিয়ে থাকলো শন, লক্ষ্য রাখলো কোথায় নামে। ‘পাঁচ মাইল সামনে’, আন্দাজ করলো ও, আড়চোখে তাকালো মাতাউর দিকে-ওর মুখ থেকে প্রশংসা শোনার জন্যে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে।

‘ধন্যবাদ, মাতাউ।’

‘ঠিক যেনো একটা মৌমাছি, মৌচাকে ফিরে যাচ্ছে।’

‘শকুনের চোখ তোমার, সবই দেখতে পাও।’

আনন্দে মাটিতে গড়াগড়ি খেলো মাতাউ।

আধঘন্টা পর হামাগুড়ি দিয়ে ছোটো একটা পাথুরে পাহাড়ের চূড়া পেরুলো ওরা, আকাশের গায়ে ওদেরকে যাতে দেখা না যায়, খানিকটা নেমে এসে থামলো

ঢালের গায়ে। চোখে বাইনোকুলার তুললো শন, ক্যাপটা তেরছাতাবে পরলো মাথায়, লেন্স আড়াল করার জন্যে। লেন্সে রোদ লাগলে শক্রপক্ষ ওদের উপস্থিতি জেনে ফেলবে।

রেললাইনটা সাথে সাথে ধরা পড়লো চোখে, দু'মাইল দূরেও নয়। বিকেলের রোদে জোড়া লাইন চকচক করছে। লাইন ধরে আরো মাইলখানেক এগোলো শনের দৃষ্টি, স্থির হলো একজোড়া রেলওয়ে ট্যাংকারের ওপর। ঝোপ ও গাছপালার আড়ালে আংশিক ঢাকা পড়ে আছে ওগুলো। কয়েক মিনিট পর জঙ্গল থেকে ধুলোর মেঘ মাখাচাড়া দিলো, মেঠো পথ ধরে বেরিয়ে এলো একটা ফুয়েল ট্যাংকার, থামলো রেলওয়ে ট্যাংকারের পাশে। ওভার-অল পরা কর্মীরা দুই ট্যাংকারের মধ্যে হোস পাইপের সংযোগ দিলো।

ফুয়েল ট্যাংকারে তেল ভরা হচ্ছে, এই সময় অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে রেল স্টেশনের সামনের পাহাড়ের ঢাল থেকে আকাশে উঠে এলো একটা হিন্দ গানশিপ। দিনের আলো ফুরোবার আগে আরেকবার রণক্ষেত্র থেকে ঘুরে আসতে চায়।

ঠিক কোনো দিকটায় খুঁজতে হবে জানার পর বালির বস্তা দিয়ে সযত্নে আড়াল করা গান এমপ্লেসমেন্টগুলো আবিষ্কার করা সহজ হয়ে গেলো শনের জন্যে। মোট ছ'টা গুনলো ও, সব ক'টা পাহাড়টার ঢালে। 'ছ'টা', মাতাউকে বললো ও।

'আটটা', শনের ভুল ধরলো মাতাউ, লুকানো এমপ্লেসমেন্ট দুটো হাত ভুলে দেখিয়ে দিলো ওকে। 'আরো তিনটে আছে পাহাড়ের উল্টো-দিকে, এখান থেকে আপনি দেখতে পাবেন না।'

মডেল দেখে আক্রমণের প্ল্যান করা হয়েছে, এলাকাটা চাক্ষুষ করার পর সংশোধনের দরকার পড়লো। নোট বুক বের করে দ্রুত, উচ্চতা ইত্যাদির নতুন হিসাব টুকতে হলো। এক এক করে সব ক'জন সেকশন লিডারকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলো শন-যার যার দল এসে পৌঁছনো মাত্র সবাই তারা নির্দিষ্ট পজিশনে চলে যাবে।

মাতাউকে বিদায় করে দিলো শন, বললো, 'জোবের কাছে ফিরে যাও অঙ্ককার নামলেই, ওদেরকে নিয়ে চলে আসবে এখানে।'

মাতাউ চলে যাবার পর দিনের বাকি সময়টুকু উত্তর থেকে হিন্দুগুলোর ফিরে আসা দেখলো শন। মাতাউ বলেছিল, দুটো হিন্দ উড়ছে না, কিন্তু এগারোটাকে ফিরে আসতে দেখলো ও। মেইস্টেন্যান্স ত্রুদের দক্ষতাই প্রমাণ করে, এরইমধ্যে অচল দুটো হিন্দ মেরামত করে নিয়েছে তারা।

আস্তানায় নামার আগে প্রতিটি হিন্দ পাহাড়ের ওপর শূন্য কয়েক সেকেন্ডের জন্যে স্থির থাকলো। এ-ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জন্যে সেক্ষেত্র জিওগ্রাফিকে নির্দেশ দিলো শন। কোনো হিন্দ কোথাও নামছে তা-ও খেয়াল রাখতে হবে।

সূর্য অস্ত গেলো। অন্ধকার গাঢ় হবার জন্যে অপেক্ষায় থাকলো ওরা। আর কিছু আলোচনার নেই, শন ও আলফনসো চূপচাপ কাছাকাছি বসে আছে। এরকম প্রতীক্ষা আগেও বহুবার করেছে শন, কিন্তু উত্তেজনা দমন বা নিয়ন্ত্রণ করা আজও ওর পক্ষে সম্ভব হয়নি। রোমাঞ্চকর অনুভূতি আসলে একটা নেশা উপভোগ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকে আত্মা।

‘যুদ্ধে আমরা জিতবো’, শান্তভাবে বললো আলফনসো। ‘আমরা পুরুষ-মানুষের মতো লড়বো।’

মাথা ঝাঁকালো শন ‘হ্যাঁ, লড়াইটা জিততে হবে আমাদের। যদি হারি, তুমি আমাদের খুন করার চেষ্টা করবে। সেটাও একটা যুদ্ধ হবে, তাই না? পুরুষমানুষের মতোই লড়বো আমরা-তুমি আর আমি।’

‘দেখা যাবে’, গম্ভীরসুরে বললো আলফনসো, পশ্চিম আকাশের লালিমা লেগেছে তার চোখে।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হবার সাথে সাথে সামনের পাহাড়টা প্রথমে অস্পষ্ট তারপর একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তারপর সন্ধ্যা-তারা ফুটলো আকাশে, পাহাড়ের ঠিক মাথার ওপর, নিশ্চল, যেনো জানিয়ে দিচ্ছে আস্তানাটা ঠিক কোথায়।

অন্ধকার গাঢ় হবার এক ঘণ্টার মধ্যে ওদের পিছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো রেইডিং পার্টি। মিছিলের মাথায় রয়েছে জোব, পাশে ক্লডিয়া, ওদেরকে পথ দেখাচ্ছে মাতাউ। ওদের সাথে মাত্র দু’ একটা কথা বললো শন, যার যার ইউনিটের সাথে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলো ট্রুপারদের। মিসাইল টিমের দায়িত্ব বুঝে নিলো সেকশন লিডাররা, বাস্তু থেকে বের করে জোড়া লাগানো হলো স্টিংগার লঞ্চার। স্পায়ার মিসাইলগুলোও আরেকবার চেক করা হলো।

প্রতিটি টিম ও টিমের ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করলো ওরা-শন, জোব ও ক্লডিয়া। সবশেষে সেকশন লিডারদের এক জায়গায় জড়ো করলো শন, কাকে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে সব পুনরাবৃত্তি করতে বলা হলো। সন্ধ্যা হবার পর যার যার অ্যাটাক পজিশনে চলে যাবার নির্দেশ দিলো ও। ঢাল বেয়ে নামতে হবে ওদের, প্রথম টিম নেমে যাবার পর পাঁচ মিনিট বিরতি দিয়ে নামবে দ্বিতীয় টিম।

মিসাইল টিমের নেতৃত্বে দিচ্ছে আলফনসো, হেলিকপ্টার ঘাঁটির পূর্ব পরিমিটার আক্রমণ করবে তার টিম। পজিশনে পৌঁছবার জন্যে সবচেয়ে বেশি হাঁটতে হবে ওদেরকে, তাই আগে রওনা হবার সুযোগ পেলো।

পশ্চিম পরিমিটার আক্রমণ করবে জোবের মিসাইল টিম। রওনা হবার আগে শনের সাথে নিঃশব্দে ক্রমরূপ করলো সে, কোনো শুভেচ্ছা বিনিময় হলো না, কারণ এ-ব্যাপারে কুসংস্কার আছে জোবের-তার ধারণা, মঙ্গলকামনা উচ্চারণ করতে নেই, মনে মনে আওড়তে হয়। শুভেচ্ছার বদলে শনকে সে বললো, ‘আমার পাওনা টাকা

যে দিলেন না, বস? রিকার্ডো মনটেরো যে লাখ লাখ ডলার দান করে গেলেন, তার ভাগ তো আমিও পাবো; তাই না? তার ওপর আছে বেতন। কিছুই তো পেলাম না!’

‘বলো তো চেক লিখে দিই’, মুচকি হেসে জবাব দিলো শন, ক্যামোফ্লেজ ক্রীম মেখে ভূত সেজেছে ও। শব্দ না করে জোবও হাসলো, কপালে হাত ঠেকিয়ে স্যাঁলুট করলো শনকে, তারপর তফাতে সরে গেলো, শন যাতে ক্লুডিয়ার সাথে একা কথা বলতে পারে।

‘তোমাকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না’, অস্ফুটে বললো ক্লুডিয়া।

শব্দ করে তাকে জড়িয়ে ধরলো শন। ‘সব সময় জোবের কাছাকাছি থাকবে’, কোমল সুরে বললেও, শোনালো আদেশের মতো।

‘আমি তোমাকে ফেরত চাই। কথা দাও।’

অভয় দিয়ে হাসলো শন।

‘বলো নিরাপদে আমার কাছে ফিরে আসবে তুমি?’

‘আসবো।’

‘প্রতিজ্ঞা করো।’

‘কথা দিলাম’, বললো শন, নিজেকে ওর আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিলো ক্লুডিয়া, জোবের পিছু নিয়ে হারিয়ে গেলো অন্ধকারে। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলো শন, অনুভব করলো হাত দুটো সামান্য কাঁপছে। ওগুলো পকেটে ভরে মুঠো পাকালো ও। মন থেকে ক্লুডিয়াকে সরাবার জন্যে ভাবলো, ‘সাথে জোব রয়েছে, ওকে দেখবে সে।’

ওর জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল অ্যাসল্ট টিম, জঙ্গলের কিনারায়। চক্ৰিশজন লোক, কামানের খোরাক, ভাবলো শন। স্টিংগার ট্রেনিঙের বাছাই পর্বে টেকেনি তারা। হেলিকপ্টার ঘাঁটির পেরিমিটার থেকে পাঁচশো মিটার দূরে, নিরাপদ পজিশন থেকে আক্রমণ চালাবে মিসাইল ক্রুরা, কিন্তু অ্যাসল্ট টিমকে সরাসরি এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে শত্রুর ওপর, ফ্রেলিমোদের সামনে নিজেদেরকে সহজ টার্গেট হিসেবে তুলে ধরতে হবে—তবেই হিন্দ গানশিপগুলো উঠবে আকাশে। তখন ওগুলোকে ভূপাতিত করার সুযোগ পাবে মিসাইল ক্রুরা। হেলিকপ্টার ঘাঁটির চারধারে যতো রকম বাধা ও বিপদ আছে, সবগুলোর সামনে পড়তে হবে অ্যাসল্ট টিমকে। তাদের কাজটা শুধু বিপজ্জনকই নয়, গুরুত্বপূর্ণও বটে, সেইজন্যে আর কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে নিজেই নেতৃত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শন।

‘এসো, মাতাউ’, শান্তস্বরে বললো ও। সত্যিকার বিপদের মুহূর্তে, তা আহত কোনো হিংস্র প্রাণিকে ধাওয়া করার সময়ই হোক বা শত্রু ঘাঁটিতে হানা দেয়ার সময়, মাতাউর স্ব-নির্বাচিত জায়গা হলো শনের ডান বা বাম পাশ। কোনো অবস্থাতেই সেখান থেকে তাকে সরানো যাবে না।

শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে শাক্তানি সার্জেন্ট আলফনসো শনকে তার নিজের রাইফেলটা ব্যবহার করতে দিয়েছে, একেএম অ্যাসল্ট রাইফেল। ঢাল বেয়ে নেমে আসছে ওরা, অন্ধকারে পথ দেখাচ্ছে মাতাউ, রেল স্টেশন ও হেলিকপ্টার ঘাঁটির মাঝখানে পৌঁছানোর জন্যে ঘুর পথে এসেছে। শাখা লাইনের ওপর দাঁড়ানো রেলওয়ে ট্যাংকারগুলোর যতোটা সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছতে চায় ওরা।

তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, সারাটা রাত হাতে রয়েছে ওদের। চুপিসারে, সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে এগোলো ওরা।

রাত দুটোর দিকে থামলো শন, সিদ্ধান্ত নিলো এখন থেকেই আক্রমণ করবে। সরু কাস্তুর মতো চাঁদ উঠেছে আকাশে। নির্দিষ্ট ব্যবস্থানে ছড়িয়ে পড়লো টিমের সদস্যরা, শনের নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় আছে।

ক্রল করে সবার কাছেই একবার করে এলো শন, তাদের ৬০ এম এম এম/ফোর কমান্ডো মর্টার সাইটে নিজে চোখ রেখে দেখলো, শুধু হাতের স্পর্শ দিয়ে পরখ করলো তাদের ইকুইপমেন্ট, প্রশ্ন করে নিশ্চিত হলো সবাই তাদের অবজেকটিভ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখে, ফিরে আসার আগে উৎসাহ দিলো প্রত্যেককে, কাঁধে হাত রেখে চাপ দিলো মৃদু। যা করার সবই করা হয়েছে, এবার অপেক্ষার পালা।

ভোর তখনো হয়নি, চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, হঠাৎ পাহাড়ী নিস্তর্রতাকে চুরমার করে দিয়ে ভীতিকর একটা আওয়াজ হলো। সাথে সাথে চিনতে পারলো শন, প্রচণ্ড শক্তিশালী টার্বো এঞ্জিনের শব্দ, মানুষ-ষেকো নেকড়ের মতো গর্জন করছে। একে একে স্টার্ট নিলো সবগুলো এঞ্জিন। হিন্দ স্কোয়াড্রন প্রস্তুতি নিচ্ছে, ভোরের আলো ফোটা মাত্র বেরিয়ে পড়বে দিনের প্রথম অভিযানে।

হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রাখলো শন। পাঁচটা বাজতে এগারো মিনিট বাকি। সময় প্রায় হয়ে এসেছে। একেএম রাইফেলের ম্যাগাজিন বদল করলো ও, দেখতে পেয়ে প্রত্যাশায় উনুখ হয়ে নড়ে উঠলো মাতাউ। ভোরের প্রথম বাতাস কোমল স্পর্শ রাখলো শনের মুখে, প্রেমিকার আলতো চুমোর মতো। পূর্ব দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাতটা উঁচু করলো ও, ছড়িয়ে থাকা আঙুলগুলো কোনোরকমে দেকতে পেলো। ভোরের এই সময়টাকে ‘শিং বেলা’ বলে ম্যাটাবেলরা, রাখাল যখন তার গবাদি পশু শিং আকাশের গায়ে প্রথম দেখতে পায়।

আর দশ মিনিট, ভাবলো শন। দশ মিনিট পর গুলি করার মতো আলো পাওয়া যাবে। শেষ দশটা মিনিট পেরুতে সময় লাগে অনন্তকাল।

এক এক করে প্রতিটি এঞ্জিনের আওয়াজ ধীরে ধীরে কমে এলো। থাউণ্ড ক্রুর গোলা ও ফুয়েল ভরছে। ফ্লাইং ক্রুর সম্ভবত আগেই উঠে পড়েছে হেলিকপ্টারে।

আরও কিছুটা উজ্জ্বল হলো ভোরের আলো। পাহাড়চূড়ার কর্কশ কিনারা দেখতে পেলো শন। আরো সামনে আকাশের গায়ে নকশা তৈরি করেছে একজোড়া মাসাসা গাছের ডালপালা, ভোরের বাতাস পেয়ে দোল বাচ্ছে।

‘গুট!’ চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিলো শন। গুর পাশে দাঁড়ানো ট্রুপার সামনে ঝুঁকলো, দু’হাতে ধরা মর্টারটা ফেলে দিলো মর্টার টিউবের মুখে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কোমল ফুসস আওয়াজ করে পাহাড়চূড়ার পাঁচশো ফুট ওপরে উঠে গেলো সিগন্যাল বোমা। বিস্ফোরণের সাথে সাথে লাল আলোয় ভেসে গেলো চারদিক।

\* \* \*

জোবের পিছু পিছু ঢাল বেয়ে নেমে এলো কুড়িয়া, হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে তাকে। জোবের কাঁধে একটা মিসাইল লক্ষ্যর রয়েছে। পিছনে টিমের দু'নম্বর সদস্য ঝুঁকে আছে সামনে দিকে, স্পেন্সার রকেট টিউব বহন করছে সে।

চারদিকে গেলোকার ও মসৃণ নুড়ি পাথর, খুব সাবধানে পা ফেলে নামতে হলো ওদেরকে। ঢাল থেকে নিচে নামার আগেই যেমে গেলো কুড়িয়া। গাছপালার ভেতর দিয়ে হেলিকপ্টার ঘাঁটির পেরিমিটার লক্ষ্য করে এগোলো ওদের টিম। একটা সময় ছিলো, এ-ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আড়ষ্ট বোধ করতো কুড়িয়া। মাত্র কয়েক সপ্তায় কতো বদলে গেছে সে। কখনো ভেবেছিল কি, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর এতো কাছাকাছি থাকতে হবে তাকে? পাহাড়চূড়ার ওপর ঝুলে থাকা ধ্রুবতারা দেখে পথ চিনে নেবে বা জোব নামে এক সরলপ্রাণ আফ্রিকান যুবকের সংকেত পেয়ে সাড়া দেবে সাথে? ভেবেছিল কি, দু'দল গেরিলাদের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে তাকে?

চারপাশে ঘন জঙ্গল। এটাই ওদের অ্যাটাক পজিশন। সিংগার মিসাইল ফায়ার করার জন্যে প্রস্তুতি নিলো জোব, তাকে সাহায্য করলো কুড়িয়া। কাজ শেষ হতে মাটির কাছাকাছি নেমে আসা একটা ডালের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলো।

কুড়িয়াকে রেখে শিকারী নেকড়ে মতো অন্ধকারে হারিয়ে গেলো জোব, সঙ্গ দেয়ার জন্যে রেখে গেলো দু'নম্বর শাস্ত্রানি লোডারকে। জোবকে চলে যেতে দেখে মন খারাপ হলো কুড়িয়ার, তবে আতঙ্কবোধ করলো না। এই ক'দিনে তার সাহস অনেক বেড়েছে।

কিছুক্ষণ পর আবার নিঃশব্দে ফিরে এলো জোব। 'বাকি সব সেকশন পজিশনে রয়েছে', কুড়িয়ার পাশে, ডালের ওপর বসে ফিসফিস করলো সে। 'তবে ভোর হতে এখনো দেরি আছে, ঘুমোবার চেষ্টা করুন।'

'আসবে না', বললো কুড়িয়া, এতো নিচু গলায় যে শোনার জন্যে তার দিকে ঝুঁকতে হলো জোবকে। 'এসো, বরং গল্প করি। তুমি আমাকে শন কোর্টনির গল্প শোনাও। ওর সম্পর্কে সব কথা জানতে চাই আমি।'

'মাকেমধ্যে ও হলো গে হিরো', বিড়বিড় করে বললো জোব। 'আর মাকেমধ্যে আস্ত বজ্জাত! তবে বেশিরভাগ সময় এই দুয়ের মাঝে।'

'তাহলে ওর সঙ্গে কেনো আছো তুমি?'

'ও হলো আমার বন্ধু।'

এরপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলো জোব। আত্মহত্রে স্তন্যে থাকে কুড়িয়া।

'ও বিয়ে করেছিলো, তাই না জোব? পরিবার ছেড়ে এলো কেনো? আমি জানি, কোর্টনি পরিবার দারুণ সম্পদশালী, তবে এ ধরনের শিকারী জীবন কেনো বেছে নিলো?'

এভাবেই, কথায়-উত্তরে রাত কেটে যায়। পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেছে কুড়িয়া আর জোব ততক্ষণে। শেষমেষ জোব বলে, 'তবে তুমি আমাকে মিস করবো, অনেক।'

'এমনভাবে বলছো যেনো তোমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছে?'

'হুমম,' মাথা নাড়ে জোব। 'আগের মতো আর কিছু থাকবে না। এখন থেকে ও আপনার। আমার সময় শেষ, আপনার শুরু।'

'এজন্যে আমাকে ঘৃণা করো না, প্লিজ।' আবেদনের ভঙ্গিতে বলে কুড়িয়া।

'না, করবো না। আমার ধারণা, আপনি ওনার সাথে ভালো থাকবেন। আপনাদের ভালো মিলে।'

'তুমি সবসময় আমাদের বন্ধু থাকবে, জোব।'

অনেকক্ষণ পর মুখের সামনে হাত তুলে আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিলো জোব, অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো পাঁচটা আঙুল। 'শিং বেলা,' বললো সে। 'আর দেরি নেই।' কথাটা শেষ হওয়ামাত্র পাহাড়চূড়ার ওপর জ্বলে উঠলো লাল ফ্লোর।

\* \* \*

ভোরের আকাশে সিগন্যাল ফ্রেয়াঅর বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথে শুরু হয়ে গেলো যুদ্ধ। আরপিজি সেভেন রকেট লঞ্চার গর্জে উঠলো, কিন্তু রকেটটা বিস্ফোরিত হলো রেললাইনের ওপর দাঁড়ানো প্রথম ফুয়েল ট্যাংকার থেকে বিশ ফুট ছিপনে। শন দেখলো, মাটি থেকে শূন্য লাফিয়ে উঠলো চোখ-ধাঁধানো হলুদ শিখা, শিকার মাঝখানে ঘন ঘন ডিগবাজি খাচ্ছে ফ্রেলিমোদের একজন সেন্সি। দ্বিতীয় রকেটটা ছুটে গেলো ছ'ফুট ওপর দিয়ে, ট্যাংকারটাকে ছাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো সামনের বনভূমিতে, গাছপালার আড়ালে বিস্ফোরণটা দেখা গেলো না।

গানারদের তিরস্কার করলো শন, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ছুটছে, বুঝতে পারছে শুরুত্বপূর্ণ প্রথম গুলিটা নিজে না ছুঁড়ে ভুল করেছে ও।

রেলওয়ে ট্যাংকারের চারপাশে ছুটেছিটি করছে ফ্রেলিমোরা, চিৎকার করছে। হেলিকপ্টার ঘাঁটির পেরিমিটার থেকে একটা ১২.৭ এমএম পাল্টা আক্রমণ শুরু করলো, কমলা রঙের ট্রেসার ছুঁড়ে দিলো আকাশে।

আরপিজি সেভেনলোড করার সময় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাতড়াচ্ছে গানার আধো অন্ধকারে নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে। লঞ্চারটা তার কাঁধ থেকে ছিনিয়ে নিলো শন, অভ্যস্ত হাতে দ্রুত সরালো মিসাইলের প্রোটেকটিং নোজ ক্যাপ সেফটি-পিন আলগা করলো, এক ঝটকায় কাঁধে তুলে নিলো অস্ত্রটা, ভাঁজ করা একটা হাঁটু গাড়লো মাটিতে, লক্ষ্যস্থির করলো রেলওয়ে ট্যাংকারের ওপর।

দূরত্ব তিনশো মিটার। রেঞ্জ তিনশো মিটারের বেশি হলে আরপিজি সেভেন রকেটের সাফল্য সম্পর্কে কোনো নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়, নির্ভর করে গানারের ব্যক্তিগত দক্ষতা, বাতাসের মতিগতি ইত্যাদির ওপর। ফায়ার করলো শন।

রেলওয়ে ট্যাংকারের একটা পাশ বিস্ফোরিত হলো, আকাশের গায়ে পাঁচিলের মতো খাড়া হলো অগ্নিশিখা। পাশে দাঁড়ানো গানারের দিকে মারমুখো হয়ে তাকালে শন, ব্যস্ত হাতে প্যাক থেকে আরেকটা মিসাইল বের করলো সে।

জ্বলন্ত ফুয়েল পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালটাকে দিনের মতো আলোকিত করে তুলেছে। খোলা জায়গায় রয়েছে শন, মাটিতে হাঁটু গেড়ে, ১২.৭ এমএম-এর গানার শনের ওপর লক্ষ্যস্থির করলো

শনের চারপাশের মাটি ধুলোর মেঘে পরিণত হয়েছে, চিৎকার দিয়ে ওর পাশে শুয়ে পড়লো গানার। 'ব্যাটা উজবুক করে কি!' একই লঞ্চারটা লোড করলো ও ১২.৭ এমএম গানারের চোখকে ফাঁকি দেয়ার কোনো চেষ্টা করলো না।

লঞ্চারটা আবার কাঁধে তুলে নিলো শন, লক্ষ্যস্থির করলো দ্বিতীয় রেলওয়ে ট্যাংকারের ওপর। কমলা রঙের চোখ-ধাঁধানো আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে ওটা। গুলি করতে যাবে ও, হলুদ ধুলোর একটা ঘন মেঘে ঢাকা পড়ে গেলো টার্গেট, সেই সাথে কামানের এক ঝাঁক গোলা ওর মাথার এতো কাছ দিয়ে ছুটে গেলো যে ভোঁ ভোঁ করলো কান।

গুলি করতে তিন সেকেন্ড দেরি করলো শন। ধুলোর পর্দা না সরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। এবারও লক্ষ্যভেদ করলো, বিস্ফোরিত হলো দ্বিতীয় ট্যাংকার, বিস্ফোরণের ধাক্কায় রেললাইন থেকে ছিটকে মাটিতে কাত হলো সেটা। জ্বলন্ত ফুয়েল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে, যেনো খুদে একটা ভিসুভিয়াস লাভা উপ্গিরণ করছে।

লঞ্চগরটা গানারের বুকে ছুঁড়ে মারলো শন। ‘ফায়ার করতে না পারলে এটা দিয়ে ওদের মাথায় বাড়ি মারো, হাঁদারাম!’

অবশ্য মর্টার কর্মীরা রীতিমতো ভালো করছে। ভোরের আকাশ চিরে একের পর এক ছুটে গেলো বোমাগুলো, বৃষ্টির ফোঁটার মতো পড়ছে পাহাড়-চূড়ার ঘাঁটিতে। নির্লিপ্ত, পেশাদারি দৃষ্টিতে ফলাফলটা লক্ষ্য করলো শন। ‘দারুণ’, বিড়বিড় করলো ও। তবে প্রতিটি মর্টারের জন্যে মাত্র ত্রিশটা করে বোমা বয়ে আনতে পেরেছে ওরা, কারণ একেকটার ওজন প্রায় দুই কেজি। একটু পরই শেষ হয়ে যাবে ওগুলো। বোমার বিরতিহীন বিস্ফোরণে ফেলিমো গানাররা দিশেহারা হয়ে পড়েছে, বোমা শেষ হবার আগেই পেরিমিটারের হামলা চালাতে হবে। একেএম রাইফেলটা বাগিয়ে ধরলো শন, সেফটি-ক্যাচ অফ করলো, চিৎকার করলো, ‘গো! গো! গো!’

একযোগে সোজা হলো শাস্তানিরা, ঢাল বেয়ে তীরবেগে নেমে যাচ্ছে। সংখ্যায় মাত্র বিশজন তারা, আঙনের উজ্জ্বল শিখায় আলোকিত। পাহাড়ের ওপরদিকের ঢাল বেয়ে ফেলিমো গানাররা একনাগাড়ে গুলি করছে, শাস্তানিদের মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে ছুটে গেলো বুলেট।

ফেলিমোদের একজন গানার ছুটন্ত রেনামো লাইনের মাথায় শনকে দেখতে পেয়ে লক্ষ্যস্থির করলো, কিন্তু শন দীর্ঘ লাফে এতো দ্রুত নামছে যে বুলেটগুলো ওর পিছনে চলে গেলো। একেবারে গা ছুঁয়ে গেলো, দুবার কাপড়ে টান অনুভব করলো শন। ছোট্টার গতি আরো বাড়িয়ে দিলো ও, ওর পাশ থেকে ঝিক ঝিক করে হেসে উঠলো মাতাউ, খর্বকায় লোকটা কিভাবে যে ওর সাথে তাল মিলিয়ে ছুটছে তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারিবে।

‘এতো হাসির কি হলো, মাথামোটা গর্দভ?’ ঝঁকিয়ে উঠলো শন, ‘দু’জন একসাথে ঢাল থেকে নেমে এলো সমতলভূমিতে, জ্বলন্ত রেলওয়ে ট্যাংকারের পাশে। ঘন কালো ধোঁয়ার পর্দা আড়াল করে রেখেছে ওদেরকে, ফেলিমো গানাররা দেখতে পাচ্ছে না। এই সুযোগে শাস্তানিদেরকে হেলিকপ্টার ঘাঁটির পেরিমিটারের দিকে পথ দেখালো শন, এখনো তারা দৌড়াচ্ছে।

শেষ দুশো মিটার ধোঁয়ার আড়াল পাওয়া গেলো।

শনের সামনে, ধোঁয়ার ভেতর থেকে হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে এলো একজন ফেলিমো সেন্দ্ৰি। ছেঁড়া-ফাড়া ডেনিম পরে আছে সে, পায়ে টেনিস শু। অস্ত্রটা খুইয়েছে, একটা চোখ নেই — সম্ভবত স্প্রিংটার লেগেছে। কোটার থেকে পুরোপুরি

বেরিয়ে এসেছে মণি, গালের সাথে ঝুলছে, বিশাল একটা লিচুর মতো। মাথাটা ঘন ঘন ঝাঁকচ্ছে সে, অপরটিক নার্ভের সাথে ঝুলে থাকা চোখ দোল খাচ্ছে। ছোট্ট গতি না কমিয়ে কোমরের কাছ থেকে গুলি করলো শন, লাশটাকে লাফ দিয়ে টপকালো।

ঘোয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, আগের মতোই ছুটছে। ঘাড় ফিরিয়ে নিজের দলটার ওপর চোখ বুলালো শন, অবাক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো এখনো আহত হয়নি কেউ। বিশজ্ঞান শাস্ত্রানি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, ছোট্ট পথে প্রতিটি আড়াল ব্যবহার করছে তারা, বেশিরভাগ সময় ঘোয়া, আগুনের শিখা, পাথর ও গাছ ওদেরকে ঢেকে রাখছে। ফেলিমো গানাররা সময় পাচ্ছে না লক্ষ্যস্থির করার।

অকস্মাৎ, মাত্র পাঁচ হাত সামনে, একটা ঝুটির ওপর টিনের পাতে আঁকা খুলিটা দেখতে পেলো শন। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারার আগেই মাইনফিল্ডে ঢুকে পড়লো দলটা। এই মাইনফিল্ডই পাহারা দিচ্ছে হেলিকপ্টার ঘাঁটিটাকে।

দু' সেকেন্ড পর শনের ডান পাশের শাস্ত্রানি একটা মাইনে পা দিলো। কোমর থেকে শরীরের নিচে অংশ ধুলো ও আগুনের ঝলকে ঢাকা পড়ে গেলো, বিস্ফোরণের শব্দে তালা লেগে গেলো কানে, হাঁটুর কাছে থেকে দুটো পা-ই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে শাস্ত্রানির।

‘খেমো না!’ চিৎকার করলো শন। ‘প্রায় পৌছে গেছি আমরা! হিংস্র একটা পশুর মতো শনের সমগ্র অস্তিত্বে যেনো ঝাবলা মারছে আতঙ্ক, সমস্ত শক্তি গুণে নিয়ে প্রাণহীন জড়পিণ্ডে পরিণত করে দিতে চাইছে ওকে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হলো শনের। শরীরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার ভয়টা মৃত্যুভয়কেও হার মানায়। পায়ের নিচে ইস্পাতের ক্যাপসুল পৌঁতা রয়েছে, ঠিক কোথায় জানা নেই, পায়ের চাপ লাগলেই বিস্ফোরিত হবে।

লাফিয়ে শনের সামনে চলে এলো, যেনো মানুষরূপী একটা ফেরেশতা, শনকে বাধ্য করলো ছোট্ট গতি কমাতে। ‘আমার পিছু পিছু আসুন, বাওয়ানা!’ সোয়াহিলি ভাষায় বাঁশীর মতো আওয়াজ করলো মাতাউ। ওর প্রতি লোকটার ভক্তি ও ভালবাসা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো শন। ‘পা ফেলুন ঠিক যেখানে আমি পা ফেলছি।’ তার নির্দেশ পালন করলো শন, এখন আর ছুটছে না, পা ফেলছে যেনো একটা বামুন।

এভাবে মাইনফিল্ডের শেষ পঞ্চাশ কদম শনকে পথ দেখিয়ে পার করে আনলো মাতাউ। অন্যের জন্যে এমন ভয়ংকর ঝুঁকি নিতে আগে কখনো কাউকে দেখেনি শন। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার এ এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত, অভিব্যক্ত না হয়ে পারা যায় না। মাইন ফিল্ডের শেষ সীমায় ওরা পৌঁছবার আগে আরো দু'জন শাস্ত্রানি ধরাশায়ী হলো, কোমরের নিচ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো তাদের শরীর।

তাদেরকে নিজেদের রক্ত ও খেঁতলানো মাংসের ভেতর ফেলে রেখে এলো গুরা, লাক দিয়ে তারের নিচু বেড়াটা টপকালো।

আতঙ্কিত ও নার্ভাস হলেও, মাতাউর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ এমন প্রবল হয়ে দেখা দিলো শনের মনে, কখন যেনো ভিজে উঠেছে চোখ দুটো। তাকে একটা খেলনার মতো কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে হলো গুর। তার বদলে বললো, ‘ভূমি এতো হালকা যে কোনো মাইনে পা দিলেও ফাইতো না সেটা!’ বিপদ না হওয়ায় এবং শনের রসিকতা শুনে আনন্দে এক পাক নাচলো মাতাউ, পরমুহূর্তে আবার শনের পাশে চলে এলো সে, একযোগে ছুটলো গুদের গুদের সামনে নাক বরাবর উঁচু হয়ে থাকা বালির বস্তা দিয়ে তৈরি ১২.৭ এমএম মেশিনগান এমপ্রেসমেন্টের দিকে।

কোমরেরটিল দিলো শন, গড়িয়ে দিলো শরীর, বালির বস্তায় লেগে থেমে গেলো। এতো কাছে, হাত উঁচু করলে ছুঁতে পারবে মেশিনগানের মাজল।

শনকেও দেখতে পেলো গানার, তারি মেশিনগানের ব্যারেলটা গুর দিকে ঘোরালো সে।

ডাইভ দিলো শন, গড়িয়ে দিলো শরীর, বালির বস্তায় লেগে থেমে গেলো। এতো কাছে, হাত উঁচু করলে ছুঁতে পারবে মেশিনগানের মাজল।

বেল্ট থেকে ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড বের করলো শন, পিন খুললো, বস্তার মাঝায় হাত তুলে মুঠো আলগা করলো, যেনো লেটারবয়ে চিঠি ফেলছে। পর্ভুগীজ ভাষায় আর্থনাদ কণ্ঠে উঠলো গানার।

বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। বস্তাগুলোর ফাঁক দিয়ে ঠিক যেনো জিত বের করলো আন্তন আর সাদা ধোয়া। লাক দিয়ে বস্তাগুলোর মাঝায় উঠলো শন, গড়িয়ে ভেতরে দু’জন লোককে দেখলো ও, মেঝেতে হাত-পা ছুঁড়ছে, ঝিচুনি উঠে গেছে শরীরে, যে- কোনো মুহূর্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। পাঁচ-ছয়জন ফ্রেলিমো বিপদ টের পেয়ে আগেই বস্তাগুলোর মাথা টপকে বেরিয়ে গেছে, প্রাণ হাতে করে ছুটছে তারা। মেঝেতে পড়ে থাকা লোক দু’জনকে মাতাউর হাতে ছেড়ে দিলো শন, পরিত্যক্ত মেশিনগানের ব্যারেল ঘোরালো ছুটন্ত ফ্রেলিমোদের দিকে।

সব ক’টাকে ফেলে দিলো শন, তারপর মাতাউর হাত থেকে স্পায়ার অ্যামুনিশন বেল্ট নিয়ে রিলোড করলো মেশিনগান, আক্রমণ শুরু করলো গুর মাঝায় ওপর পাহাড়ের ঢালে ছড়িয়ে পড়া ফ্রেলিমো গেরিলাদের ওপর।

শনের মনে হলো, এখনো অর্ধেকের বেশি শত্রুগণি বেঁচে আছে। মুখে রণহংকার, ফ্রেলিমোদের প্রতিটি বাধা তছনছ করে দিয়ে সামনে বাড়ছে তারা। আক্রমণের তীব্রতায় টিকতে না পেরে পজিশন ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে ফ্রেলিমোরা।

রেঞ্জের মধ্যে আর কোনো শত্রু নেই দেখে মেশিনগান ফেলে বস্তাগুলো টপকালো শন, শাস্ত্রানিদের সাথে ছুটলো ঘাঁটির আরো ভেতর দিকে। হেলিকপ্টারের সার্ভিস সেন্টারটা কাছেই কোথাও থাকার কথা।

ছুটছে শন, এই সময় ওর সামনে থেকে কুৎসিত ও দানবীয় একটা আকৃতি উদয় হলো আকাশে। চকচকে রোটরের ওপর ভর করে উঁচু হচ্ছে হিন্দ গানশিপ, টার্বো থেকে কান ফাটানো আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই বিদ্যুৎ বেলে গেলো শনের শরীরে। মাতাউকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিলো ও, সে যেনো ছোট্ট একটা বিড়ালছানা, এক পা পিছিয়ে এসে ঘুরেই লাক দিলো বস্তাগুলোর মাথা লক্ষ্য করে। মেশিনগানের পাশে হামাগুড়ি দিয়ে থাকলো শন, শরীরের নিচে চেপে রেখেছে মাতাউকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, হিন্দের গানার দেখে ফেলেছে ওদেরকে।

বাতাসে শিস কেটে ছুটে এলো কামানের গোলা। বিক্ষোভিত হলো বালির বস্তা ধুলো আর ধোয়ান ঢাকা পড়ে গেলো সব।

\* \* \*

‘জোব!’ আত্ননাদ করে উঠলো ক্রুডিয়া। ‘শনকে ওরা মেরে ফেলেছে!’ জোবকে আঁকড়ে ধরলো সে, গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করলো জোব। নিরাপদ পজিশন থেকে যুদ্ধটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। বালির বস্তা দিয়ে ঘেরা ছোট্ট জায়গাটায় শনকে লাফ দিয়ে পড়তে দেখেছে ক্রুডিয়া, পরমুহূর্তে সেটা কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো।

মাটিতে একটা হাঁটু গেড়ে কঁাখে লক্ষ্যর তুললো জোব, সাইট স্ক্রীনে গভীর মনোযোগ।

‘জলদি!’ রুদ্ধশ্বাসে তাগাদা দিলো ক্রুডিয়া। ‘জলদি মিসাইল ছোঁড়ো — ওহ্ !’

লম্বা টিউব থেকে লাফ দিলো মিসাইল, রকেট মটর জ্বলে উঠতেই গরম বাতাস ও ধুলোর কণা আঘাত করলো ক্রুডিয়ার মুখে। চোখ সরু করলো সে, দম আটকে রাখলো, ছোট্ট মিসাইলের দিকে তাকিয়ে আছে। মিসাইলের লেজ থেকে আগুন বেরুচ্ছে, পিছনে রেখে যাচ্ছে ধোঁয়া, উঠে যাচ্ছে পাহাড় চূড়ার যেখানে প্রায় অন্ধকার আকাশের গায়ে ঝুলে রয়েছে হিন্দ গানশিপ।

মৃদু ঝাঁকি খেয়ে মিসাইলের গতিপথ সামান্য বদলে গেলো, টার্গেট এখন আলট্রা-ভায়োলেট। নাকটা সামান্য উঁচু হলো মাত্র, আর্মারড এগজস্ট পোর্ট লক্ষ্য নয় এখন, রোটর গিয়ারবক্সের নিচে টার্বো ইনটেক-এ আঘাত হানবে।

মিসাইলের আঘাতে শূন্যে ডিগবাজি খেলো হিন্দ, রোটরটা পাখুরে ঢালের গায়ে বাড়ি খেলো, শ্রুতভঙ্গিতে ভ্রূপ ঝেঁতে ঝেঁতে নামছে, এয়ার ইনটেক থেকে বেরিয়ে আসছে লকলকে আগুনের শিখা। একটা পাখুরে লেগে চুরমার হলো মেইন রোটর, ভোরের আকাশে ছিটকে পড়লো টুকরোগুলো।

বস্তাগুলোর মাথায় আবার শনকে দেখতে পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেললো ক্রুডিয়া। বানরের বাচ্চার মতো শনের বুকে সঁটে রয়েছে মাতাউ, তাকে নামিয়ে দিয়ে ছুটলো শন, তার সাথে পাশাপাশি ছুটলো মাতাউও।

‘রিলোড!’ চোঁচিয়ে উঠলো জোব। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে স্পায়ার মিসাইল টিউবটা পাশ থেকে তুলে নিলো ক্রুডিয়া, লক্ষ্যারে ফিট করতে সাহায্য করলো জোবকে।

রিলোড শেষ হতেই আবার হেলিকপ্টার ঘাঁটির দিকে তাকালো সে। অদৃশ্য হয়ে গেছে শন, তবে পাহাড়চূড়ার ওপর আরো তিনটে হিন্দ গানশিপ উঠে এসেছে, আগুনের আভায়ে আলোকিত। কামান দাগছে গানাররা, কেউ কেউ ঘাঁটির চারপাশে টার্গেট বুঁজছে — রেনামো আক্রমণ — কারীরা ওখানে ফেলিমোদের সাথে হাতাহাতি করছে। হেরেই গেছে ফেলিমোরা, বেশিরভাগই পালিয়ে গেছে জঙ্গলে।

ঘায়েল হলো আরেকটা হিন্দ, পাহাড়চূড়ার কিনারায় আছাড় খেলো সেটা। তৃতীয় একটা হিন্দ মাতালের মতো টলছে, আঘাত গুরুতর, বনভূমির মাথায় বাড়ি খেয়ে কাত হলো, কয়েকটা বিশাল গাছকে সাথে নিয়ে পড়ে গেলো মাটিতে।

যতো দ্রুত পড়লো ওগুলো, বাকিগুলো ততোই দ্রুত উঠে এলো আকাশে, অনবরত গর্জন করছে কামান, রেনামাদের ওপর বিরতিহীন গোলা ছুঁড়ছে। লাফ দিয়ে সোজা হলো জোব, একটা গানশিপকে পালিয়ে যেতে দেখছে ও। শিরদাড়া বাঁকা করলো ও, প্রায় ধনুকের আকৃতি পেলো পিঠ, মিসাইলটাকে তাক করলো প্রায় খাড়াভাবে, যেনো মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা পাখিকে ফেলতে চাইছে।

হিন্দটা এক হাজার ফুট ওপরে, আরো উঁচুতে উঠে যাচ্ছে, স্টিংগারের অনুকূল রেঞ্জের বাইরে নিরাপদ বলেই মনে হলো। তবু সাইট স্ক্রীনে চোখ রেখে মিসাইলটা ছুঁড়লো জোব।

ছুটলো মিসাইল, অনায়াসে পেরিয়ে গেলো দূরত্বটা। বিশাল হিন্দ ঝাঁকি খেলো, এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকলো শূন্যে, তারপরই উল্টে গেলো। উপত্যকার ওপর পিঠ দিয়ে পড়লো সেটা।

লক্ষ্যার রিলোড করছে ওরা, আকাশে উঠে এলো আরেকটা হিন্দ। গানার যেনো জানে কোথেকে স্টিংগার মিসাইল ছোঁড়া হচ্ছে। সরাসরি ওদের দিকে ধেয়ে এলো সেটা, কামানের মাজল ঘুরে গেলো জোব ও ক্লডিয়ার দিকে।

শেল ছুটে আসছে দেখে ক্লডিয়াকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিলো জোব, দুটো বোল্ডারের মাঝখানে পড়লো দু'জন, জোবের নিচে ক্লডিয়া। শরীরের নিচে মাটি রর করে কাঁপতে শুরু করলো, শেলগুলো পড়লো বোল্ডারের গায়ে, ওদের পাশে পাথুরে মাটিতে। পরমুহূর্তে ওদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেলো হিন্দটা, গানার হয় ওদেরকে দেখতে পায়নি নয়তো ধরে নিয়েছে বেঁচে নেই।

জোবের চাপে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ক্লডিয়ার। ধুলোর মেঘে ঢাকা পড়ে রয়েছে ওরা। ক্লডিয়ার চোখে-মুখে সেঁটে রয়েছে চুল। 'জোব, দম আটকে যাচ্ছে, ওঠো!'

কিন্তু জোব উঠলো না। আবার চিৎকার করলো ক্লডিয়া, 'কি হলো, ওঠো!' তারপরই অনুভব করলো সে, তার একটা হাত ভিজে ভিজে লাগছে। বুকের ওপর চড়ে থাকা জোবকে ধরে সজোরে ঝাঁকালো সে। 'জোব!' আতঙ্কে কান্না পেলো তার।

পাথরের মতো ভারি জোবের শরীর, দু'হাত দিয়ে ধরে কোনো রকমে তাকে বুক থেকে সরালো ক্লডিয়া। যেনো সোজা হয়েছে, রোটরের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাতেই দেখলো আবার ফিরে আসছে হিন্দটা।

জোবের পাশ থেকে মিসাইল লক্ষ্যারটা তুলে নিয়ে কাঁধে রাখলো ক্লডিয়া, সাইট স্ক্রীনে চোখ। শেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে গানশিপ, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে সেটার দিকে লক্ষ্য স্থির করলো সে। 'ফায়ার!' বিড়বিড় করে বললো, চেপে ধরলো পিস্তল গ্রিপ।

চোখ সফ্র করে মিসাইলের ছুটে যাওয়াটা দেখলো ক্লডিয়া। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে, চারপাশে বিক্ষোবিত হচ্ছে পাথুরে মাটি। হিন্দের নাকে বসানো কামানটা বিরতিহীন আগুন ঝরাচ্ছে। মাথার ওপর চলে এসেছে সেটা, মিসাইলটা

আঘাত করেছে কিনা জানে না কুড়িয়া। তারপর ইঠাঃ মাঝার ওপর ওটা জ্বলন্ত একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। উড়ে গেলো আগুনের যেনো একটা জ্বলন্ত পাহাড়ের প্রাচীর, ঢালের ওপর আছাড় খেলো আগুনের গোলাটা। আকাশের চারদিকে চোখ বুলালো কুড়িয়া। আর কোনো হিন্দ নেই। সব কটা ধ্বংস হয়েছে, ভাবলো সে। জল থেকে বেরিয়ে শাকানি মিসাইল জুরা ঢল বেয়ে পাহাড়ে উঠছে, শনের আক্রমণে সাহায্য করার জন্যে। কুড়িয়া দেখলো, ফেলিমো গেরিলারা তাদের হাতে অস্ত্র ফেলে দিচ্ছে, বাংকার থেকে বেরিয়ে আসছে মাঝার ওপর হাত তুলে।

তার পায়ের কাছে গুড়িয়ে উঠলো জোব। চমকে উঠে সেদিকে ফিরলো কুড়িয়া। হাতের লম্বারটা ফেলে দিলো সে, মাটিতে হাঁটু গেড়ে জোবের পাশে নিচু হলো। ‘আমি ভেবেছিলাম তুমি বেঁচে নেই’, ফিসফিস করলো সে। তারপর লক্ষ্য করলো, কামানের একটা শেল জোবের ওপরের দিকটা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে গেছে। ক্ষতগুলো বীভৎস। দান হাতটা কাঁধ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, পড়ে রয়েছে মাঝার পিছনে, গুটন বেনো কোনোদিনই তার শরীরের অংশ ছিলো না।

‘মরো না, জোব!’ ফোঁপাচ্ছে কুড়িয়া। ‘মরো না!’

জোবের বক্রে মাখামাখি হস্ত গেলো তার পা ও হাত। কপাল থেকে চুল সরতে গেলো সে, চটচটে বক্রে লাল হয়ে উঠলো মুখ। জোবের বক্তাক্ত মুখটা দু’হাতে ধরলো সে ঝুঁকে চুমো খেলো, রাজা হয়ে উঠলো ঠোঁট। ‘ফাইট, প্রীজ ফাইট! এক্ষুণি ফিরে আসবে শন। আমি তোমাকে সাহায্য করবো!’ কান্না থামাবার চেষ্টায় ঠোঁট ফুলে উঠলো তার। ‘মরো না, জোব! প্রীজ!’

\* \* \*

গোলাগুলি বন্ধ হবার সাথে সাথে লাক দিয়ে প্যারাপেট টপকালো শন, মাভাউকে পাশে নিয়ে ছুটলো সামনে, শুকে অনুসরণ করলো শাস্ত্রানিরা। একটা ডাগআউট থেকে বেরিয়ে এলো তিনজন ফ্রেলিমো, কোমরের কাছ থেকে গুলি করলো একজন শাস্ত্রানি, ঝাঁক ঝাঁক বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেলো তিনটে শরীর। আউটার ডিক্লেস পেরিয়ে হিন্দের আস্তানায় পৌঁছলো শন, দেখলো ওয়র্কশপ আর ফুয়েল ডাম্প বালির বস্তা দিয়ে আড়াল করা হয়েছে, ক্যামোফ্লেজ নেট দিয়ে ঢাকা। আস্তানার কাছাকাছি, পেরিমেটারের ঠিক বাইরে ভূপাতিতে হয়েছে একটা হিন্দ, দাউ দাউ করে জ্বলছে এখনো, আস্তানাটাকে ঢেকে দিচ্ছে কালো ধোঁয়া।

চারদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা, উদ্দেশ্যহীন ছুটোছুটি করছে লোকজন, আতংকে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা, পাচ রঙের ওভারঅল পরা নিরস্ত্র টেকনিশিয়ান সবাই একটা বাংকারের ভেতর তিন-চারজন শ্বেতাঙ্গকে দেখে একটা ভুল ধারণা ভেঙে গেলো শনের। ফ্রেলিমোদেরকে শুধু হিন্দ গানশিপ দেয়নি রাশিয়ানরা, পাইলট ও টেকনিশিয়ান দিয়েও সাহায্য করেছে। ওর ধারণা ছিলো, পাইলট ও টেকনিশিয়ানরা রাশিয়ান হবে না, অন্য কোথাও থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে। ‘এদেরকে শ্রেকতার করো,’ শাস্ত্রানিদের নির্দেশ দিলোও ও। ‘কাউকে মারধর করবে না। ওদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই।’ হঠাৎ সামনে চোখ পড়তে একাধারে বিস্মিত ও পুলকিত হলো শন।

বালির বস্তা দিয়ে তৈরি পাঁচিলের মাথা থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা হিন্দ গানশিপ। সেদিকে ছুটলো শন। ছুটলো, আর ঠিক তখনই হিন্দটার রোটর স্টার্ট নিলো।

কয়েকজন রাশিয়ান গ্রাউণ্ড ক্রু মেশিনটার চারপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শনকে দেখে হাঁ হয়ে গেলো তারা। তাদের দিকে একেএক রাইফেল তুললো ও, সতয়ে পিছিয়ে গেলো সবাই। কয়েকজন শাস্ত্রানিকে ডাকলো শন, রাশিয়ানদের বন্দী করে নিয়ে গেলো তারা। হেলিকপ্টারের বোর্ডিং স্টেশ-এ পা রাখলো ও।

বন্দী হলো পাইলট। লোকটার কাছ থেকে হিন্দ চালাবার কলা-কৌশল শিখে নেয়ার ইচ্ছে শনের, আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, এই হিন্দ নিয়েই কেটে পড়বে ওরা চারজন — ও, ক্রুডিয়া, মাভাউ আর জোব। জেনারেল চায়নার দেয়া শর্ত পূরণ করেছে ওরা, যুদ্ধে জিতেছে, ক্ষয় করে দিয়েছে একটা বাদে বাকি সব ক’টা গানশিপ। এবার ওদের বিদায় নেয়ার পালা।

মাভাউকে নিয়ে সার্জেন্ট আলকনসোর ষোঁজে এদিক ওদিক ঘুরছে শন। রেনামো গেরিলারা ফ্রেলিমোদের বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। আরেকদল লুটপাটে ব্যস্ত। হঠাৎ শনের কাছ থেকে রাইফেলটা চেয়ে বসলো মাভাউ, ‘বাওয়ানা, দিন ওটা

আমাকে', বন্দী ফেলিমোদের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'ব্যাটারের গুলি কত মারি।'

পরিচয়ের পর এ-পর্যন্ত একবারই মাতাউকে গুলি করতে দেখেছে শন, মাতাউ শখ করায় তার হাতে .৫৭৭-টা তুলে দিয়েছিল ও। গুলি সে করেছিল ঠিকই, তবে মাটি থেকে শূন্যে উঠে গিয়েছিল শরীরটা, ছটকে পড়েছিল দশ ফুট দূরে। 'মাথামোটা গর্দভ! বন্দীদের ওপর বীরত্ব ফলাতে চাও! ভারি অন্যায়।'

সার্জেন্ট আলফনসোকে পাওয়া গেলো। সহাস্যে এগিয়ে এসে শনকে স্যাণ্টু করলো সে। 'কংগ্রাচুলেশনস!'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে শন বললো, 'আমি আশঙ্কা করছি ফেলিমোরা পাল্টা আঘাত হানবে-এক ঘন্টার মধ্যে। তার আগেই কেটে পড়তে হবে তোমাদের। তোমার লোকেরা যা নেয়ার নিয়ে নিক, তারপর স্টোররুমগুলো খেনেড মেরে উড়িয়ে দাও, ফুয়েলের ড্রামে আগুন দাও।'

মাথা নাড়লো আলফনসো। 'দুগুণিত, ফেলিমোদের পাল্টা হামলা ঠেকাবার জন্যে তিনটে কোম্পানীকে পাঠিয়েছেন জেনারেল চায়না। নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি না পৌঁছুনো পর্যন্ত এই ঘাঁটি দখল করে রাখতে হবে আপনাকে।'

আলফনসোর দিকে তাকিয়ে থাকলো শন। 'পাগল হলে নাকি! নদীর তীরে এখান থেকে দু'দিনের পথ! কিভাবে পৌঁছবে সে!'

নিঃশব্দে হাসলো আলফনসো। 'এক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছবেন তিনি, মেজর। পাঁচটা কোম্পানী নিয়ে আমাদের পিছু পিছু এসেছেন, কখনোই এক ঘন্টার বেশি পিছিয়ে ছিলেন না।'

'কিভাবে জানলে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো শন।

পাশে দাঁড়ানো ট্রুপারের পিঠের বোঝায় হাত চাপড়ালো আলফনসো। বললো, 'দশ মিনিট আগে জেনারেলের সাথে কথা হয়েছে আমার, শেষ বাজপাখিটাকে থেকে ফেলে দেয়ার পরপরই।'

'একথা তুমি আমাকে আগে জানাওনি কেন?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করলো শন।

'জেনারেল জানাতে নিষেধ করেছিলেন। এখন অবশ্য জানাতে বলেছেন, সেই সাথে আপনাকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন — বাজগুলোকে ধ্বংস করায়। বলেছেন, আপনি তার আপন ভাইয়ের মতো। এখান পৌঁছে আপনাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।'

'ঠিক আছে', নির্দেশ বদল করলো শন। 'আস্তানায় যদি থাকতে হয়, পেরিমিটার ডিফেন্সে লোক মোতায়েন করো, ১২.৭-এমএম মেশিনগান ব্যবহার করবো আমরা...।'

একজন ট্রুপারকে ছুটে আসতে দেখে থেমে গেলো শন।

‘স্যার! স্যার!’ হাঁপাচ্ছে লোকটা।

তার চেহারা দেখেই শন বুঝতে পারলো, দুঃসংবাদ শুনতে হবে।  
‘মেমসাহেবের কিছু হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করলো ও।

মাথা নাড়লো শান্তানি টুপার। ‘মেমসাব নিরাপদেই আছেন। তিনিই তো আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন। ম্যাটাবেলটা, স্যার, জোব! শেল লেগেছে তাকে।’

‘কি অবস্থা? খুব খারাপ?’ আগেরি ছুটতে শুরু করলো শন।

পিছন থেকে লোকটা বললো, ‘অবস্থা খারাপ, মারা যাচ্ছে।’

কোথায় যেতে হবে জানে শন। জোবের পজিশন ও-ই ঠিক করে দিয়েছিল, কয়েকটা অ্যাকেইশা গাছের নিচে।

শনকে দেখে মুখ তুললো ক্লডিয়া, কেঁদে ফেললো। ‘ওহ, শন থ্যাঙ্ক গড!’  
ইতিমধ্যে দু’জন শান্তানির সাহায্য নিয়ে সমতল মাটিতে তুলে এনেছে জোবকে।

আলকাতরার মতো চকচক করছে জোবের চেহারা। তার কপালে হাত রাখলো শন, বরফের মতো ঠাণ্ডা। পালস খুঁজলো ও, অত্যন্ত ক্ষীণ। তবু বিরাট স্বত্তিবোধ করলো ও।

‘প্রচুর রক্ত গেছে’, ফিসফিস করলো ক্লডিয়া। ‘বৈধে দিয়েছি, এখন আর বেরুচ্ছে না।’

‘দেখতে দাও আমাকে’, বিড়বিড় করলো শন।

‘ড্রেসিং সরিয়ে না’, তাড়াতাড়ি সাবধান করলো ক্লডিয়া। ‘বিভৎস। কামানের শেলটা লেগেছে সরাসরি কাঁধে। ওখানে শুধু হাড়ের গুঁড়ো আর খেঁতলানো মাংস দেখতে পাবে। হাতটা শুধু চামড়ার সাথে ঝুলছে।’

‘মাতাউকে নিয়ে যাও’, ক্লডিয়াকে থামিয়ে দিয়ে বললো শন। ‘ফার্স্ট এইড পোস্টটা খুঁজে বের করো। প্রাজমা আর একটা ড্রিপ সেট চাই আমি। অ্যান্টিসেপটিক আর পেইন-কিলারও দরকার...।’

ক্লডিয়া ও মাতাউ ছুটলো।

ওরা না ফেরা পর্যন্ত করার কিছু নেই শনের। বোতলের পানিতে রুমাল ভিজিয়ে জোবের মুখ থেকে রক্ত মুছলো ও। জোবের চোখের পাতা কেঁপে উঠলো। তারপর চোখ মেললো সে। শন বুঝলো, জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে।

‘আমি এসে গেছি, জোব। আর ভয় নেই। কথা বলো না।’

চোখ বুজলো জোব। একটু পর আবার তাকালো। এবার চোখ দুটো নিচের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করলো সে, এতো বেশি দুর্বল যে মাথা ঘোরাতে পারছে না। প্রথম প্রতিক্রিয়া, জখমের বিস্তৃতিটা দেখতে চায়। ‘রক্তটা কি ফুসফুস থেকে

বেরুচ্ছে?’ অক্ষুটে জানতে চাইলো সে। ‘আমার কি দুটো পা-ই গেছে? হাত দুটোও কি?’

‘ডান হাত আর কাঁধ’, বললো শন। ‘১২.৭ এমএম কামান তোমাকে আঁচড়ে দিয়েছে। কিছু না, সামান্য একটু ক্ষত। তুমি ভালো হয়ে উঠবে, বন্ধু — লিখিত দিতে পারি। তুমি জানো আমি মিথ্যে বলি না।’

ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটলো জোবের ঠোঁটের কোণে, একটা চোখ টিপে কৌতুক করারও চেষ্টা করলো সে। জানে, মিথ্যে কথাই বলছে শন। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো শনের। এ-যাত্রা বাঁচবে না জোব।

\* \* \*

লাল ক্রস চিহ্ন দেখে মেডিকেল ডাগআউটটা চিনতে পারলো ক্লডিয়া। ভেতরে দু'জন শাস্ত্রানি রেনামো রয়েছে, দামি কিছু পাবার আশায় ওয়ুধের বাস্ত্র ভাঙছে, তছনছ করছে জিনিস-পত্র। চোখ গরম করে ধমক দিতেই পালিয়ে গেলো তারা একটা বাস্ত্রে প্লাজমা ভরা বারোটো প্লাস্টিক ব্যাগ পেলে সে, একেবারে নিচের শেলফে পাওয়া গেলো ড্রিপ সেট। ড্রেসিং ও ব্যাণ্ডেজের কোনো অভাব নেই। অয়েন্টমেন্টের অনেকগুলো টিউব পাওয়া গেলো, গায়ে ফ্রেঞ্চ ও আরবী লেখা। দুটোই এক-আধটু জানে সে, আয়োডিন লেখা টিউবগুলো নিলো। আর নিলো পেইন-কিলার ট্যাবলেট। সবশেষে এক-জোড়া ফিল্ড প্যাক নিলো ক্লডিয়া, মাতাউর পিছু পিছু বেরিয়ে এলো মেডিকেল ডাগআউট থেকে।

ফিরে আসছে ওরা, কিন্তু ফেরা হলো না। মাঝপথে এমন একজনের সাথে দেখা হয়ে গেলো, প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো ক্লডিয়া। এই লোককে যমের মতো ভয় করে সে।

‘মিস মনটেরো’, তাকে ডাকলো জেনারেল চায়না। ‘কী সৌভাগ্য আমার! দেখা হয়ে ভালোই হলো, আপনার সাহায্য দরকার আমার।’ জেনারেলের সাথে তার আধ ডজন অফিসার রয়েছে।

অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের ধাক্কাটা দ্রুত সামলে নিলো ক্লডিয়া। ‘আমি অত্যন্ত ব্যস্ত’, বেসুরো গলায় বললো সে, জেনারেলকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলো। ‘জীব মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, আমাকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে।’

‘অন্য কারো চেয়ে আমার প্রয়োজনটা বেশি জরুরী’, একটা হাত বাড়ালো জেনারেল চায়না।

‘পথ ছাড়ুন’, রেগে উঠে বললো ক্লডিয়া। ‘এগুলো জোবের দরকার, তা না হলে মারা যাবে ও।’

‘দিন ওগুলো, আমার লোককে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি’, বললো জেনারেল। ‘আপনি আমার সাথে আসুন, প্লিজ। নাকি কোলে করে তুলে নিয়ে যেতে হবে? সেটা আপনার জন্যে সম্মানজনক হবে কি?’

তখনো প্রতিবাদ করছে ক্লডিয়া, তার হাত থেকে জিনিসগুলো তুলে নিলো একজন রেনামো অফিসার। হাল ছাড়তে বাধ্য হলো সে, মাতাউকে বললো, ‘অফিসারের সাথে যাও। শনকে বলবে, এখনি আসছি আমি’, মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলো মাতাউ।

ক্লডিয়াকে নিয়ে হেলিকপ্টারগুলোর আস্তানার দিকে এগোলো জেনারেল চায়না। পথে অনেক লাশ পড়ে রয়েছে, কোনো কোনোটা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। মাংস ও চামড়া গোড়ার গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস। ‘কর্নেল কোর্টনির অ্যাটাক এতোটা সফল হবে, কল্পনাও করিনি’, চারপাশে তাকিয়ে বললো জেনারেল, সারা মুখে ভূঁগির হাসি। ‘উনি এমনকি অক্ষত অবস্থায় একটা হিন্দ গানশিপও দখল করেছেন। বন্দী করেছেন রাশিয়ান গ্রাউণ্ড আর এয়ার ক্রুদের।’

‘আমি কিন্তু বেশি দেরি করতে পারবো না। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।’

‘লোকটার কপালে যদি মৃত্যু থাকে, আপনি সেটা ঠেকাতে পারবেন না, মিস মনটেরো। আপনাকে আমার দরকার রাশিয়ান পাইলটদের সাথে কথা বলার জন্যে।’

‘কিন্তু আমি তো রুশ ভাষা জানি না!’

‘পাইলট লোকটা ইটালিয়ান ভাষা জানে, বারবার শুধু ইটালিয়ানো ইটালিয়ানো করছিল।’ ক্লুডিয়ার হাত ধরলো জেনারেল চায়না, বালিকা বস্তা দিয়ে আড়াল করা বাংকারের মুখে পৌঁছুলো, তারপর ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করলো নিচে।

নিচে নেমে চারদিকে তাকালো ক্লুডিয়া। একটা এঞ্জিনিয়ারিং ওঅর্কশপে রয়েছে ওরা। দেয়াল ঘেঁষে লম্বা ওঅর্ক-বেঞ্চ, সেগুলোর একটায় মেটাল লেদ ও ড্রিল প্রেস বসানো। দেয়ালে আরো ওপরে অনেকগুলো র‍্যাক, একটা র‍্যাকে প্রচুর যন্ত্রপাতি দেখলো ক্লুডিয়া, ইলেকট্রিক ও গ্যাস ওয়েল্ডিং সেট চিনতে পারলো। তাদের বাড়ির গেলোর-এ বাবার একটা ওঅর্কশপ ছিলো, বাপ-বেটি একসাথে অনেকগুলো সন্ধ্যা কাটিয়েছে সেখানে।

সব মিলিয়ে সাতজন রাশিয়ান বন্দী। পাতালপুরীর এক কোনোয় জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। রেনামো গেরিলারা তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, হাতের রাইফেল তাদের দিকে তাক করা। ক্লুডিয়াকে নিয়ে তাদের সামনে চলে এলো জেনারেল চায়না। ‘আপনাদের মধ্যে ইটালিয়ান জানেন কে?’ জানতে চাইলো ক্লুডিয়া।

‘আমি জানি’, লম্বা এক লোক সামনে বাড়লো। ওভারঅল পরে আছে, নীল চোখে রাজ্যের ভয়।

‘কিভাবে, কোথেকে শিখলেন?’

‘আমার স্ত্রী ইটালির মেয়ে। মস্কোর লুমুম্বা ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট করছিল, তখন ওর সাথে আমার পরিচয় হয়।’

‘জেনারেল চায়নার বক্তব্য অনুবাদ করবো আমি’, বললো ক্লুডিয়া। ‘তার আগে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, লোকটা সাংঘাতিক, দয়ামায়া বলে কিছু নেই। আমি তার বন্ধু নই। ‘আমরা জেনেভা চুক্তির আওতায় যুদ্ধবন্দী। নির্দিষ্ট কিছু অধিকার দিতেই হবে।’

‘কি বলছে ও?’ জানতে চাইলো কমরেড চায়না।

‘বলেছেন, ওঁরা যুদ্ধবন্দী — জেনেভা কনভেনশন ওঁদেরকে রক্ষা করবে।’

‘ওকে বলুন, জেনেভা এখান থেকে অনেক দূরে। এটা আফ্রিকা, এবং সুইটজারল্যান্ডের কোনো চুক্তিতে আমি সই করিনি। এখানে আমিই তার ভাগ্য নির্ধারণ করবো। ওকে বলুন, আমি চাই আমার কমাণ্ডে হেলিকপ্টার গানশিপটা চালাবে সে, আর গ্রাউন্ড ক্রুরা মেশিনটাকে ফ্লাইং কন্ডিশনে রাখবে।’

জেনারেলের নির্দেশ অনুবাদ করেছে ক্লুডিয়া, লক্ষ্য করলো শক্ত হয়ে উঠলো পাইলটের চোয়াল, কঠিন দৃষ্টি ফুটলো নীল চোখে। মাথাটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে

নিজের লোকদের সাথে কথা বললো সে। সবাই তারা বিড়বিড় করে কি যেনো বললো, ঘন ঘন মাথা নাড়ছে। ‘কালো বাদরটাকে বলুন’, ঘৃণাভরে বললো পাইলট, ‘আমরা কোনো চাপের মুখে নতি স্বীকার করবো না। যুদ্ধবন্দী হিসেবে প্রাপ্য অধিকার আমাদেরকে দিতেই হবে। রেনামোদের পক্ষ নিয়ে লড়াই বা হেলিকপ্টার চালাতে রাজি নই আমরা। সেটা হবে দেশ ও জাতির সাথে বেঈমানী।’ ভাবে-ভঙ্গিতেই বোঝা গেলো প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছে সে, ক্লডিয়াকে আর কষ্ট করতে হলো না।

‘ব্যাটাকে বলুন’, ঝঁকিয়ে উঠলো জেনারেল চায়না, ‘তর্ক করার সময় নেই আমার। আর মাত্র একবার জিজ্ঞেস করবো আমি, রাজি না হলে অন্য পথ ধরবো-সেটা অবশ্যই ওদের জন্যে সুখের হবে না।’

‘সিনোর’, পাইলটকে বললো ক্লডিয়া, ‘এই লোক ভয়ংকর, অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাকে আমি বীভৎস সব কাণ্ড করতে দেখেছি। আমাকেও তার অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে।’

‘আমি একজন রাশিয়ান অফিসার এবং যুদ্ধবন্দী’, শিরদাঁড়া খাড়া করে, সগর্বে বললো পাইলট। ‘আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝি।’

ক্লডিয়া ভাষান্তর করছে, মুচকি হাসলো জেনারেল চায়না। ‘আরেক — জন সাহসী লোক’, বিড় বিড় করলো সে। ‘আমাদের জানতে হবে, ঠিক কতোখানি সাহসী।’

স্টাফ অফিসারদের দিকে না ফিরে শাস্তানি ভাষায় শান্তস্বরে নির্দেশ দিলো জেনারেল চায়না। অফিসাররা প্রায় ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো অক্সিজেনসিটলিন গ্যাস সিলিন্ডারটা। স্থির দৃষ্টিতে রাশিয়ান অফিসারের দিকে তাকিয়ে আছে চায়না, নিঃশব্দে হাসছে। পাইলটও ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে।

হাসতে হাসতেই ঘুরলো জেনারেল। ওঅর্ক-বেঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালো সে, সাজিয়ে রাখা যন্ত্রপাতিগুলো নাড়াচাড়া করলো। মৃদু শব্দ করলো, সম্ভ্রান্তিসূচক, তারপর বেঞ্চ থেকে সরু একটা লোহার রড তুলে নিলো, আঙুলের চেয়ে কম মোটা নয়। রডটার দুই প্রান্ত চেরা, সম্ভবত হিন্দ হেলিকপ্টারের কন্ট্রোল লিঙ্ক হবে। ‘এটা হলেই চলবে’, বললো সে, বেঞ্চ থেকে তুলে নিলো অ্যাসবেসটস দিয়ে তৈরি ওয়েল্ডিং গ্লাভ। গ্লাভটা ডান হাতে পরলো সে, তারপর মনোযোগ দিলো গ্যাস ওয়েল্ডিং সেটটার ওপর। নাড়াচাড়া করার ভঙ্গি দেখেই ক্লডিয়া বুঝতে পারলো, জিনিসটা কিভাবে, ব্যবহার করতে হয় জানা আছে চায়নার। ওয়েল্ডিং টর্চটা জ্বাললো সে, অক্সিজেনের মাত্রা অ্যাডজাস্ট করলো। উজ্জ্বল নীল হয়ে উঠলো আগুনের শিখা, গরম ও নিষ্কম্প। গ্লাভ পরা হাতে এবার রডটা তুলে নিলো সে, নীল শিখার ভেতর ঢোকালো ডগাটা।

রাশিয়া তার দিকে তাকিয়ে আছে, চেহারা অস্বস্তি ও বিমূঢ় ভাব। এমনকি পাইলটের চোখেও অনিশ্চিত একটা একটা ভাব লক্ষ্য করলো ক্লডিয়া, তার ঠোঁটের ওপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে।

‘লোকটা পশু’, ইটালিয়ান ভাষায় ফিসফিস করলো ক্লডিয়া। ‘আমার কথা বিশ্বাস করুন, এমন কোনো জঘন্য কাজ নেই যা তার দ্বারা সম্ভব নয়। প্লীজ, সিনর, এ-আমি দেখতে চাই না।’

তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে মাথা নাড়লো পাইলট, তাকিয়ে আছে নীল আশুনে লাল হয়ে ওঠা রডটার দিকে। ‘কোনো হুমকি আমাকে নত করতে পারবে না’, বললো সে, তবে গলাটা সামান্য কেঁপে গেলো।

মুচকি হাসি লেগে রয়েছে জেনারেল চায়নার ঠোঁটে, ওয়েল্ডিং টর্চটা নেভালো সে, পাইলটের সামনে চলে এসে টকটকে লাল রডটা তার নাকের সামনে নাড়লো। ‘আবার অনুরোধ করছি’, বললো সে। ‘ওকে জিজ্ঞেস করুন, হেলিকপ্টারটা চালাবে কিনা?’

‘অসম্ভব!’ গলা কেঁপে গেলেও, উত্তরটা সিদ্ধান্তসূচক, তারপর সে ঘৃণাভরে বললো, ‘আমার ওপর কোনো অত্যাচার করা হলে কালো বাঁদরটাকে চরম মূল্য দিতে হবে।’

পাইলটের চোখের দিকে রডটা বাড়ালো জেনারেল চায়না। ‘দেবো নাকি ঢুকিয়ে?’ সহাস্যে জিজ্ঞেস করলো সে।

‘ওকে বলুন, সিনোরা’, পাইলট ফিসফিস করলো, ‘অন্ধ পাইলট হেলিকপ্টার চালাতে পারে না।’

‘খুবই সত্যি কথা’, ক্লডিয়া থামতে বললো জেনারেল, পাইলটকে ছেড়ে বন্দী রাশিয়ানদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে, প্রত্যেকের চোখে রড ঢোকাবার ভঙ্গি করলো, মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করলো কার কি প্রতিক্রিয়া হয় মোটাসোটা, তেল-কালিতে মলিন ওভারঅল পরা মেকা — নিকের প্রতিক্রিয়া সম্ভ্রষ্ট করলো তাকে। রডটা এগিয়ে আসছে দেখে কুঁকড়ে গেলো লোকটা, আতঙ্কে নীল হয়ে গেলো চেহারা, পিছু হটতে শুরু করলো, পিঠটা ঠেকে গেলো দেয়ালে। ফোল গাল বেয়ে ঘামের ধারা গড়াতে শুরু করেছে। ইঁদুরের মতো চি চি করে রুশ ভাষায় কি যেনো বললো সে। জবাবে কঠিন সুরে ধমক দিলো পাইলট।

‘একটু আঁচ নাও, বাছা, দেখো কেমন লাগে’, বলে মেকানিকের নাকের কাছে রডের ডগা ধরলো জেনারেল চায়না। মেকানিকের মাথার পিছনটা দেয়ালের সাথে ঘষা খেতে লাগলো, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখের মণি, অনুসরণ করছে রডের ডগাটা।

রডটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, এখন আর আগের মতো অতোটা লাল নয়। ভুরু কুঁচকে ডগাটা পরীক্ষা করলো জেনারেল চায়না, তারপর ফিরে এলো ওঅর্ক বেঞ্চে। ওয়েল্ডিং টর্চ জ্বলে আবার সেটা গরম করলো সে। ওদিকে বালির বস্তার ওপর

নেতিয়ে পড়লো মেকানিক লোকটা ঘামে তার ওভারঅল ভিজে গেছে তার সাথে নরম সুরে কথা বললো পাইলট, যেনো সাহস যোগাবার চেষ্টা করছে। মেকানিক সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ওদের দু'জনের কথাবার্তা আশ্রয়ের সাথে শুনলো জেনারেল, তার ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েছে।

হাসিটা দেখে হঠাৎ আতঙ্কের সাথে উপলব্ধি করলো ক্রুডিয়া, জেনারেল চায়না তার শিকার হিসেবে মেকানিক লোকটাকেই বেছে নিয়েছে। রাশিয়ানদের মধ্যে এই লোকটাই সবচেয়ে নার্ভাস আর ভীতু, তার প্রতি পাইলটের সহানুভূতিও কম নয়। 'প্লীজ', ফিসফিস করলো সে, পাইলটের দিকে তাকিয়ে আছে। 'আপনার বন্ধু ভয়ংকর বিপদে পড়তে যাচ্ছে। তাকে বাঁচাতে হলে এই পশুর নির্দেশ আপনাকে মানতে হবে।'

ক্রুডিয়ার দিকে তাকালো পাইলট, তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো আগের সেই দৃঢ়তা আর নেই।

'প্লীজ, ক্ষর মাই সেক। এখন যা ঘটবে তা আমি দেখতে পারবো না।' কিন্তু হতাশার সাথে লক্ষ্য করলো ক্রুডিয়া, পাইলটের চেহারা বদলে গেলো, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভাবটা ফিরে এলো আবার। মাথা নাড়লো সে। জেনারেল চায়নাও তা দেখতে পেলো।

ব্রডের লাল ডগায় চোখ রেখে পর্তুগীজ ভাষায় নির্দেশ দিলো জেনারেল। লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো দু'জন রেনামো, মেকানিকের হাত দুটো শক্ত করে ধরে ফেললো। আহত পশুর মতো প্রতিবাদ জানালো লোকটা, ধস্তাধস্তি করলো। টেনে-হিঁচড়ে আনা হলো তাকে, ওঅর্ক-বেঞ্চের ওপর উপড় করে শোয়ানো হলো, একজন রেনামো লাফ দিয়ে উঠে বসলো তার শোল্ডার ব্রডের ওপর। মেকানিক মোচড় খেলো, পা ছুঁড়লো, কিন্তু বৃথাই। তার হাত ও পা ওঅর্ক-বেঞ্চের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে ফেললো রেনামোরা।

ক্রুশ ভাষায় চিৎকার করলো পাইলট, রাগে কাঁপতে কাঁপতে সামনে এগোলো। একজন রেনামো অফিসার তার পেটে পিস্তল চেপে ধরলো, বাধ্য করলো দেয়ালের কাছে ফিরে যেতে।

'আমি আবার অনুরোধ করছি', বললো জেনারেল চায়না। 'আমার কথামতো কাজ করবে?'

পাইলটের চিৎকার শুনে বুঝতে কারো অসুবিধা হলো না গালিগালাজ করছে সে।

নিজের লোকদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো জেনারেল চায়না। খাপ থেকে একজন ট্রেন্স নাইফ বের করলো, এক পৌঁচে কেটে ফেললো মেকানিকের কোমরে জড়ানো ফিতেটা, তারপর ওভারঅল ধরে গায়ের জোরে টান দিলো, ফড় ফড় করে ছিঁড়ে গেলো কাপড়টা, হাঁটুর পিছন পর্যন্ত। ওভারঅলের নিচে নীল আগুয়ানপ্যান্ট পরে আছে মেকানিক। টেনে সেটাকে যতোটা সম্ভব নিচে নামানো হলো।

আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে মেকানিকের নগ্ন নিতম্বের দিকে তাকিয়ে থাকলো ক্লডিয়া।  
গোল, অত্যন্ত ফর্সা ও চর্বিবহুল। দুই উরুর সন্ধিস্থলে কালো লোম।

উন্মাদের মতো চিৎকার করছে পাইলট, আর মিনমিন করছে ক্লডিয়া। ‘প্লীজ, জেনারেল চায়না! প্লীজ, আমাকে যেতে দিন। এ আমি সহ্য করতে পারবো না!’  
চেষ্টা করলো মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চোখে হাত চাপা দেয়, কিন্তু বীভৎস ও রোমহর্ষক যে ঘটনাটা ঘটছে তা যেনো জাদু করেছে তাকে, চোখে হাত চাপা দিলেও আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করলো তাকে।

পাইলট ও ক্লডিয়ার কথা যেনো শুনতেই পায়নি জেনারেল চায়না, কথা বললো মেকানিকের পিঠে বসা অফিসারের সাথে। অফিসার এবার মেকানিকের দুই নিতম্ব হাত রেখে সজোরে চাপ দিয়ে ফাঁক করলো মাঝখানটা। ক্লডিয়ার প্রতিবাদ ও অনুরোধ গলার ভেতরই নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

নিতম্বের মাঝখানে কালচে লাল মাংস কুঁচকে আছে। সেদিকে লাল রঙটা বাড়ালো জেনারেল চায়না। মানুষের সবচেয়ে স্পর্শকাতার মাংসে আগুনের আঁচ অনুভব করলো মেকানিক, এমন প্রচণ্ডভাবে মোচড় খেতে শুরু করলো শরীরটা যে তাকে স্থির রাখার জন্যে আরো দু’জন রেনামো অফিসার গলদঘর্ম হয়ে গেলো।

‘ইয়েস?’ রুশ পাইলটের দিকে তাকালো জেনারেল চায়না। পাইলটের চেহারা দাঁড়িয়েছে ঠিক যেনো একটা বদ্ধ উন্মাদ। তার মুখের পেশী জ্যাক্ত পোকের মতো নড়াচড়া করছে, বিকৃত অবয়বে চোখ দুটো ক্রোধ ও ঘৃণার উৎস, নিজের ভাষায় অনর্গল গালিগালাজ করে চলেছে সে।

‘বাধ্য হয়ে কাজটা করতে হচ্ছে’, বললো চায়না, রডের লাল ডগাটা সামনে বাড়ালো।

রডের ডগা স্পর্শকাতার মাংস ছোঁয়ামাত্র আর্তনাদ করে উঠলো মেকানিক, তার তীক্ষ্ণ গগনবিদারী চিৎকার ক্লডিয়ার কানে যেনো গরম সীসা ঢেলে দিলো। ফুঁপিয়ে উঠলো সে।

রডের চারপাশে ধোঁয়া উঠছে, চর্বি ফোটার আওয়াজ হলো, মাংস পোড়ার গন্ধে ভারি হয়ে উঠলো বাতাস। রডটা নিতম্বের আরো ভেতরে ঢোকাবার জন্যে কজিটা মোচড়াচ্ছে জেনারেল চায়না, মাংস ও চর্বি পুড়িয়ে একটু একটু করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে সেটা। মেকানিকের চিৎকার এখন একটানা আর্তনাদ; কানে হাত চাপা দিয়ে মুখ ঘোরালো ক্লডিয়া, ছুটে চলে গেলো বাংকারের এক কোণে, মুখটা চেপে ধরলো বস্তার কর্কশ দেয়ালে।

ধোঁয়ায় তার নাক গলা ও ফুসফুস ভরে উঠলো — পোড়া মাংসের দুর্গন্ধময় অশ্লীল ধোঁয়া। পুড়ে কয়লা হয়ে ওঠা চর্বির বিষাক্ত ধোঁয়া, ক্লডিয়ার জিভে যেনো লেপ্টে গেলো, জ্যাক্ত প্রাণির মতো আড়মোড়া ভাঙলো পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়ি,

উঠে এলো গলায়। বমির ভাবটা দমন করার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে, তীরের মতো বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়লো দু'পায়ের মাঝখানে মেঝেতে।

তার পিছনে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলো চিৎকারটা, এখন শুধু গোঙাচ্ছে মেকানিক। তার সঙ্গীরা অবশ্য এখনো চিৎকার করছে, কে কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না।

আরেকবার বমি করলো ক্লডিয়া, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোট মুছে কপালটা বালির বস্তার গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। ধব করে কাঁপছে সে, ঘাম আর চোখের জল মোটা ধারা হয়ে নেমে আসছে গাল বেয়ে।

এক সময় সমস্ত আওয়াজ ধেমে গেলো, মাঝে-মধ্যে শুধু মেকানিকের গোঙানির আওয়াজ পাওয়া গেলো। না তাকিয়েও ক্লডিয়া বুঝতে পারলো, লোকটা মারা যাচ্ছে।

‘মিস মনটেরো’, জেনারেল চায়না বললো, তার কণ্ঠস্বর শান্ত। ‘প্লীজ, নিজেকে সামলান, আমাদের হাতে আরো কাজ রয়েছে।’

‘আপনি একটা জানোয়ার!’ বিস্ফোরিত হলো ক্লডিয়া। ‘আপনাকে আমি ঘৃণা করি। ওহ্ গড!’

‘আপনার অনুভূতি সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই’, বললো কমরেড চায়না। ‘দয়া করে পাইলটকে বলবেন কি যে আমি তার সহযোগিতা পাবার জন্যে অপেক্ষা করছি?’

মেকানিকের গোঙানি হঠাৎ বেড়ে গেলো, কি ঘটছে দেখার জন্যে ঘুরলো ক্লডিয়া। দেখলো, বেনামো অফিসাররা তাকে ছেড়ে দিয়েছে, খুলে দিয়েছে হাত-পায়ের বাঁধন, বেঞ্চ থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে শরীরটা। জেনারেল চায়না লোহার রডটা বের করার কোনো চেষ্টা করেনি। দুর্ভাগা লোকটা একটা হাত পিছনে এনে রডটা ধরেছে, দুর্বলভাবে চেষ্টা করছে রডটা বের করার। উত্তপ্ত রড তার নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে গভীরে ঢুকে গেছে, ঠাণ্ডা হবার পর শক্তভাবে আটকে গেছে মাংস ও চর্বি সাথে। যতোবার সেটায় টান পড়লো, পুঁজের মতো হলদেটে তরল পদার্থ বেরিয়ে এলো বীভৎস ক্ষতটা থেকে।

‘পাইলটের সাথে কথা বলুন’, নির্দেশ দিলো জেনারেল চায়না

‘জ্যাস্ত লাশ থেকে চোখ সরালো ক্লডিয়া, পাইলটকে বললো, ‘ঈশ্বরের দোহাই আপনি — রাজি হোন!’

চিৎকার করলো পাইলট, ‘আমি আমার কর্তব্য...!’

‘চুলায় যাক আপনার কর্তব্য!’ পাল্টা চিৎকার করলো ক্লডিয়া। ‘এভাবে সবাই আপনারা ওর হাতে মারা পড়বেন!’ মেকানিকের দিকে না তাকিয়ে একটা হাত লম্বা করে দেখালো সে। ‘আপনাদের প্রত্যেকের এই অবস্থা হবে!’ পাইলটের পাশে

দাঁড়ানো রাশিয়ানদের বললো সে। আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে সবার চেহারা, উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে। ‘ওর দিকে তাকান! চান আপনাদেরও এই অবস্থা হোক?’

ওর ভাষা তারা কেউ বুঝলো না, তবে কি বলতে চাইছে বুঝতে অসুবিধা হলো না কারো। সবাই তারা পাইলটের দিকে তাকালো।

একটা ঢোক গিলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো পাইলট। হেসে উঠলো জেনারেল চায়না, পরমুহূর্তে কর্কশস্বরে একজন অফিসারকে নির্দেশ দিলো সে, ‘আরেকজনকে বেষ্ণের ওপর শোয়াও!’

পাইলটের পাশের লোকটাকেই ধরা হলো। টেনে-হিচড়ে বেষ্ণের কাছে আনা হলো তাকে। সেদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলো পাইলট, তারপর মাথা নিচু করলো। এক সেকেণ্ড পর অসহায়ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো সে, ক্লুডিয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, ‘ওকে ছেড়ে দিতে বলুন। তার নির্দেশ মেনে নেবো আমরা।’

‘ধন্যবাদ, মিস মনটেরো’, মিষ্টি করে হাসলো জেনারেল চায়না। ‘এবার আপনি কর্নেল কোর্টনির কাছে ফিরে যেতে পারেন।’

‘আপনি পাইলটের সাথে কথা বলবেন কিভাবে?’ চেহরায় অনিশ্চিত ভাব নিয়ে জানতে চাইলো ক্লুডিয়া।

‘আমি এখন গ্রীক ভাষায় কথা বললোও বুঝবে ও’, সহাস্যে রসিকতা করলো জেনারেল। ক্লুডিয়ার দিকে পিছন ফিরলো সে। ‘কর্নেল কোর্টনিকে আমার অভিনন্দন জানাবেন, বলবেন তার সময়মতো একবার যেনো দেখা করেন আমার সাথে, বিদায়ের সময়টায় ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাবো।’ আবার ক্লুডিয়ার দিকে ফিরলো সে, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে মাথা নত করে বাউ করলো। ‘আশা করি আমাদের কথা মনে রাখবেন আপনি — আফ্রিকায় আমরা যারা আপনার বন্ধু — শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে।’

বলার মতো কিছু খুঁজে পেলো না ক্লুডিয়া, দরজার দিকে ঘুরে টলতে টলতে এগোলো সে, বেরিয়ে এলো বাংকার থেকে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার সময় চারদিকের নারকীয় দৃশ্য তাকে একটুও বিচলিত করলো না, অন্য সময় হলে অসুস্থ হয়ে পড়তো। ঢালের নিচে নেমে এসে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থামলো ক্লুডিয়া, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলো। বড় করে কয়েকবার শ্বাস টানার পর ফোঁপানোর ঝাঁকটা কমলো। আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়ালো সে। কপাল ঢাকা পট্টিটা নতুন করে বাঁধলো। শার্টের কোণ দিয়ে মুখ থেকে পানি ও ঘাম মুছলো।

জোবের কমল ঢাকা শরীরের পাশে এখনো অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে রয়েছে শন, ক্লুডিয়াকে আসতে দেখে ধমকের সুরে জানতে চাইলো, ‘এতো দেরি করলে কেন?’

‘জেনারেল চায়না...পরে শুনো। জোব কেমন আছে?’

‘পুরো এক লিটার প্লাজমা দিয়েছি ওকে...তোমার কি হয়েছে বলো তো?’

‘জেনারেল চায়না আমাকে আটকে রেখেছিল একটা কাজে। পরে শুনো। জোবের....।’

‘ওর পালস আগের চেয়ে ভালো। ও তো আসলে একটা লড়াকু ঝাড়। এসো, তোমার সাহায্য লাগবে, ক্ষতটা ড্রেস করি।’

‘ওর কি জ্ঞান আছে?’

‘এই আছে এই নেই।’

ফিল্ড ড্রেসিংয়ের নিচে জখমটা এতোই মারাত্মক, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে ভয় পেলো ওরা, জোব যদি শুনে ফেলে ওদের কথা। আয়োডিন পেস্ট দিয়ে পুরো ক্ষতটা লেপে দিলো শন, তারপর নতুন করে প্রেশার প্যাড ও পরিষ্কার সাদা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে জড়ালো।

দু’জন ধরাধরি করে পাশ ফেরাতে হলো জোবকে, ব্যাণ্ডেজটা পিঠে জড়ালো। প্রায় বিচ্ছিন্ন হাতটা জায়গামতো বসিয়ে ধরে রাখলো ক্লডিয়া, শক্তভাবে স্ট্র্যাপ দিয়ে সেটাকে বাঁধলো শন। কাজ শেষ হবার পর দেখা গেলো জোবের সম্পূর্ণ উর্ধ্বাঙ্গ ব্যাণ্ডেজে ঢাকা পড়ে গেছে, বেরিয়ে আছে শুধু বাম হাতটা। ‘আবার পালস পাচ্ছি’, হাতঘড়ি থেকে চোখ তুললো শন। ‘আরো এক লিটার প্লাজমা দেবো ওকে।’

হেলিকপ্টার ঘাঁটির পিছনে, উঁচু একটা পাহাড়ের ওদিক থেকে হঠাৎ মেশিনগান ও মর্টারের আওয়াজ ভেসে এলো। মুখ তুলে তাকালো ক্লডিয়া। ‘কি ব্যাপার?’

‘ফ্রেলিমো কাউন্টার-অ্যাটাক’, বললো শন, এখনো ড্রিপ সেট নিয়ে ব্যস্ত ও। ‘তবে ওদিকে জেনারেল চায়নার গেরিলারা আছে। হিন্দগুলো হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে ফ্রেলিমোরা, বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না। ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখবে রেনামোরা।’

‘শন, চায়না হঠাৎ করে কোথেকে এলো বলো তো? আমি ভেবেছিলাম...।’

‘হ্যাঁ, আমিও ভেবেছিলাম নদীর ধারে রয়ে গেছে সে। আসলে আমাদের পিছু নিয়েছিল’, কাজ শেষ করে ক্লডিয়ার পাশে সোজা হলো শন। ‘কি ঘটলো ওখানে?’

‘কিছু না’, জোর করে হাসলো ক্লডিয়া।

‘আমাকে লুকিয়ো না’, নরম সুরে বললো শন, ক্লডিয়ার কাঁধে হাত রাখলো।

নিজেকে সামলাতে পারলো না ক্লডিয়া, ফুঁপিয়ে উঠলো। ‘চায়না’, ফিসফিস করলো সে, ‘একটা পশু। সে আমাকে দেখতে বাধ্য করলো....’, থেমে গেলো ক্লডিয়া।

‘খারাপ কিছু?’ জিজ্ঞেস করলো শন।

মাথা বাঁকালো ক্লডিয়া। ‘একজন রাশিয়ানকে খুন করেছে সে, এমন অশ্লীলভাবে...।’

কুড়িয়া বলতে পারছে না দেখে শন তাকে সাব্বনা দিলো, 'ঠিক আছে, ভুলে যাও সব।'

'রাশিয়ান পাইলটকে হিন্দ চালাতে রাজি করিয়েছে সে।'

'তার যা খুশি করুক সে। আমাদেরকে চলে যেতে বাধা না দিলেই হলো।' উল্লাস ধ্বনি শুনে ঘাড় ফেরালো শন, দেখলো পাঁচ-সাতজন রেনামো গেরিলা ঢাল বেয়ে ছুটে আসছে এদিকে, তাদের মধ্যে শাঙ্গানি সার্জেন্ট আলফনসোও রয়েছে। প্রত্যেকের মাথায় ও কাঁধে লুট করা মালপত্র।

সুদর্শন আলফনসো শনের সামনে এসে এক গাল হাসলো। 'কি একটা যুদ্ধ! কী সাংঘাতিক বিজয়!'

'তোমার বুকে সিংহের সাহস', বললো শন। 'শোনো, যুদ্ধে আমরা জিতেছি। এবার তোমার দায়িত্ব, আমাদেরকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। ক্যাপটেন জোব আহত হয়েছে।'

জোবের দিকে এতক্ষণে তাকালো আলফনসো। 'খুব খারাপ?'

'ফার্স্ট-এইড পোস্টে একটা ফাইবার গ্লাস স্ট্রেচার আছে', বললো কুড়িয়া। 'আমরা জোবকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবো।'

'সীমান্ত দু'দিনের পথ', বিড় বিড় করলো আলফনসো, তার গলায় সন্দেহ, 'যেতে হবে ফেলিমো এলাকার স্তের দিয়ে।'

'লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে ফেলিমোরা', বললো শন, সুরটা কঠিন। 'তোমার লোকদের বলো স্ট্রেচারটা নিয়ে আসুক।'

'জেনারেল চায়না আপনাকে ডেকেছেন। হিন্দে চড়ে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছেন তিনি, যাবার আগে আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

'ঠিক আছে, তবে ফিরে এসে যেনো দেখি স্ট্রেচারটা আনা হয়েছে', বলে হাতঘড়ি দেখলো শন। 'এক ঘন্টার মধ্যে রওনা হবো আমরা।'

'ইয়েস, বাওয়ানা', সহাস্যে রাজি হলো আলফনসো। 'আমরা ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

কুড়িয়ার দিকে ফিরলো শন। 'চায়নাকে বলে দেখি, জোবকে হেলিকপ্টারে করে পাঠানো যায় কিনা। আমি না ফেরা পর্যন্ত ওর পাশে থাকো। পালস রেটটা দেখবে। মেডিক প্যাকে অ্যাম্বুলেন্সালিন ও সিরিঞ্জ থাকলো, তবে অবস্থা একেবারে খারাপ না হলে ব্যবহার করো না।'

'প্লীজ, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, শন!' ফিসফিস করলো কুড়িয়া। 'আমি সাহস পাই শুধু তুমি কাছে থাকলে।'

'তোমার সাথে মাতাউ থাকলো।'

পাহাড়ে চড়ার সময় ভারবাহী একদল রেনামো পোর্টারকে দেখলো শন। বহনযোগ্য সমস্ত কিছু সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে জেনারেল চায়না। পোর্টারদের মাথায় হেলিকপ্টারের স্পেয়ার পার্টস ভরা কাঠের বাক্স ও ফুয়েল ক্যানও ওয়েছে। মালপত্র নিচে নামছে তারা, বনভূমির ভেতর দিয়ে চলে যাবে নদীর দিকে। শন অন্যমনস্ক, নিজেদের কথা ভাবছে। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে জোব, বাঁচার প্রায় কোনো আশাই নেই, তবু তাকে ফেলে যাবে না ও। চারদিকে শত্রু, দলে একজন আহত লোক থাকা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি বিপজ্জনক সুন্দরী একটা মেয়ে থাকা। কুড়িয়া শুধু সুন্দরী নয়, শ্বেতাঙ্গিনী — আফ্রিকার কালোরা দু' চোখে দেখতে পারে না। শত্রুদের হাতে ধরা পড়লে তাকে ওরা ছিড়ে ফেলবে।

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সীমান্তে পৌঁছানোর জন্যে অস্থির হয়ে আছে শন। জোবের চিকিৎসা দরকার, দরকার কুড়িয়াকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু যতোই অস্থির হোক ও, সীমান্তের দিকে ওদের রওনা হতে পারাটা নির্ভর করছে জেনারেল চায়নার মর্জির ওপর। সে কি তার কথা রাখবে? নির্বিঘ্নে যেতে দেবে ওদেরকে?

পাহাড়ের মাথায় উঠে এসে একজন রেনামো অফিসারকে জিজ্ঞেস করলো শন, 'জেনারেল চায়না কোথায়?'

হেলিকপ্টার ঘাঁটি কমাও বাংকারে বন্দী রাশিয়ানদের সাথে রয়েছে জেনারেল। ম্যাপ থেকে চোখ তুলে শনকে দেখলো সে। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কালো চকচকে চেহারা। 'কর্নেল কোর্টনি, আমার শত সহস্র অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনি সত্যি বীরপুরুষ। বিজয়টা সত্যি গর্ব করার মতো।

'এবার আপনার ঋণ শোধ করার পালা।'

'আপনারা বিদায় নিতে চান', বললো কমরেড চায়না। 'আমার ও আপনার মধ্যকার সমস্ত দেনা-পাওনা মিটে গেছে। আপনারা মুক্ত, যখন খুশি চলে যেতে পারেন।'

'না', বলে মাথা নাড়লো শন। 'আমার হিসেবে, আরো কিছু পাওনা হয়েছে। ক্যাপটেন জোব মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে তাকে। আমি চাই হিন্দে করে তাকে জিম্বাবুইয়ে নিয়ে যাওয়া হোক।'

'আপনি কৌতুক করছেন, বোঝাই যাচ্ছে', হালকা সুরে হেসে উঠলো জেনারেল চায়না। 'হিন্দে আমার মূল্যবান একটা সম্পদ, আন-প্রোডাকটিভ কোনো মিশনে ওটাকে আমি পাঠাতে পারি না। সমস্ত দেনা-পাওনা মিটে গেছে, কর্নেল, অতিরিক্ত কিছু চেয়ে পরিস্থিতিটাকে জটিল করবেন না, প্লিজ। কানে আমি কম গুনি, আপনি জানেন; কি শুনতে কি শুনবো, আমার মেজাজ বিগড়ে যাবে — রাগের মাথায়

সিদ্ধান্তটা পাল্টাতে পারি, আপনাদেরকে নির্বিঘ্নে যেতে দিতে মনের সায় না-ও পেতে পারি।’ হাসিমুখে হাতটা শনের দিকে বাড়িয়ে দিলো সে।

‘আসুন, বরং বন্ধু হয়েই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই আমরা। সার্জেন্ট আলফনসো ও তার লোকজন আপনাদেরকে সঙ্গ দেবে। আপনি তো একাই একশো, আমার কোনো সাহায্য আপনার দরকার হবে বলে মনে হয় না।’

বাড়ানো হাতটা দেখেও না দেখার ভান করলো শন। নিজের হাতটার দিকে একবার তাকিয়ে শরীরের পাশে ফিরিয়ে আনলো জেনারেল চায়না ‘প্রার্থনা করি আপনারা যেনো নিরাপদে সীমান্তে পৌঁছতে পারেন, কর্নেল’, শনের দিকে পিছন ফিরলো সে, চোখ রাখলো ম্যাপে।

গোটা ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ লাগলো শনের, ও যেনো আশা করেনি বিদায় পর্বটা এতো সহজে সারা যাবে। ওর মনে হলো, আরো কিছু নিশ্চয়ই ঘটবে। কিন্তু জেনারেল চায়না ম্যাপের দিকে চোখ রেখে অফিসারদের সাথে রণকৌশল নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়লো, শনের উপস্থিতি সম্পর্কে যেনো কোনো ধারণাই নেই।

আরো এক মিনিট অপেক্ষা করার পর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বাংকার থেকে বেরিয়ে গেলো শন। এক সেকেণ্ড পর দরজার দিকে ফিরলো জেনারেল চায়না, ধীরে ধীরে বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটলো তার মুখে। যে প্রশ্নটা শনের মনে জেগেছে, ওই হাসিতে তার উত্তর রয়েছে, কিন্তু শনের তা দেখার সুযোগ হলো না।

\* \* \*

শনকে দেখে স্বস্তিবোধ করলো কুড়িয়া। ‘এতোক্ষণে নড়াচড়া করছে জোব’, বললো সে। ‘জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে তোমাকে খুঁজছিল। বারবার বলছিল একত্রিশ নম্বর পাহাড়, একত্রিশ নম্বর পাহাড়।’

ক্ষীণ হাসি ফুটলো শনের চোটে। ‘ওখানেই প্রথম পরিচয় হয়েছিল আমাদের। এসো, স্ট্রেচারে তুলি ওকে।’

অত্যন্ত সাবধানে স্ট্রেচারে তোলা হলো তাকে। জোবের মাথার ওপর তারের একটা ফ্রেম তৈরি করতে শন, ড্রিপ সেটটা ঝুলিয়ে দেয়া হলো লুট করা মোটা একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো শরীরটা।

‘মাতাউ’, সোজা হয়ে বললো শন। ‘পথ দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে চলো আমাদের।’ হাত-ইশারায় স্ট্রেচার বাহকদের রঙনা হতে বললো ও।

সূর্য ওঠার পর দু’ঘণ্টাও পেরোয়নি, কিন্তু মনে হলো এই অল্প সময়ের ভেতর গোটা একটা জীবন পার হয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ফিরিয়ে হেলিকপ্টার ঘাঁটির দিকে একবার তাকালো শন। এতো দূর থেকেও পাহাড়ের চূড়াটা দেখা গেলো পরিষ্কার। চূড়া থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে।

দূর থেকে ভেসে আসা গোলাগুলির আওয়াজ ঋনিক আগেই থেমে গেছে। ফ্রেন্সিসেরা হিন্দু গানশিপের সাহায্য পায়নি, রণে ভঙ্গ দিয়ে ভেগেছে তারা। জেনারেল চায়না তার বাহিনীকে পান্ডুর নদীর কিনারায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবার।

এখনো তাকিয়ে আছে শন, হঠাৎ দখল করা হিন্দটাকে পাহাড়ের মাথায় উদয় হতে দেখলো। ধীরে ধীরে ঘুরে গেলো হিন্দ, ওদের দিকে মুখ করলো, নাকটা তাক করলো সরাসরি ওদেরকে লক্ষ্য করে। এদিকেই এগিয়ে আসছে গানশিপ।

এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে। এক সময় আশপাশের গাছের পাতা কাঁপতে শুরু করলো। হিন্দের নাকে গাটলিং-কামান বসানো রয়েছে, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শন।

ফাঁকা জায়গায় রয়েছে ওরা, আড়াল পাবার কোনো উপায় নেই। হিন্দ গানশিপ আরো কাছে চলে এলো। আর্মার্ড গ্লাস বুদবুদের ভেতর জেনারেল চায়নার মুখ পরিষ্কার দেখতে গেলো শন, ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের সিটে বসে আছে, সামনে ১২.৭ এমএম কামানের কন্ট্রোল। কামানের ব্যারেলগুলোকে ধীরে ধীরে ঘুরে যেতে দেখছে শন, সরাসরি ওদের দিকে তাক করা হলো। হিন্দ এখন ওদের মাথা থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে, এতো কাছে যে জেনারেল চায়নার কালো মুখের মাঝখানে সাদা দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখা গেলো।

দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো শন, কোনো আড়াল নেই দেখে হাত বাড়িয়ে কুড়িয়াকে নিজের কাছে টেনে আনলো ও, জড়িয়ে রাখলো গায়ের সাথে। মাথার ওপর থেকে ওদেরকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে স্যালাট করলো জেনারেল চায়না, দ্রুত বাঁক ঘুরে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গেলো হিন্দ। সবাই ওরা সেদিকে

বিস্ময়দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো, বিপজ্জনক মুহূর্তটা পেরিয়ে এসেও নড়াচড়ার শক্তি পেলো না। নিশ্চিন্ত ভাঙলো শন, 'লেট'স গো!'

স্ট্রেচার-বেয়ারাররা আবার হালকা পায়ে ছুটলো, নরম সুরে প্রাচীন গানের কলি ভাঁজছে তারা — দূরের পথ পাড়ি দেয়ার সময় এই সুর যুগ যুগ ধরে ওদেরকে শক্তি যুগিয়ে আসছে।

দলের সামনে রয়েছে মাতাউ, মাঝে মধ্যে ফিরে এসে শনের কাছে রিপোর্ট করছে সে। ছড়ানো-ছিটানো ফ্রেলিমো অ্যাসল্ট টিমের খবর আনলো সে, প্রাণ হাতে করে এখনো তারা পালাচ্ছে। বনজুমির ভেতর নিরাপদ আড়াল পেয়ে কোথাও কোথাও দু' একটা দল বিশ্রাম নিচ্ছে, তাদেরকে এড়াবার জন্যে ওদেরকে যুরপথ দেখালো মাতাউ।

রাত নামার পর খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রামের জন্য থামলো ওরা। নির্দিষ্ট সময়ে রেনামো হেডকোয়ার্টারের সাথে রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করলো আলফনসো, ওদের পরিস্থিতি জানিয়ে দিলো। অপরপ্রান্ত রিপোর্টটা গ্রহণ করলো, কোনো মন্তব্য করলো না বা নতুন কোনো নির্দেশও দিলো না।

আবার জ্ঞান ফিরে পেলো জোব, খসখসে গলায় অজিযোগ করলো, 'একটা সিংহ আমার কাঁধটা আঁচড়াচ্ছে।'

ড্রিপ সেটে এক অ্যাম্পুল মরফিন মেশালো শন, ভরি আরাম বোধ করলো জোব। খানিকটা মাংস চিবালা সে, তবে বিদে চেয়ে পিপাসা বেশি। তার মাথাটা উঁচু করে ধরে রাখলো শন, ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে পুরো দু' মগ ব্রাশিয়ান কফি খেলো সে। স্ট্রেচারের পাশে বসে থাকলো শন ও ক্রুডিয়া, অপেক্ষায় রয়েছে কখন চাঁদ উঠবে। 'আবার আমরা হোণ্ডি উপত্যকার ভেতর দিয়ে যাবো', জোবকে বললো শন। 'সেন্ট মেরিতে একবার পৌঁছতে পারলে তোমাকে নিয়ে আর কোনো চিন্তা নেই। ওখানকার ক্যাথলিক ফাদার নিজেই একজন ডাক্তার। আমার এক বন্ধু আছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, সেনাবাহিনীতে চাকরি করেন। চামড়া সাদা হলেও, কালোদের প্রতি তার দরদ আছে। তোমার জন্যে উমতলীতে একটা জেট পাঠাতে বলবো তাঁকে। সেই জেটে চড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যাবে তুমি, আধুনিক একটা হাসপাতাল তোমার চিকিৎসা হবে।'

চাঁদ ওঠার পর আবার রওনা হলো ওরা। মাঝরাতে থামার নির্দেশ দিলো শন। ঘাস কেটে এনে জোবের স্ট্রেচারের পাশে বিছানা তৈরি করলো ও, ওর বাহর ওপর মাথা রেখে ঘুমোবার জন্যে চোখ বুজলো ক্রুডিয়া। শন তার কানের কাছে ফিসফিস করলো, 'কালরাতে, বুঝলে, শাওয়ারের পানিতে গোসল করতে পারবে তুমি, শুতে পারবে পরিষ্কার চাদরে।'

'কথা দিচ্ছে?'

'ইশ্বরের কসম।'

ভোর হতে একঘন্টা বাকি তখনো, ঘুম ভেঙে গেলো শনের। ক্লুডিয়ার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রহরীদের ঘুম ভাঙাতে গেলো ও। গায়ের কম্বল ফেলে দিয়ে দাঁড়ালো আলফনসো, পাশাপাশি হাঁটছে দু'জন। ক্যাম্পটা একচক্কর ঘুরে এসে কিনারার কাছে এক জায়গায় থামলো ওরা, শনকে একটা রাশিয়ান সিগারেট সাধলো আলফনসো। মুঠোর ভেতর আড়াল করে ধূমপান করলো ওরা।

‘দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন আপনি আমাকে, সব কি সত্যি?’ অপ্রত্যাশিতভাবে জানতে চাইলো আলফনসো।

‘কি বলেছি বলো তো?’

‘যে একজন কালো মানুষ ওখানে দুই বেলা খেতে পারে?’

শন মুচকে হাসি। হায় ইশ্বর, স্বর্গের ধারণা বলতে দুই বেলা খাওয়ার অধিকার — এর বেশি কিছু এরা কল্পনা করতে পারে না! হায় আফ্রিকা!

‘হা, পারে। মাঝেমধ্যে মাংস খেতে খেতে মুখে অরুচি ধরে যায় ওদের।’

‘সত্যি?’

সত্যি।’

‘আর বেতন?’

বড়ো একটা অঙ্ক শোনালো শন, সার্জেন্টকে।

‘তুমি চাইলে, আলফনসো, আমার ফার্মে কাজ করতে পারো। ওখানে আমার আর আমার ভাইয়ের একটা স্বর্ণের খনি আছে। সুপারভাইজারের কাজ করতে পারো।’

‘আমি সুপারভাইজারের কাজ করতে পারি..’ বিড়বিড় করে আলফনসো বলে।

আড়মোড়া ভেঙে আকাশের দিকে তাকালো শন। আকাশের গায়ে এখন গাছের ঝাঁকড়া মাথা দেখা যাচ্ছে। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। সিগারেটটা নিভিয়ে ঘুরতে যাচ্ছে, হঠাৎ এমন সুরে কথা বললো আলফনসো, স্থির হয়ে গেলো ও।

‘খুব জরুরী একটা কথা বলবো আপনাকে’, ফিসফিস করলো সে। আলফনসোর দিকে ফিরলো শন। ‘বলো।’

‘একসাথে অনেকটা পথ হেঁটেছি আমরা’, বিড়বিড় করলো আলফনসো।

‘লম্বা ও কঠিন পথ’, সায় দিলো শন। ‘তবে সামনেই পথের শেষ। কাল এই সময়...’ বাকিটা শেষ করার প্রয়োজনবোধ করলো না।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলো আলফনসো। তারপর বললো, ‘আমি আপনাকে ওস্তাদ ও গুরু বলে সম্বোধন করতে চাই।’

‘আমি সম্মানিত বোধ করছি’, বললো শন। ‘আমিও চাই তুমি আমাকে বন্ধু বলে জানো।’

অন্ধকারে মাথা ঝাঁকালো আলফনসো, ‘আমরা কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছি।’

‘সিংহের মতো’, আবার সায় দিলো শন।

গলাটা গভীর হলো আলফনসোর, 'আমি আপনাকে জিম্বাবুই সীমান্ত পেরুতে দিতে পারি না।'

বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো শনের 'কি কারণে?'

'জেনারেল চায়নার সেই আত্মীয়টির কথা মনে আছে আপনার? কুথবার্ট?'

'গ্রাণ্ড রীফে হানা দেয়ার সময় যে লোকটা আমাদেরকে সাহায্য করলো চায়নার ভাগ্নে না কি যেনো হয়?'

'হ্যাঁ। তার কথাই বলছি।'

'মনে আছে।'

'তার সাথে রেডিওতে কথা হয়েছে জেনারেল চায়নার। বাজপাখির আস্তানায়, আজ সকালে, আমরা বিজয়ী হবার পর। পাশের বাংকারে ছিলাম আমি। তাঁর সব কথাই শুনেছি।'

শনের শিরদাঁড়া শিরশির করছে। মাথার পিছনে চুল দাঁড়িয়ে গেলো। 'কি বললো তাকে চায়না?' জানতে চাইলো ও।

'তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ দিলেন, জিম্বাবুই সেনা-বাহিনীকে যেনো জানানো হয় যে আপনার নেতৃত্বেই গ্রাণ্ড রীফে হামলা চালানো হয়, মিসাইলগুলো চুরি করা হয়েছে আপনারই প্ল্যান অনুসারে। ভাগ্নেকে তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন— সে যেনো জিম্বাবুই সেনাবাহিনীকে জানিয়ে দেয় আপনি হোণ্ডি উপত্যকা হয়ে সেন্ট মেরিতে যাচ্ছেন। তারমানে, ধরে নিতে পারেন, আপনার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করবে ওরা।'

জেনারেল চায়নার ফাঁদটার তাৎপর্য উপলব্ধি করে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকলো শন। গোটা ব্যাপারটাই তাহলে নিমর্ম প্রহসন। ওদেরকে মুক্ত করে দিয়েছে, কিন্তু ওরা যেখানে পৌঁছুবে সেখানে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে নিজের চেয়েও ভয়ংকর একদল হায়েনাকে।

জিম্বাবুইয়ের হাই কমান্ড কি রকম খেপে আছে কল্পনা করতে ভয় পেলো শন। ওর সাথে জিম্বাবুইয়ান পাসপোর্ট রয়েছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহী ও খুনী বলে বিচার করা হবে তার। জিম্বাবুই সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন-এর হাতে তুলে দেয়া হবে ওকে। ভরা হবে এন্টারোগেশন সেল-এ। ওখান থেকে কোনোদিনই প্রাণ নিয়ে ফেরা হবে না শনের। হোক আহত, একই পরিণতি হবে জোবেরও।

কুডিয়া আমেরিকার নাগরিক হলেও, অফিশিয়ালি তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তার নিখোঁজ হবার সংবাদ প্রচার করার পর কয়েক সপ্তা পেরিয়ে গেছে তার ব্যাপারে মার্কিন দূতাবাসের উদ্বেগও অনেক কমে গেছে ইতিমধ্যে। ধরে নেয়া হয়েছে বাপ-বেটি দু'জনেই মারা গেছে। অর্থাৎ কুডিয়ার কোনো রকম প্রোটেকশন পাচ্ছে না।

ফাঁদটা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন, কোথাও কোনো ফাঁক নেই। রেনামো আর্মি রয়েছে ওদের পিছনে, দু'পাশে ফ্রেলিমো বাহিনী, সামনে জিম্বাবুই সিআইএ। ওরা আটকা

পড়ে গেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত দুর্গম এলাকায়, বাকি রয়েছে শুধু বন্যপ্রাণির মতো গুলি খেয়ে নিহত হওয়া অথবা গভীর বনভূমিতে না খেতে পেয়ে মারা যাওয়া।

‘চিন্তা করো’, নিজেকে তাগাদা দিলো শন। ‘একটা উপায় খুঁজে বের করো। বাঁচতে হবে তোমাকে।’

হোণ্ডি উপত্যকা এড়িয়ে অন্য কোথাও দিয়ে সীমান্ত পেরোবার চেষ্টা করতে পারে ওরা, তবে সিআইড্র সম্ভবত গোটা দেশের সবখানে সতর্ক থাকার নির্দেশ পাঠিয়েছে। সব ক’টা রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে রাখবে সেনাবাহিনীর লোকজন। উপযুক্ত কাগজ-পত্র না থাকলে কয়েক মাইলের বেশি এগোতে পারবে না ওরা। তাছাড়া, ওদের সাথে জোব রয়েছে। জোবকে নিয়ে কি করবে ওরা? পুলিশ ও সৈনিকরা স্ট্রিচারে শুয়ে থাকা একজন লোককে খুঁজছে, এই পরিস্থিতিতে কিভাবে ওরা জোবকে নিয়ে যাবে?

‘আমাদের যেতে হবে দক্ষিণ দিকে’, বললো আলফনসো। ‘বাঁচার এই একটাই উপায়, বাওয়ানা। দক্ষিণ, মানে দক্ষিণ আফ্রিকা।’

‘আমরা?’ আলফনসোর দিকে তাকিয়ে থাকলো শন। ‘তুমি আমাদের সাথে যেতে চাইছো?’

‘জেনারেল চায়নার কাছে ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই আমার’, বললো আলফনসো। ‘কারণ এইমাত্র তাঁর সাথে বেসমানী করলাম আমি। আপনাকে বলে দিলাম সব। আপনাদের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই যাবোঁ।’ একটু হাসলো, তারপর আবার বললো, ‘আপনাদের সাথে যেরকম বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করলো, একজন শাস্ত্রানি যোদ্ধা সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না — এটা অতিশয় নীচতা।’

কয়েক সেকেন্ড অপর অন্য একটা সমস্যার কথা বললো শন। ‘দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত এখান থেকে হাঁটাপথে তিনশো মাইল, আলফনসো। এই তিনশো মাইল পেরুতে হবে পরস্পর বিরোধী দুটো আর্মির মাঝখান দিয়ে — ফেলিমো ও রেনামোদের দক্ষিণ ডিভিশন যুদ্ধ করছে শুদিকে। তাছাড়া, জোবকে নিয়ে কি করবো আমরা?’

‘আমরা ওকে বয়ে নিয়ে যাবোঁ’, জবাব দিলো আলফনসো।

‘তিনশো মাইল?’

‘বয়ে নিয়ে যেতে না পারলে’, কাঁধ ঝাঁকালো আলফনসো, ‘ফেলে রেখে যাবোঁ। ও তো স্রেফ ম্যাটাবেল, ম্যাটাবেলকে আমরা পুরোপুরি মানুষ মনে করি না। তাছাড়া, লোকটা তো মরেই যাচ্ছে। শুধু শুধু একটা বোঝা বয়ে লাভ কি!’

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলো শন, ফণা তোলা রাগটাকে দমন করলো। শান্ত্বন্যে শুধু বললো, ‘ওই বোঝাটা আমার খুব প্রিয়, আলফনসো। এ-ধরনের কথা আর মুখে এনো না।’ সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলো ও।

যেদিক থেকেই দেখলো শন, একমাত্র আলফনসোর পরামর্শটাই গ্রহণযোগ্য মনে হলো ওর কাছে। দক্ষিণ দিকে যাওয়া ছাড়া সত্যি কোনো উপায় নেই। উত্তর দিকে মালাবি, ঘিরে আছে কাবোরা বাসা-র পানি ও জেনারেল চায়নার ডিভিশন। পূর্ব দিকে ভারত মহাসাগর। পশ্চিমে জিম্বাবুই

‘ঠিক আছে’, অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো শন। ‘দক্ষিণের পথেই বাঁচার একমাত্র উপায়। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে রেনামোদের দক্ষিণ ডিভিশন আর ফেলিমোদের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাওয়া যায় কিনা। রেললাইনটা পার হতে হবে, তাই না? কড়া পাহারা রয়েছে ওখানে। তারপর পেরুতে হবে লিমপোপো নদী। কিন্তু রেললাইন ও নদী পার হবার আগেই মারা যেতে পারি আমরা-না খেতে পেয়ে। দশ বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে, গোটা এলাকায় লোক বসতি বা চাষাবাস বলে কিছু নেই, কোথায় পাবো খাবার?’

‘দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা প্রতিদিন মাংস খাবো,’ মনে করিয়ে দেয় আলফনসো।

শন জানতে চাইলো, ‘তোমার লোকজনরা কি করবে? তারাও কি তোমার সাথে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে রাজি হবে?’ আফ্রিকান নিগ্রোদের জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ কোনো সমস্যা নয়, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আশপাশের দেশগুলো থেকে বহু লোক প্রায় রোজই কিছু কিছু ঢুকছে। তাদেরকে বণ্ড সই করতে হয়, কথা দিতে হয় খনিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করবে।

‘যেতে রাজি হবে না মানে? আমি ওদের লিডার, যা বলবো তাই শুনতে হবে—যে শুনবে না তাকে আমি গুলি করে মারবো!’ এক নিমেষে হিংস্র হয়ে উঠলো আলফনসোর চেহারা। ‘ওদেরকে আমরা জেনারেল চায়নার কাছে ফিরে যেতে দিতেও পারি না।’

‘পারি না’, বললো শন। ‘তোমার আরও একটা কাজ, নিয়মিত রেডিও মেসেজে চায়নাকে জানিয়ে দেবে আমি জিম্বাবুই সীমান্ত পার হয়েছি। চার কি পাঁচদিন চায়নাকে আমরা বোকা বানিয়ে রাখতে পারবো। আমরা যে দিক বদলে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি, একসময় টের পেয়ে যাবে সে। তবে ততক্ষণে আমরা তার নাগালের বাইরে চলে যাবো। তুমি বরং এখুনি তোমার লোকদের সাথে কথা বলো। দিক আমরা এখনই বদলাবো। তারা কিছু সন্দেহ করার আগে তোমারই জানানো উচিত।’

সেন্সিট্টিভ ডেকে পাঠালো আলফনসো। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় কালো লোকগুলোকে দানবের মতো লাগলো, লিডারের ডাক পেয়ে সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে। আলফনসোকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ালো তারা। উদাস্তকণ্ঠে, আবেগ মেশানো ভাষায় বক্তব্য রাখলো। খাওয়া-পড়ার নিশ্চয়তা দিলো।

কুড়িয়া ও জোবের কাছে ফিরে এলো শন। ভিজে কাপড় দিয়ে জোবের মুখটা মুছিয়ে দিচ্ছে কুড়িয়া। ‘ভালো আছে ও’, শনকে বললো সে। ‘রাত্রে ভালো ঘুম হয়েছে তো।’ তারপর শনের চেহারা দেখে বিস্মিত হলো সে।

পরিস্থিতিটা ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করলো শন।

চেহারা স্নান হয়ে গেলো কুড়িয়ার। ‘এতো সহজে মুক্তি পাচ্ছি, আমার বিশ্বাসই হতে চাইছিল না’, বিড়বিড় করে বললো সে। ‘মন বলছিল, কিছু একটা ঘটবে, জেনারেল চায়না ছদ্মবেশী দেবদূত নয়।’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্ট্রেচারের পাশে বসলো শন, জোবের পালস দেখলো। ওর হোঁয়া পেয়ে চোখ মেললো জোব। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, ‘শাস্ত্রানিদের আপনি বিশ্বাস করছেন, বাওয়ানা?’

‘আর উপায়ই বা কি, বলো? আমরা...।’

শনকে বাধা দিলো জোব। ‘বাওয়ানা, আপনাকে আমি নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। তার প্রমাণ অতীতে অনেকবার আপনি পেয়েছেন।’

‘পেয়েছি।’

‘আজ আরেকবার সেটা আমি প্রমাণ করতে চাই।’

‘কোনো দরকার নেই।’

‘আমি তো গেছিই, কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না’, বিড়বিড় করে বললো জোব। ‘কাজেই আমি চাই না, আমার জন্যে আপনিও মারা পড়েন।’

‘চুপ!’ কঠিন সুরে ধমক দিলো শন।

‘আমাকে এখানে রেখে যান’, কাতরকণ্ঠে অনুনয় করলো জোব। ‘আপনার দোহাই লাগে, বাওয়ানা।’

‘জোব!’ রাগে কঁপে উঠলো শন গলা।

‘আমি না থাকলে বাঁচার একটা আশা আছে আপনাদের’, অস্পষ্টকণ্ঠে বললো জোব। ‘এই স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে যেতে হলে পিছিয়ে পড়বেন আপনারা...।’

‘আমাদের সাথে বিশজন তাগড়া শাস্ত্রানি রয়েছে কি করতে?’

‘সবাই মারা যাওয়া চেয়ে দু’চারজন যদি ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে পারেন, সেটাই কি ভালো নয়, বাওয়ানা? আমাকে রেখে যান, প্রীজ। নিজেকে বাঁচান, কুড়িয়া ডোন্ নাকে বাঁচান। আপনি বেঁচে থাকলে আপনার স্মৃতিতে আমারও বেঁচে থাকা হবে, সেটাই আমার জীবনের পরম সার্থকতা বলে জানবো। আমি চাই না আমি আপনার বিপদ বা মৃত্যুর কারণ হই, নিজেকে তাহলে কোনো দিন ক্ষমা করতে পারবো না। প্রীজ, বাওয়ানা!’

‘জোব, আমি কিন্তু সত্যি রেগে যাচ্ছি।’ সোজা হলো শন, কুড়িয়াকে বললো, ‘দশ মিনিটের মধ্যে রওনা হবো আমরা।’

সারাটা দিন সতর্কতার সাথে দক্ষিণ দিকে এগোলো ওরা। স্বস্তিকর ব্যাপার হলো হিন্দ গানশিপের ঝোঁজে আকাশের ওপর নজর রাখতে হচ্ছে না, তবু

অভ্যেসবশত শালানিরা মাঝেমধ্যেই মুখ তুলে দেখে নিলো আকাশটা। যতোই রেললাইনের কাছে চলে এলো ওরা, ততোই মস্কর হয়ে পড়লো হাঁটার গতি। বেশিরভাগ সময় ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে থাকার চেষ্টা করলো দলটা, যতাক্ষণ না পিছিয়ে এসে রিপোর্ট করলো মাতাউ সামনে পথ নিষ্কণ্টক।

শেষ বিকেলে একটা ঝোপ বহুল নালার তলায় দলটাকে লুকিয়ে থাকতে বলে মাতাউর সাথে একা সামনে বাড়লো শন। দু'ঘন্টা পর ফিরে এলো, সূর্য ইতিমধ্যে দিগন্তরেখা ছুঁয়েছে। ফিরলো নিঃশব্দে ও অকস্মাৎ, ক্লডিয়ার পাশে।

‘তুমি আমাকে চমকে দিয়েছো’, হাঁপিয়ে উঠলো ক্লডিয়া। ‘মানুষ নও, যেনো একটা বিড়াল।’

‘রেললাইন মাত্র এক মাইল সামনে। ফেলিমো গার্ডরা এখনো কেমন যেনো অস্থির হয়ে আছে। লাইনে প্রচুর মিলিটারী ট্রাফিক দেখলাম। চারদিকে সম্ভ্রান্ত একটা ভাব, সেই সাথে কিসের যেনো আয়োজনও চলছে। রেললাইন পার হওয়া আমাদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন হবে। চাঁদ ওঠার পর আরেকবার দেখতে যাবো আমি।’

অপেক্ষা করছে ওরা, এই ফাঁকে এরিয়াল উঁচু করে জেনারেল চায়নার হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করলো আলফনসো, নির্দিষ্ট সময়ে।

‘পাখি তার নীড়ে ফিরেছে’, সাংকেতিক বাক্যটা আওড়ালো আলফনসো, অর্থ সীমান্ত পেরিয়ে জিম্বাবুইয়ে ঢুকে পড়েছে শন কোর্টনি। অপরপ্রান্ত থেকে কয়েক সেকেন্ড কিছু বলা হলো না, মেসেজটা সম্ভবত ডি-কোড করার পর জেনারেল চায়নার কাছে পাঠানো হচ্ছে। তারপর রেডিও অপারেটর বললো, আলফনসোর ওপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে যেনো তার দল নিয়ে নদীর কিনারায় প্রধান ঘাঁটিতে ফিরে আসে। ‘ঠিক আছে’, বলে যোগাযোগ কেটে দিলো আলফনসো।

‘ওরা আশা করবে অন্তত আরো দু’দিন পর ফিরে যাবো আমি।’ রেডিওটা বাস্তব ভরার নিঃশব্দে হাসলো আলফনসো। ‘তারপর সন্দেহ করতে শুরু করবে।’

গাছপালার মাথার ওপর চাঁদ ওঠার পর মাতাউকে নিয়ে বনভূমির ভেতর হারিয়ে গেলো শন, রেললাইনটা আরেকবার দেখবে। ওদের পজিশন থেকে এক মাইল দক্ষিণে সরু একটা নদীর ওপর দিয়ে চলে গেছে লাইনটা। নদীতে পানি কম হলেও, দু’পাশের পাড় ঘন ঝোপে ঢাকা, ওখানে গা ঢাকা দেয়া যাবে অনায়াসে। অনেক আগে ঝোপ-ঝাড় কেটে একশো ফুটের মতো পরিষ্কার করা হয়েছিল, আবার জন্মে কোমর সমান উঁচু হলেও পরে আর কাটা হয়নি।

‘ফেলিমোদের চোখকে ফাঁকি দেয়ার উপায় ফেলিমোরাই করে রেখেছে’, বিড়বিড় করলো শন। ‘নদীর পাড়ে লুকিয়ে থাকবো আমরা।’

মেইন লাইন নদী পেরিয়েছে কালভার্ট-এর ওপর দিয়ে। একটা গার্ড পোস্ট দেখা গেলো, কালভার্ট থেকে উজানের দিকে পঞ্চাশ গজ দূরে। চোখে বাইনোকুলার তুললো শন, পিঠে একে রাইফেল ঝুলিয়ে একজন ফেলিমো সেন্সিটিভ কালভার্টের ওপর হেঁটে এলো। রেইলের ওপর হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো লোকটা। কয়েক

সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকার পর গার্ড পোস্টের দিকে ফিরে যাচ্ছে। তার হাঁটার ভঙ্গিটা কেমন যেনো এলোমেলো লাগলো শনের চোখে। গার্ড পোস্টের কাছাকাছি পৌছেছে সে, এই সময় ভেতর থেকে ভেসে এলো নারীকণ্ঠের খিলখিল হাসি, এতোটা দূর থেকেও পরিষ্কার শুনতে পেলো শন ও মাতাউ।

‘ওরা মৌজ-ফুর্তি করছে’, মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি থামালো মাতাউ।  
‘নিজেকে আমার বঞ্চিত লাগছে, বাওয়ানা।’

‘তুমিও মৌজ-ফুর্তি করার সুযোগ পাবে’, বললো শন। ‘জোহানেসবার্গে গিয়ে নিই আগে!’

রেলওয়ে গার্ডরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে দেখে রেললাইন পার হওয়া ওদের জন্যে সহজ হবে বলেই আশা করলো শন। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে পিছিয়ে এলো ওরা, ফিরে চললো দলের বাকি লোকদের কাছে।

তিন ঘন্টা হলো ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে ওরা, মাঝরাত হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। নালার মাথার কাছে এসে সংকেত দিলো শন, বুলবুলি শিস। চায় না আলফনসোর কোনো লোক চিনতে না পেরে গুলি করে বসুক। জবাবের জন্যে পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করলো ও। কোনো সাড়া নেই দেখে আবার শিস দিলো। নিস্ত ক্রান্তি আগের মতোই অটুট। ভয়ে অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়ার উপক্রম হলো শনের।

সরাসরি না গিয়ে, সতর্কতার সাথে নালটাকে ঘুরে এলো ওরা। চাঁদের আলোয় অপ্রত্যাশিত পায়ের ছাপ আবিষ্কার করলো মাতাউ। ছাপটার পাশে উবু হয়ে বসলো সে। উদ্বেগে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা।

ফিসফিস করলো শন। ‘কে? কোনো দিকে?’

‘অনেক লোক। আমাদের লোক। শাস্তানিরা।’ মাথা তুলে উত্তর দিকটা দেখালো মাতাউ। ‘ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে গেছে তারা।’

‘বেরিয়ে গেছে?’ শন হতভম্ব। ‘কেন? তবে কি...ওহ গড! নো!’

দ্রুত, নিঃশব্দে, ক্যাম্পের ভেতর ঢুকলো ও। যাবার আগে কয়েকজন সেন্দ্রিকে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল, নিজেদের জায়গায় কেউ তারা নেই। আতঙ্ক যেনো একটা ভূমিধসের মতো পিষে ফেলতে চাইলো শনকে, মনে হলো দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে।

‘ক্লডিয়া!’ ফিসফিস করলো ও, চোঁচিয়ে ওঠার বোকটাকে অনেক কষ্টে দমিয়ে রেখেছে। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে খোঁজ করে ক্লডিয়ার, কিন্তু জানে সেটা হবে মারাত্মক বোকামি, সেই বোকামির খেসারত হিসেবে প্রাণটাও হারাতে হবে পারে। বার কয়েক বড় করে শ্বাস টানলো ও, মনের জোর খাটিয়ে আতঙ্ক দূর করার চেষ্টা করলো।

একেএম-টা পুরোপুরি অটোমেটিকে নিয়ে এলো শন, ক্রল করে সামনে বাড়লো। নালার তলায় পাঁচজন শাস্তানিকে ঘুমোতে দেখে গিয়েছিল, একজনও নেই তাদের অস্ত্র ও ব্যক্তিগত জিনিস-পত্রও গায়েই হয়ে গেছে। আরো খানিক সামনে

এগিয়ে হির হলো শন। চাঁদের আলোয় জোবের স্ট্রেচারটা দেখা যাচ্ছে। গুটার পাশে, যেমন দেখে গিয়েছিল, চাদরে মোড়া আকৃতিটা আগের মতোই রয়েছে—অর্থাৎ কুড়িয়া। তবে, কুড়িয়ার ঠিক সামনে, আরও একটা শরীর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। কার ঠিক চিনতে পারা গেলো না। চাঁদের আলোয় তার ভিজে মাথা চকচক করছে। ‘রক্ত!’

সমস্ত সতর্কতা ঝেড়ে ফেলে কুড়িয়ার দিকে ছুটলো শন, তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো, প্রায় ছোঁ দিয়ে দু’হাতে তুলে নিলো তাকে।

ভয়ে আঁতকে উঠলো কুড়িয়া, তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এলো গলা চিরে, ধস্তাধস্তি শুরু করলো। ফিসফিস করলো শন। ওকে চিনতে পেরে শান্ত হলো কুড়িয়া। ‘শন, তুমি!’ হাঁপাচ্ছে সে। ‘কি হয়েছে? তুমি অমন করলে কেন?’

‘থ্যাঙ্ক গড!’ কৃতজ্ঞতায়, আবেগে গলাটা কেঁপে গেলো শনের। ‘আমি ভেবেছিলাম...!’ আস্তে করে কুড়িয়াকে নামিয়ে দিলো চাদরের ওপর, হাত বাড়ালো স্ট্রেচারের দিকে। ‘জোব?’ তার বুকে হাত রেখে মৃদু ঝাঁকি দিলো ও। ‘কেমন আ... জোব?’

নড়ে উঠলো জোব, বিড়বিড় করে কি বললো বোঝা গেলো না। লাফ দিয়ে সোজা হলো শন, ছুটলো। ওদিকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে আলফনসো। প্রথমে তার ঘাড়টা ছুঁয়ে দেখলো ও। চামড়া ঠাণ্ডা নয়, গরম। পালসও অত্যন্ত জোরালো এবং নিয়মিত। ‘কুড়িয়া!’ হাঁক ছাড়লো ও। ‘টর্চটা নিয়ে এসো!’

টর্চের আলোয় আলফনসোর মাথার জখমটা পরীক্ষা করলো শন। আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে রক্ত পড়া, তবু একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো ও।

‘কি ঘটেছে, শন?’ ব্যাকুলস্বরে জানতে চাইলো কুড়িয়া। ‘মরার মতো ঘুমিয়েছিলাম, কি ঘটেছে কিছুই জানি না...।’

‘ঘুমিয়েছিলে বলেই এ-যাত্রা রক্ষা পেয়েছে’, আলফনসোর খুলির ব্যাণ্ডেজটা পরীক্ষা করে বললো শন। ‘তা না হলে তোমার অবস্থাও এর মতো হতো।’

‘কি ঘটেছে বলবে না আমাকে? বাকি সবাইকে দেখছি না যে?’

‘নেই’, বললো শন। ‘পালিয়ে গেছে। এতো কষ্টকর হাঁটা বা গন্তব্য, দুটোর কোনোটাই তাদের পছন্দ হয়নি। আলফনসোর মাথায় রাইফেলের বাড়ি মেরে চলে গেছে, থামবে জেনারেল চায়নার সামনে গিয়ে।’

শনের দিকে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো কুড়িয়া। ‘তুমি বলতে চাইছো দলে এখন আমরা মাত্র চারজন আছি? আলফনসো বাদে শাস্তানিরা সবাই কেটে পড়েছে?’

‘হ্যাঁ।’ শন থামতেই গুড়িয়ে উঠলো আলফনসো, হাত তুলে ছুঁতে চেষ্টা করলো মাথার ব্যাণ্ডেজটা। তাকে উঠে বসতে সাহায্য করলো শন।

‘শন!’ অস্থির হয়ে পড়েছে ক্লডিয়া, শনের বাহু ধরে টান দিলো। ‘কি হবে এখন? কি করবো আমরা?’ জোবের দিকে তাকালো একবার। ‘জোব... লোক কই স্ট্রেচার বইবে?’

কাঁধ ঝাঁকালো শন। ‘ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। কিন্তু কোনোটারই উত্তর জানা নেই আমার — এখনো। আমি শুধু জানি, কাল এই সময়ের মধ্যে বন্ধুবর চায়না জানতে পারবে আমরা কোথায় আছি, কোনোদিকে যাচ্ছি।’

শনের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকলো ক্লডিয়া। ‘তাহলে? কি হবে তাহলে?’

‘কি হবে সত্যি জানি না। তবে করার কাজ বোধহয় একটাই আছে, যদিকে যাচ্ছি সেদিকেই এগোনো।’ আলফনসোকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলো ও।

‘কিন্তু এগোবে কিভাবে?’ চাপা গলায় বললো ক্লডিয়া। ‘দু’জনে তো স্ট্রেচারটা বইতে পারবে না!’

‘ঠিক বলেছো। অন্য কোনো ব্যবস্থা করতে হবে।’

ক্লডিয়ার সাহায্য নিয়ে স্ট্রেচার থেকে জোবকে তুললো শন, চাদরে শোয়ানো হলো তাকে। ফাইবার গ্লাস স্ট্রেচারটা খুলে কয়েক ভাগে আলাদা করলো ও ওর কাজ শেষ হবার আগেই অন্ধকার থেকে নিঃশব্দে ফিরে এলো মাতাউ, নিচু গলায় রিপোর্ট করলো ওকে।

মুখ না তুলেই আলফনসোকে বললো শন, ‘ওদের তুমি ভালোই ট্রেনিং দিয়েছো। ছড়িয়ে পড়েছে তোমার শাস্তানিরা, এগারো দিকে যাচ্ছে ওরা। যদি পিছু নেই, এক বা দু’জনকে হয়তো ধরতে পারবো, বাকিরা সুসংবাদ নিয়ে ঠিকই পৌঁছে যাবে চায়নার কাছে।’

শাস্তানিদের অভিশাপ দিলো আলফনসো। ‘সিংহের পেটে যা, সাপের ছোবল খা!’

জোব ও ক্লডিয়ার দিকে একবার করে তাকিয়ে শন বললো, ‘স্ট্রেচারের নাইলন ফিতে দিয়ে আমি একটা স্লিং সীট তৈরি করছি।’

ক্লডিয়ার চেহায়ায় সন্দেহ ফুটে উঠলো। ‘সোজা হয়ে বসার শক্তি কি জোবের আছে? নড়াচড়ায় ক্ষমতা থেকে আবার রক্ত বেরবে...’, শনের চোখ দেখে থেমে গেলো সে।

‘এরচেয়ে ভালো কোনো উপায় জানা আছে তোমার?’ জিজ্ঞেস করলো ও, নিঃশব্দে মাথা নাড়লো ক্লডিয়া।

ভারি, সবুজ ক্যানভাসের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলো শন; নিজের একেএম ও আলফনসোর এ/কে-র রাইফেল স্লিং খুলে একটু লুপ তৈরি করলো। ‘রওনা হবার পর প্রয়োজন মতো ছোটোবড় করে নিতে হবে’, বললো ও, তারপর ক্লডিয়ার দিকে

তাকালো। ‘খুঁত খুঁজে বের করার চেয়ে দু’ একটা জরুরী কাজ সারতে পারো। শাস্তানিদের ফেলে যাওয়া জিনিসগুলো জড়ো করো এক জায়গায়। দেখতে হবে নেয়ার মতো কিছু আছে কিনা।’

অতিরিক্ত কোনো জিনিসই নিলো না শন। ‘আমি আর আলফনসো জোবকে বইবো, এরপর যার যার কম্বল ও অস্ত্র ছাড়া আর কিছু নেয়ার উপায় থাকবে না। মেডিকেল প্যাক, অতিরিক্ত কম্বল, পানির বোতল, ভাগাভাগি করে নেবে ক্লডিয়া ও মাতাউ। বাকি সব জিনিস ফেলে যেতে হবে।’

‘টিনের খাবার?’ জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া।

‘ভুলে যাও’, বলে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যার যার বোঝা তুলে নেয়ার নির্দেশ দিলো শন। ও জানে, কয়েক মাইল হাঁটার পর এক পাউণ্ডকে মনে হবে দশ পাউণ্ড। ও এমনকি আলফনসোকেও এ/কে রাইফেল রেখে যেতে রাজি করলো, পরিবর্তে রাশিয়ান পাইলটের কাছ থেকে পাওয়া পিস্তলটা দিলো তাকে। নিজের একেএম-এর জন্যে মাত্র দুটো স্পেরার অ্যামুনিশন ক্রিপ নিলো ও। দুটো করে থ্রেনেড থাকলো দু’জনের কাছে, একটা ফ্র্যাগমেন্টেশন, অপরটা ফসফরাস। বাতিল জিনিসগুলো নালার তলায়, নরম বালির নিচে চাপা দেয়া হলো। ‘চলো, হাঁটি’, শান্ত স্বরে বললো ও, হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো। তিনটে বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই, তার আগেই রেললাইন পার হতে হবে ওদের।

জোবের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো শন, সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে বসালো তাকে, তারপর আহত হাতটা তার বুকের সাথে নতুন করে বাঁধলো। ‘এবার খুব সাবধানে’, বিড়বিড় করলো ও, আলফনসোর সাহায্য নিয়ে সাবধানে দাঁড় করালো জোবকে। ব্যথা পেলেও চুপচাপ থাকলো জোব, দু’জনের গায়ের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে শন ও আলফনসো। ওদের দু’পাশের দুই কাঁধে নাইলন স্লিংটা ঠিকমতো বসিয়ে নিলো ওরা, তারপর স্লিং সীটে বসালো জোবকে। তার পা দুটো ঝুলো থাকলো, ভালো হাতটা দিয়ে ধরে আছে শনের কাঁধ। তার পিঠের ওপর শন ও আলফনসোর হাত এক হলো, সে যাতে হেলান দিতে পারে। ‘রেডি?’ জিজ্ঞেস করলো শন।

অস্ফুট স্বরে হুঁ বললো জোব। এক চুল লড়লেই ব্যথা লাগছে তার, কিন্তু মুখ বুজে সহ্য করছে।

‘এখনি যদি তোমার অসহ্য লাগে’, চেহারায় হাসিখুশির একটা ভাব এনে বললো শন, ‘দু’ঘন্টা পর কি রকম লাগে শুনতে চাই।’

নালার ধরে রেললাইনের দিকে এগোলো ওরা। এগোবার গতি খুব ধীর, ভগ্নিটা আড়ষ্ট। নিজেদের মাঝখানে জোবকে যতটাই আরাম দেয়ার চেষ্টা করুক ওরা,

ভাঙাচোরা মাটিতে বারবার হৌচট খেলো আলফনসো ও শন, স্লিং সীটটা দোল খেলো, ওদের গায়ে ধাক্কা খেলো জোব। কোনো শব্দ করলো না সে, তবে কানের কাছে তার নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনে শন বুঝতে পারলো ব্যথায় প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে বেচারির। মাঝে মধ্যে শনের বাহুর গভীরে ঢুকে গেলো জোবের আঙুলগুলো।

নালা থেকে নদীর শুকনো তলায় চলে এলো ওরা। সামনে কালভার্ট, কালভার্টের ওপরে রেললাইন। ওদের কাছ থেকে একশো গজ সামনে রয়েছে মাতাউ, চাঁদের আলোয় কোনোমতে দেখা যাচ্ছে তাকে। একবার ওদেরকে থামার সংকেত দিলো সে, তারপর আবার এগোতে বললো। ওদের পঞ্চাশ ফুট পিছনে রয়েছে ক্লডিয়া, শব্দের চোখে ধরা পড়ে গেলে পিছু হটতে হবে ওদের, সময় থাকতে গা ঢাকা দেয়ার সুযোগ পাবে ক্লডিয়া।

নিজেদের মাঝখানে জোবকে বইছে, শন ও আলফনসোর পক্ষে নিঃশব্দে এগোনো সম্ভব নয়। শুকনো নদীর তলায় একটা গর্তে একবার পা পড়লো, ছলাৎ করে শব্দ হলো, কাদায় ডেবে গেলো পা। ওদের সামনে, কালভার্টের কাছে পৌঁছে গেছে মাতাউ, অস্থির হাত নেড়ে তাড়াহুড়ো করার তাগিদ দিচ্ছে সে। হৌচট খেতে খেতে এগোলো ওরা, খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো, আর ঠিক সেই সময়ে কালভার্টের ওপর কাঁকরে পা পড়ায় কর্কশ শব্দ হলো। তারপরই মানুষের গলা পেলো ওরা।

মাথা নিচু করে ছুটলো, ভঙ্গিটা হাস্যকর ও আড়ষ্ট। কালভার্টের নিচে পৌঁছলো ওরা, অন্ধকার টানেলের একধারে নামালো জোবকে। আড়ালে চলে এসেছে ওরা, কিন্তু ক্লডিয়া এখনো খোলা জায়গায় রয়েছে। একটা হাত বাড়িয়ে চাঁদের আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নিলো তাকে শন।

কালভার্টটা তেমন উঁচু নয়, সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। কংক্রিটের দেয়ালে হেলান দিয়ে থাকলো ওরা, ভিজে বালি ও কাদার ওপর দিয়ে ছুটে আসায় হাঁপিয়ে গেছে সবাই।

পায়ের ও হাসির শব্দ বাড়লো। আওয়াজ শুনে মনে হলো একজন লোক ও একটা মেয়ে। প্রায় সরাসরি ওদের মাথার ওপর এসে থামলো তারা। ফেলিমো সৈনিকরা কি সাথে করে তাদের বউ বা প্রেমিকাদেরও নিয়ে এসেছে, নাকি মেয়েগুলো এসেছে রেললাইনের ধারে গজিয়ে ওঠা রিফিউজি ক্যাম্প থেকে?

হাস্য-রসাত্মক ঝগড়া-ঝাঁটি, খুনসুটি চলছে দু'জনের মধ্যে। সৈনিকটির গলা শুনে বোঝা গেলো মদ খেয়েছে সে। আদর ও অনুনয়ে কাতর তার কণ্ঠস্বর। সামান্য ধস্তাধস্তির আওয়াজও পাওয়া গেলো। প্রতিবাদ করছে মেয়েটি, তিরস্কার করছে, তার হাসিতেও তাচ্ছিল্যের সুর। অবশেষে বেপরোয়া হয়ে উঠলো ক্ষুধার্ত পুরুষ,

চিৎকার করে বললো, 'টেন ডলার! টেন ডলার!' মুহূর্তে নরম হলো মেয়েটার গলা, মিষ্টি হেসে রাজি হলো সে।

আবার পায়ের আওয়াজ হলো। প্রায় আঁতকে উঠলো শন। রেইল টপকে কালভার্ট থেকে ঢালে ঢালে এলো সৈনিক, মেয়েটাকেও আনলো। ঢাল বেয়ে নিচে নেমে আসছে তারা। তাদের সাথে গড়িয়ে নেমে এলো কয়েকটা নুড়ি পাথর।

'কোনো শব্দ নয়! কেউ নড়বে না!' ওদেরকে সতর্ক করে দিলো শন। কালভার্টের মুখে একজোড়া ছায়ামূর্তি উদয় হলো, একই সময়ে শনের হাতে বেরিয়ে এলো ট্রেঞ্চ নাইফটা।

পরস্পরকে জড়িয়ে আছে ওরা, হাসির শব্দগুলো কোমল, এলোমেলো পায়ে হাঁচট খেতে খেতে এদিকেই এগিয়ে আসছে, সঙ্গিনীকে ধরে প্রায় ঝুলে আছে পুরুষটা। হোরা বাগিয়ে ধরে তৈরি হলো শন, প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তবে টানেলের মুখের কাছেই যথেষ্ট অন্ধকার পেয়ে তারা খুব বেশি ভেতরে ঢুকলো না, ওদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়লো, ঘুরলো পরস্পরের দিকে। চাপা স্বরে হাসছে মেয়েটা, ফিসফিস করছে সৈনিক। বাইরের চাঁদের আলো, সেই আলোর গায়ে জোড়া ছায়ামূর্তির গাঢ় কাঠামো স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

ফেলিমো সেন্টি ঠেলা দিয়ে মেয়েটাকে দেয়ালের গায়ে চেপে ধরলো, পাশে ঝাড়া করে রাখলো রাইফেলটা, কোমরের কাছটা হাতড়ে ট্রাউজারের চেইন খোলার চেষ্টা করছে। দেয়ালে হেলান দিলো মেয়েটা, কোমরের কাছে তুলে ফেললো স্কার্ট।

হাত বাড়ালে ক্লডিয়া ওদের ছুঁতে পারবে, যদিও নিজেদের নিয়ে এতোই ব্যস্ত তারা যে অন্য কারো উপস্থিতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়। গোটা ব্যাপারটা একাধারে বিপজ্জনক ও বিব্রতকর, আবার এর মধ্যে উপভোগের উপাদানও রয়েছে। ভীষণ লজ্জা পেলো ক্লডিয়া, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাতে পারলো না, মিলনের দৃশ্যটা ওকে যেনো সম্মোহিত করে ফেলেছে। শিৎকার ও অন্যান্য শব্দগুলো কানে যেনো গরম সীসা ঢেলে দিলো, নিজেও উত্তেজিত হয়ে পড়লো ক্লডিয়া, জানেও না কখন আঁকড়ে ধরেছে শনকে।

গুরু হতে না হতে শেষ হয়ে গেলো ব্যাপারটা, মেয়েটার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে টানেল থেকে বেরিয়ে গেলো ফেলিমো সেন্টি। তার পিছু নিলো মেয়েটা। 'ওয়ার্ড রেকর্ড', স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো শন। 'ওদের মতো আমরাও কি বন্ধু হতে পারি না?' জিজ্ঞেস করলো ও। 'তোমাকে ধমক দিয়েছিলাম বলে নিজের ওপর এখন আমার রাগ হচ্ছে।'।

'সেটা আমরা পাওনা ছিলো', বললো ক্লডিয়া। 'অবশ্যই আমি তোমার বন্ধু হতে পারি, কিন্তু নির্লজ্জ হতে পারি না। ওদের মতো বন্ধু হতে চাইলে আমাকে চারদেয়ালের ভেতর নিয়ে যেতে হবে তোমার।'।

‘গা ঘেঁষে থাকো’, ক্লুডিয়ার দিকে পিছন ফিরে জোবের খোঁজে দেয়ালটা হাতড়ালো শন। কালভার্টের বালিবহুল মেঝেতে বসে পড়েছে সে। তাকে দাঁড় করাতে যাবে ও, একটা হাত ঘষা খেলো কাঁধে। ভিজ়ে গেছে ব্যাঙেজ। মুখের হাসি উবে গেলো শনের। ক্ষতটা থেকে আবার রক্ত বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলো ও। রক্ত বন্ধ করার জন্যে এই মুহূর্তে কিছু করার উপায় নেই। ‘কেমন লাগছে তোমার, জোব?’

‘চিন্তা করবেন না’, খসখসে, কাতর কণ্ঠে বললো জোব, কোনো রকমে গুনতে পেলো শন। মাতাউর কাঁধে টোকা দিলো ও, নির্দেশটা বুঝতে পেরে টানেলের উল্টোদিকের মুখ দিয়ে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে গেলো সে, ঝোপঝাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো। কয়েক মিনিট পর রাত-জাগা-পাখির শিস ভেসে এলো, সংকেতটার মানে হলো সামনে কোনো বিপদ নেই। ক্লুডিয়াকে পাঠালো শন, ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢোকান জন্যে পাঁচ মিনিট সময় দিলো তাকে।

তারপর শন বললো, ‘চলো এবার।’ প্লিং সীটে বসানো হলো জোবকে।

টানেলের মুখ থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো ওরা। পরবর্তী একশো কদম পেরুতে ঘেমে নেয়ে উঠলো শন, মনে হলো জীবনের দীর্ঘতম দূরত্ব পাড়ি দিচ্ছে মম্বুরতম গতিতে। তবে কোনো বিপদ হলো না, অবশেষে পৌছে গেলো বনভূমির কিনারায়। ওখানে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে ক্লুডিয়া।

‘রেললাইন পেরিয়ে এসেছি!’ তার চাপা স্বরে বিজয়ের উল্লাস।

‘তা এসেছি’, তিক্তকণ্ঠে বললো শন। ‘প্রথম এক মাইল তেমন কষ্ট হলো না। আর মাত্র তিনশো মাইল পেরুতে হবে।’

শব্দ হয় হোক, হাঁটার গতি বাড়াবার চেষ্টা করলো শন। পা ফেলার সাথে হাতঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা মেলালো, হিসেব করে দেখলো ঘন্টায় ওরা দু’মাইলের মতো এগোচ্ছে। এখনো ওদের সামনে রয়েছে মাতাউ, ওদের জন্যে নির্বাচন করছে সবচেয়ে সহজ পথ। সামনের বনভূমির আড়ালে থাকছে সারাক্ষণ, শুধু তার পাখির ডাক পথ চেনাচ্ছে ওদের। মাঝে মধ্যে থেমে আকাশটা জরিপ করলো শন, তারা দেখে দিক নির্ণয় করলো।

ভোরের আলোয় স্নান হয়ে এলো তারাগুলো। থামার নির্দেশ দিলো শন। এই প্রথম পানি খাওয়ার অনুমতি পেলো সবাই। পানির বোতলগুলো রয়েছে ক্লুডিয়ার কাছে, দু’টোকে বেশি খেতে দিতে মানা আছে তার। এতোক্ষণে জোবের কাঁধের যত্ন নেয়ার সময় পেলো শন। ব্যাঙেজটা সম্পূর্ণ ভিজ়ে গেছে রক্তে, জোবের চেহারা দেখে মায়া লাগলো শনের ছাইয়ের মতো সাদাটে হয়ে গেছে। কোটরে ডেবে গেছে চোখ, শুকনো ঠোঁট ফেটে গেছে। ব্যথা ও রক্তশূন্যতা ভোগাচ্ছে তাকে।

ধীরে ধীরে ব্যাঙেজটা খুললো শন। চট করে দৃষ্টি বিনিময় হলো ক্লুডিয়ার সাথে। টিস্যুগুলো যেভাবে খেঁতলে গেলে, দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লো ওরা।

ক্ষতের গভীরে ফিল্ড ড্রেসিং এমন ভাবে ঢুকে আছে, ওটা যেনো মাংসেরই একটা অংশ, খোলার চেষ্টা করলে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে আসবে। তার ফল হবে মারাত্মক, হড়হড় করে রক্ত বেরুতে শুরু করলে বন্ধ করা কঠিন হয়ে উঠবে। নাকটা বাড়িয়ে ক্ষতের গন্ধ ঠুকলো শন। ওর এই ভঙ্গি দেখে নিঃশব্দে হাসলো জোব — হাসি তো নয়, যেনো কংকালের চামড়াসর্বস্ব ঠোট কুঁচকে উঠলো একটু।

‘ভুনা মাংস?’

‘অভাব শুধু সামান্য একটু রসুন আর পেঁয়াজের।’ শনও হাসলো বটে, তবে ক্ষতটা থেকে পচনের গন্ধ ঠিকই পেয়েছে ও। ফিল্ড ড্রেসিংয়ের গায়ে আবার আয়োডিন পেস্ট লাগালো ও। নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো। বাতিল ব্যাণ্ডেজটা ফেলে দিলো না, পকেটে ভরে রাখলো। পানি পেলে ধুয়ে নেবে। ‘খামার কোনো উপায় নেই আমাদের,’ জোবকে বললো ও। ‘রেললাইন থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে। ধকলটা সহ্য হবে তোমার?’

মাথা ঝাঁকালো জোব, তবে তার চোখে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠতে দেখলো শন। একটু নড়লেই ক্ষতটায় যেনো আগুন জ্বলে ওঠে।

‘আরেকটা অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দিচ্ছি’, বললো শন। তারপর জিজ্ঞেস করলো, ‘তার সাথে খানিকটা মরফিন দেবো কি?’

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো জোব। ‘এখন নয়, খুব যখন ব্যথা করবে।’ আবার হাসতে চেষ্টা করলো দেখে তার জন্যে দুঃখে বুকটা ফেটে যাবার উপক্রম করলো শনের। জোবের দিকে তাকানোর সাহস হলো না। বললো, ‘তোমার শরীরের সেরা অংশটা দেখাও আমাদের।’ জোবের ট্রাউজার কোমরের নিচে নামিয়ে আনলো ও। কালো নিতম্বে সিরিঞ্জের সুচি ঢোকালো। ইতিমধ্যে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে ক্লডিয়া।

তাই দেখে জোব বললো, ‘তাকালে ক্ষতি নেই, ডোন না শুধু ছোঁবেন না।’

চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো শনের। অবধারিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে শুধু বোধহয় জোবই পারে এরকম রসিকতা করতে।

‘তুমি শনের মতোই মন্দলোক’, কৃত্রিম ঝাঁঝের সাথে বললো ক্লডিয়া। ‘ভালগার, তোমরা দু’জনেই।’

নাইলনের স্ক্রিং সীটে জোবকে বসিয়ে আবার হাঁটা ধরলো ওরা। রোদ একটু চড়তেই নিচু পাহাড়গুলোর মাঝখানের ফাঁকে নাচতে শুরু করলো বাষ্প, মরীচিকার মতো দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ দৃষ্টি করলো। ওদের মাথা ঘিরে ঝাঁক ঝাঁক মোপানি মাছি চক্কর দিচ্ছে, চোখে-মুখে বসে বিরক্ত করছে, ঢুকতে চাইছে নাক ও কানের ফুটোয়। রোদের সাথে বাড়লো তাপমাত্রা, তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়লো পিপাসা। ঘামে ভেজা কাপড় শুকিয়ে গেলো, লবণের সাদা দাগ ফুটে উঠলো শাট্টে।

দুপুরে কয়েকটা আফ্রিকান সেগুন গাছের ছায়ায় থামলো ওরা। রোদ আরো চড়বে, জানে শন। শুকনো ঘাসে শোয়ানো হলো জোবকে, সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লো সে। কিংবা হয়তো জ্ঞান হারালো।

স্লিং সীটের স্ট্র্যাপ মাঝেমধ্যেই এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নিয়েছে ওরা, ফলে শন ও আলফনসোর দু'কাঁধেরই চামড়া উঠে গেছে। নিজের ক্ষতটা পরীক্ষা করে আলফনসো তিজকটে বললো, 'এর আগে পর্যন্ত ম্যাটা-বেলদের আমি ঘৃণা করতাম ওরা নোংরা, উকুনখেকো, সিফিলিসের রোগী বলে। ওগুলোর সাথে আরেকটা কারণ যোগ হলো।'

আয়োডিন পেস্ট-এর টিউবটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলো শন। 'ক্ষতটায় মলম লাগাও, তারপর টিউবটা ছিপার মতো করে মুখে ভরো', পরামর্শ দিলো ও। বিড়বিড় করতে করতে সরে গেলো আলফনসো, শোয়ার জন্যে একটা জায়গা দরকার তার।

ঘাস ঢাকা মাটি এক জায়গায় যথেষ্ট ডেবে আছে, চারপাশের ঝোপ আড়াল করে রেখেছে জায়গাটিকে, যেনো শন ও ক্লুডিয়ার জন্যে প্রকৃতির একটা উপহার, জোব যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে বেশি দূরেও নয়। কমল বিছিয়ে একটা আশ্রয় তৈরি করলো শন। বসে পড়ে বললো, 'যদি বলো চারদেয়ালের চেয়ে কোনো অংশে কম এটা, তোমার সাথে আমি একমত হবো না।'

'আমি ক্লান্ত', দ্রুত বললো ক্লুডিয়া। চেহারায় আড়ষ্ট একটা ভাব ফুটে উঠলো।

'কতোটা ক্লান্ত?' ক্লুডিয়ার কানের পিছনে আঙুল দিয়ে সুড়সুড়ি দিলো শন।

'ক্লান্ত', শনের গায়ে হেলান দিলো ক্লুডিয়া। 'তবে ততোটা ক্লান্ত নই।'

সূর্য ডুবছে, ধোঁয়াহীন আশুনে ওদের জন্যে ভুট্টার কেক তৈরি করলো শন; এরিয়াল লম্বা করে রেনামো কমাও ফ্রিকোয়েন্সিতে রেডিওটা টিউন করলো আলফনসো। ওয়েভলেংথ-এ প্রচুর শব্দজট, সম্ভবত ফেলিমো ট্র্যাপ — মিশন, তবে এক সময় নিজেদের কল সাইন শুনতে পেলো ওরা।

সাড়া দিলো আলফনসো, তারপর নিজেদের কাল্পনিক একটা অবস্থান জানালো রেললাইন থেকে অনেক উত্তরে, নদীর কিনারায় ফেরার পথে। মেসেজ প্রাপ্তি স্বীকার করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলো রেনামো হেডকোয়ার্টার।

'এখনো গিলছে ওরা', মন্তব্য করলো শন। 'মনে হচ্ছে পলাতক শাঙ্গানিরা এখনো হেডকোয়ার্টারে পৌঁছোয়নি।'

খাওয়ার ফাঁকে ফিল্ড ম্যাপে চোখ বলালো শন, নিজেদের বর্তমান অবস্থান বের করলো। ম্যাপে দেখা গেলো পাহাড়ী এলাকাটা আরো ত্রিশ মাইল বিস্তৃত। তারপর ঢালু, নেমে গেছে সমতল প্রান্তরে, ওদিকে দু' একটা গ্রাম ও কিছু খেতে পাওয়া যাবে। আরো সামনে রয়েছে প্রকৃতির প্রথম বাধা, চওড়া একটা নদী। নদীটা পূর্ব পশ্চিমে লম্বা, সরাসরি ওদের পথের ওপর। আলফনসোকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো

শন, 'রেনামোদের সাউদার্ন ডিভিশন পরিচালনা করছে জেনারেল টিপপো টিপ, তুমি জানো ঠিক কোথায় শুরু হয়েছে তার এলাকা, তার মেইন ফোর্স কোথায় জড়ো হয়েছে?'

'আমাদের মতোই, ফেলিমোদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে সারাক্ষণ মুভ করছে ওরা। কখনো এখানে', ম্যাপের গায়ে আঙুল রাখলো সে, 'কখনো এদিকে, রিয়ো সেভ-এর কাছে', কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'যেখানে যুদ্ধ সেখানেই রেনামো।'

'আর ফেলিমোরা? তারা কোথায়?'

'তারা রেনামোদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মুখোমুখি হলে লেজ গুটিয়ে পালায়।' এক সেকেন্ড থেমে আলফনসো বললো, 'আমাদের জন্যে কার কি পরিচয় বা কে কোথায় আছে সেটা বড় কথা নয়। পথে যাদের সাথেই দেখা হোক, তারা আমাদের খুন করার চেষ্টা করবে।'

'গ্রেট ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট', আলফনসোকে ধন্যবাদ জানালো শন, ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলো ম্যাপটা।

বসতে না বসতে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেলো, অল্প খাবার, কার্ফরই পেট ভরলো না। সোজা হলো শন, বললো, 'এসো, আলফনসো, জোবকে তুলি।'

ঢেকুর তুললো আলফনসো, শয়তানী হাসি ফুটলো তার মুখে। 'প্রভুভক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনার ম্যাটাবেল কুকুর ওটা। একান্তই যদি সাথে রাখতে চান, বোঝাটা নিজে বহন করুন। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার, কান ধরেছি, আর নয়।'

হতাশ ভাবটা লুকোবার জন্যে চেহারা নির্লিপ্ত করে রাখলো শন। 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছো', নরম-সুরে বললো ও। 'ওঠো!'

আবার ঢেকুর তুললো আলফনসো, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো, এখনো ঠোঁট মুড়ে হাসছে।

ধীরে ধীরে খাপে ভরা ট্রেঞ্চ নাইফটার দিকে হাত বাড়ালো শন একই ভঙ্গিতে আলফনসোও হাত বাড়ালো বেলেট গাঁজা টোকারভ পিস্তলটার দিকে। পরস্পরের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

'শন, কি হলো?' ব্যাকুলস্বরে জানাতে চাইলো ক্লুডিয়া। 'এ-সব কি ঘটছে?' শাঙ্গানি ভাষায় কি কথাবার্তা হয়েছে বোঝেনি সে, তবে উত্তেজনার আঁচ পাচ্ছে।

'বলছে জোবকে বইবে না', জবাব দিলো শন।

'তুমি একা তো ওকে বইতে পারবে না', বললো ক্লুডিয়া। 'আলফনসো নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবে...।'

'-নয়তো ওকে আমি খুন করবো!' শাঙ্গানি ভাষায় বললো শন, থামতেই গলা ছেড়ে হেসে উঠলো আলফনসো।

হাসতে হাসতেই দাঁড়ালো আলফনসো, কুকুরের মতো গা ঝাড়া দিলো সে, শনের দিকে পিছন ফিরলো, রেডিও প্যাক ও শনের একেএমটা তুলে নিলো, তুলে

নিলো বেশিরভাগ পানির বোতল, শনের দিকে না ফিরেই বললো, 'এগুলো নিছি আমি।' এখনো হাসছে সে, যেনো ভারি মজা লাগছে তার। 'ম্যাটাভেল আপনার মাথাব্যথা।' দক্ষিণ দিকে হাঁটা ধরলো সে।

ছোরার হাতল থেকে হাতটা নামিয়ে নিলো শন, তাকালো জোবের দিকে। ঘাসের বিছানা থেকে শান্তভাবে তাকিয়ে আছে সে। তার উদ্দেশ্যে ঝঁকিয়ে উঠলো শন, 'কি বলতে চাও জানি-বলে দেখো, চড়িয়ে সব ক'টা দাঁত ফেলে দেবো!'

'বারে, আমি তো কিছুই বলিনি!' হাসার চেষ্টা করলো জোব, কিন্তু হাসিটা হলো দুর্বল ও কাতর।

থমথম করছে শনের চেহারা, স্লিং সীট আর স্ট্র্যাপটা তুলে নিলো ও 'ক্লডিয়া, একটু সাহায্য করবে?'

ধরাধরি করে জোবকে দাঁড় করানো ওরা। জোবের দুই উরুর সন্ধি ও কোমরে লাইলন স্লিংটা জড়ালো শন, প্যারাশুট হারনেস-এর মতো করে, বাকিটুকু লুপ তৈরি করে নিজের কাঁধে পড়লো। একটি হাত দিয়ে জোবের কোমরটা জড়িয়ে রাখলো ও। 'আর মাত্র একটা নদী, পেরুতে হবে আর মাত্র একটা সাগর', কর্কশ ও বেসুরো গলায় সিনডেবেল ভাষায় গান ধরলো, জোবের দিকে তাকিয়ে হাসলো। সামনে বাড়লো ওরা। যদিও জোবের পা মাটি স্পর্শ করছে, যতোটা সম্ভব নিজের ভার নিজেই বহন করার চেষ্টাও করছে সে, তবে শনের কাঁধে আটকানো স্ট্র্যাপটাই আসলে তাকে খাড়া থাকতে সাহায্য করছে। জোড়া লেগে আছে দুটো শরীর, হারনেসে জড়ানো।

একশো কদম হাঁটার পর পা ফেলার একটা ছন্দ তৈরি হলো, তবু এগোনোর গতি অত্যন্ত শ্লথ ও এলোমেলো, পা ফেলার ছন্দটা বজায় রাখতে পারছে না জোব। অ্যান্টি-ট্র্যাকিং-এর কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি, কারণ সবচেয়ে সহজ ও নিশ্চিত পথ ধরে এগোতে হবে শনকে। বন্যপ্রাণীদের তৈরি পথ ধরে এগোচ্ছে ওরা।

পানির বোতল ও মেডিকেল ব্যাগ নিয়ে ওদের পিছু পিছু আসছে ক্লডিয়া, কেউ নির্দেশ না দিলেও পাতালবহুল একটা ডাল দিয়ে পিছনের ছাপগুলো মুছে দিচ্ছে সে। এতে করে হয়তো সাধারণ কোনো লোকের চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব, কিন্তু ফ্রেলিমোদের কোনো ট্র্যাকারকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়।

হাতঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার সাথে পা ফেলার সংখ্যা মিলিয়ে একটা হিসেব করলো শন, ওদের হাঁটার গতি ঘটায় এক মাইলেরও কম। সারাদিনে আট মাইলের বেশি আশা করা যায় না। তিনশো মাইল পেরুতে কতোদিন লাগবে? তিনশোকে আট দিয়ে ভাগ করতে গিয়েও ক্ষান্ত হলো শন। হতাশায় ছোটো হয়ে গেলো মন।

মাতাউ ও আলফনসো, দু'জনেই সামনের বনভূমিতে হারিয়ে গেছে। আবার হাতঘড়ি দেখলো শন। মাত্র ত্রিশ মিনিট হলো হাঁটছে ওরা, এরইমধ্যে ক্লান্তিতে

হাঁপিয়ে উঠেছে দু'জনেই। জোবের ওজন যেনো প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে, কাঁধে কামড় বসাচ্ছে স্ট্র্যাপ। এখন আর ঠিকমতো পা তুলতে পারছে না জোব, মাটিতে ঘষা খেতে খেতে এগোচ্ছে, উঁচু-নিচু পথে হেঁচট খাচ্ছে বারবার। 'বিশ্রাম এক ঘন্টা পর নয়, ত্রিশ মিনিট কমিয়ে আনলাম', জোবকে বললো ও। 'পাঁচ মিনিটের জন্যে থামি এসো।'

একটা গাছের নিচে বসানো হলো জোবকে। গাছে হেলান দিয়ে চোখ বুজলো সে। নিঃশ্বাসের সাথে বুকের ভেতর ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে, সারা মুখ ভিজ়ে গেছে ঘামে। পাঁচ মিনিট নয়, দশ মিনিট পর শন বললো, 'ওঠো হে যাযাবর, পথ আমাদের ডাকছে।'

জোবকে আবার দাঁড় করানো দু'জনের জন্যেই নির্যাতন হয়ে উঠলো। শন উপলব্ধি করলো, জোবকে বেশিক্ষণ বিশ্রাম নিতে দিয়ে ভুল করেছে ও, ক্ষতটা আড়ষ্ট হয়ে ওঠার সময় পেয়ে গেছে।

পরবর্তী ত্রিশ মিনিট এতো দীর্ঘ মনে হলো যে শন ধারণা করলো ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। নিশ্চিত হবার জন্যে সেকেন্ডের কাঁটা পরীক্ষা করতে হলো। অবশেষে আবার যখন বসানো হলো জোবকে, কর্কশস্বরে বললো সে, 'দুঃখিত, বাওয়ানা, ক্র্যাম্প-বাঁ পায়ে, হাঁটুর নিচে।'

জোবের সামনে উবু হয়ে বসলো শন, তার হাঁটুর পিছন থেকে খানিকটা নিচে হাত দিয়ে শক্ত হয়ে ওঠা পেশী ডলতে শুরু করলো। ক্লডিয়ার দিকে তাকালো ও, মৃদু কণ্ঠে বললো, 'মেডিক প্যাকে সল্ট ট্যাবলেট আছে, বাম পকেটে।'

জোবের মুখে ট্যাবলেট গুঁজে দিলো ক্লডিয়া, তারপর পানির বোতলটা উঁচু করে ধরলো। দু'টোক পানি খেয়ে বোতলটা ঠেলে দিলো জোব।

'আরেকটু খাও', কোমল সুরে যেনো আদর করলো ক্লডিয়া, কিন্তু মাথা নাড়লো জোব।

'নষ্ট করবেন না', বিড়বিড় করলো সে।

'এখন কেমন লাগছে?' পায়ের পেশীতে দুটো চাপড় মারলো শন।

'আরো ক'মাইল হাঁটা যাবে।'

'তাহলে ওঠো', বললো শন। 'আবার শুরু হবার আগে যতোটা পারা যায় এগোই।'

ক্লডিয়ার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সারাটা রাত ধরে কিভাবে হাটছে ওরা? আধ ঘন্টা পর মাত্র পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিচ্ছে, ক্লান্তি দূর হবার আগেই আবার সোজা হচ্ছে দু'জন, নিঃশব্দে পা ফেলছে, জোড়া লেগে আছে দুটো শরীর। এভাবে তিনশো মাইল হাঁটতে চায় ওরা? এ তো কোনো মতেই সম্ভব নয় রক্ত ও মাংস এই ধকল সহিতে পারবে না। দু'জনেই ওরা মারা পড়বে। কতটা ভালবাসলে মানুষ আরেকজনের জন্যে এতোটা করে?

ভোর হবার খানিক আগে ছোট্ট কালো ছায়ার মতো ফিরে এলো মাতাউ, শনের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বিড়বিড় করলো। ‘দুই কি তিন মাইল সামনে একটা ওয়াটারহোল পেয়েছে ও’, ওদেরকে বললো শন। ‘পৌছুতে পারবে বলে মনে হয়, জোব?’

সূর্য ওঠার সাথে সাথে পরিবেশ যেনো তন্দুরের মতো হয়ে উঠলো। জ্ঞান হারিয়ে জোব যখন ঝুলে থাকলো শনের গায়ে, ওয়াটারহোল থেকে তখনো ওরা আধ মাইল দূরে। জোবকে মাটিতে নামিয়ে পাশে বসলো শন, এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে কয়েক মুহূর্ত নড়ার বা কথা বলার শক্তি পেলো না ‘অন্তত অজ্ঞান হবার জায়গাটা ভালোই বেছেছে’, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো ও ঘন ঝোপ রয়েছে ওদের চারপাশে, দিশেষ বাকি সময় ছায়া পাওয়া যাবে।

ঘাস কেটে এনে জোবের জন্যে বিছানা তৈরি করা হলো। শোয়াবার পর জ্ঞান বোধহয় খানিকটা ফিরে এলো। কথা বললো, কিন্তু শব্দগুলো জড়িয়ে গেলো মুখের ভেতর। কয়েকবার তাকালো, শূন্য দৃষ্টি, কিছু দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না। তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ক্লডিয়া, মুখটা ঘুরিয়ে নিলো সে। তবে আলফনসো ও মাতাউ ভরা বোতল নিয়ে ফিরে আসার পর ঢক ঢক করে প্রচুর পানি খেলো। তারপর আবার অচেতন হয়ে পড়লো সে। ঝোপের ভেতর জড়পিণ্ডের মতো পড়ে থাকলো বাকি সবাই, দিনের তাপ কমার অপেক্ষায় রয়েছে।

পরস্পরকে বাহুর ভেতর নিয়ে পড়ে আছে শন ও ক্লডিয়া, শনের আলিঙ্গনের ভেতর ঘুমোনো অভ্যেস হয়ে গেছে ক্লডিয়ার। দুপুরের খানিক পর ঘুম ভাঙলো তার। দেখলো মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে শন। ওর মুখের দিকে উপলব্ধি তাকিয়ে থাকলো সে। ‘ওকে আমি ভালোবাসি, সাংঘাতিক ভালোবাসি!’ বিড়বিড় করলো সে। দাড়ি গজিয়েছে শনের মুখে, মায়াভরা চেহারা সহ্যুগে তুলনাহীন ঠিক যেনো একজন ঋষি বলে মনে হলো ক্লডিয়ার।

তারপর শন ও জোবের কথা ভাবলো ক্লডিয়া। ওদের যে সম্পর্ক, তা বোধহয় শুধু দু’জন পুরুষের মধ্যেই সম্ভব, যাতে কোনোদিনই ভাগ বসাতে পারবে না সে। ঈর্ষা হওয়ারই কথা, কিন্তু আশ্চর্য, ক্লডিয়া গর্ব বোধ করলো। তার মনে হলো, এই না হলে বন্ধুত্ব! ভাবলো, শন যদি কোনো পুরুষকে ভালোবেসে এরকম নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মত্যাগ করতে পারে, তাহলে সে-ও ওর কাছ থেকে আশা করতে পারে স্থায়ী ভালোবাসা, কারণ ওদের সম্পর্কটা সম্পূর্ণ অন্য রকম হলেও, তা আরো অনেক ঘনিষ্ঠ ও মধুর।

জোবের গুড়িয়ে ওঠার আওয়াজ পেলো ক্লডিয়া। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শনের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করলো নিজেকে, দাঁড়ালো, হেঁটে চলে এলো জোবের পাশে।

নীলচে-সবুজ এক ঝাঁক মাছি বসেছে ব্যাঙজটার ওপর। হাত ঝাপটা দিয়ে তাড়ালো ক্লডিয়া। চোখ খুলে তার দিকে তাকালো জোব। সম্পূর্ণ সজাগ সে, বুঝতে পেরে অভয় দিয়ে হাসলো ক্লডিয়া। ‘পানি খাবে, জোব? জানতে চাইলো সে।

‘না।’ গলাটা এতো অস্পষ্ট, শোনার জন্যে তার ঠোঁটের কাছে কান নামাতে হলো ক্লডিয়াকে। ‘মেমসাব, আপনি ওঁকে বাধ্য করুন।’

‘কাকে? কি বাধ্য করবো?’ ক্লডিয়া বিস্মিত।

‘আপনার বন্ধুকে। নিজেকে মেরে ফেলছেন উনি। ওঁকে ছাড়া কেউ আপনারা বাঁচবেন না। এখানে আমাকে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য করুন ওঁকে।’

জোবের কথা শেষ হয়নি, মাথা নাড়তে শুরু করলো ক্লডিয়া।

‘না’, দৃঢ়কণ্ঠে বললো সে। ‘ওকে রাজি করানো যাবে না। যদি রাজি হয়ও, আমি মানবো না। এই হাঁদা, জানোই তো, আমরা সবাই পার্টনার, সবার নিয়তি এক সুতোয় গেঁথে নিয়েছি।’ জোবের বুকে হাত রাখলো সে। ‘কি, পানি খাবে?’

মুখড়ে পড়লো জোব, বুজে এলো চোখ দুটো, এতো দুর্বল যে কথা বলার শক্তি নেই। তার পাশে বসে মাছি তাড়াতে লাগলো ক্লডিয়া। বিকেলের দিকে রোদের তাপ কমে এলো, ঘুম থেকে জেগে দ্রুত চারদিকে চোখ বুলালো শন। ‘কেমন আছে ও?’ জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়াকে। ক্লডিয়া মাথা নাড়তে জোবের পাশে এসে বসলো ও, বললো, ‘কিন্তু আর তো দেরি করা চলে না। আবার ওকে হাঁটাতে হবে।’

‘আরেকটু দেরি করো’, অনুরোধ করলো ক্লডিয়া, তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, ‘এখানে বসে কি ভাবছিলাম শুনবে, শন?’

‘কি ভাবছিলে?’ ক্লডিয়ার কাঁধে হাত রাখলো শন।

‘ভাবছিলাম ওয়াটারহোলটার কথা। কল্পনায় দেখতে পেলাম মগে পানি ঢালছি গায়ে, কাপড়চোপড় ধুচ্ছি, দুর্গন্ধমুক্ত হয়ে ফিরে আসছি তোমার কাছে।’

‘কেন, নেপোলিয়ানের কথা শোনানি?’ জিজ্ঞেস করলো শন।

‘নেপোলিয়ান?’ ক্লডিয়া হতভম্ব। ‘গোসল করার সাথে তাঁর কি সম্পর্ক?’

‘যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার সময় হলে প্রতিবারই একজন ঘোড়সওয়ারকে জোসেফিনের কাছে পাঠাতেন চিঠি দিয়ে, চিঠিতে লেখা থাকতো—আমি বাড়ি ফিরছি, গোসল করো না। তারমানে প্রেয়সীর গায়ের গন্ধটাও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। এই অবস্থায় তোমার তাঁর খুব ভালো লাগতো।’

‘পাজি! অভদ্র!’ শনের কাঁধে ঘুঁসি মারলো ক্লডিয়া। আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ গুঙিয়ে উঠলো জোব।

‘ওহে’, বললো শন। ‘কি অবস্থা তোমার?’

‘এবার ওটা দিতে পারেন’, বললো জোব।

‘মরফিন?’ জিজ্ঞেস করলো শন, জবাবে মাথা ঝাঁকালো জোব। ‘সামান্য একটু, ঠিক আছে?’

ইনজেকশন দেয়ার পর চুপচাপ শুয়ে থাকলো জোব, মুখ থেকে ব্যথার রেখা ও ভাঁজগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো।

‘এখন ভালো লাগছে?’ জিজ্ঞেস করলো শন। চোখ না খুলে সামান্য হাসলো জোব। ‘আরো কয়েক মিনিট বিশ্রাম নাও তুমি’, বললো ও। ‘এই ফাঁকে আমরা রেডিওতে খবর পাঠাই।’

দাঁড়ালো শন হেঁটে এলো আলফনসোর কাছে, এরইমধ্যে রেডিওর এরিয়াল লম্বা করেছে সে। ‘লোহার মুগুর বলছি, রণহংকারকে ডাকছি।’

‘রণহংকার বলছি’, জবাবটা এতো তাড়াতাড়ি এলো আর এতো জোরালো শোনালো যে শন ও আলফনসো একযোগে পরস্পরের দিকে তাকালো।

কাল্পনিক একটা পজিশন বললো আলফনসো, যেনো এখনো ওরা নদীর দিকে ফেরার পথে রয়েছে।

খানিকক্ষণ কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না, শুধু যান্ত্রিক শব্দজট শোনা গেলো। তারপর স্পষ্ট, কঠিন সুর ভেসে এলো জেনারেল চায়নার। ‘কর্নেল কোর্টনির সাথে কথা বলতে দাও আমাকে!’

‘জেনারেল চায়না’, ফিসফিস করলো আলফনসো, মাইক্রোফোনটা শনের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। হাত দিয়ে সেটা ঠেলে দিলো শন। উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে পরিবেশ, সবাই ওরা অপেক্ষা করছে জেনারেল চায়না এরপর কি বলে শোনার জন্যে।

নিম্নস্বর জমাট বাধছে। জোবের পাশ থেকে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো ক্লডিয়া, শনের পাশে এসে বসলো, অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে তার কাঁধে একটা হাত রাখলে শন। দু’জনেই ওরা রেডিওর দিকে তাকিয়ে।

‘পলাতক শাস্ত্রানিরা’, ফিসফিস করলো ক্লডিয়া। ‘চায়না জেনে ফেলেছে!’

‘চুপ!’ সাবধান করলো শন।

আরো কয়েক সেকেন্ড পর অপেক্ষার অবসান ঘটলো। জেনারেল চায়না বললো, ‘ঠিক আছে। বুঝতে পারছি, আপনি জবাব দিতে চান না। তবে আমি ধরে নিচ্ছি, মেজর, আমার কথা আপনি শুনছেন।’

সবার মনোযোগ রেডিওর দিকে, এই সময় ধীরে ধীরে চোখ খুললো জোব। জেনারেল চায়নার প্রতিটি কথা শুনেছে সে। হতাশায় মাথা নাড়লো কয়েকবার। তারপর তার চেহারায় একটা থমথমে ভাব ফুটে উঠলো। ব্যথাটা নেই, কাজেই সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারছে সে।

আলফনসো তার কম্বলের ওপর ব্যাগটা ফেলে রেখে গেছে, জোবের কাছ থেকে দশ কদম দূরেও নয়। ব্যাগের সাইড পকেট থেকে বেরিয়ে রয়েছে টোকারড পিস্তলের বাঁট।

‘আপনার জন্যে একটা ফাঁদ পেতেছিলাম আমি’, বলে চলেছে জেনারেল চায়না। ‘ফাঁদটাকে আপনি ফাঁকি দিতে পেরেছেন বলে আমি খুশি। কারণ’, সহাস্যে

কথা বলছে সে, সুরে আক্রোশ বা হতাশার কোনো ছাপই নেই, ‘জিম্বাবুই সীমান্তে আপনি ধরা পড়লে ব্যক্তিগত পরিশোধ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতাম আমি।’

অক্ষত কনুইটার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো জোব। ব্যথা নেই, তার দুর্বল ও আচ্ছন্ন বোধ করছে সে। সমস্ত মনোযোগ টোকারভ পিস্তলের দিকে। ওটার কাছে যেভাবে হোক পৌঁছুতে হবে তাকে। প্রশ্ন হলো, আলফনসো ওটার চেম্বারে বুলেট রেখেছে কিনা। শরীরের একটা পাশ মাটিতে ঘষা খেলো, একটু একটু করে এগোলো সে। কোনো শব্দ করলো না, সবাই নিবিষ্টচিত্তে রেডিওর কথা শুনছে।

‘আমি বলতে চাইছি, কর্নেল কোর্টনি, খেলাটা বন্ধ হয়নি — নাকি খেলার বদলে এটাকে ধাওয়া বলে আখ্যায়িত করবেন? আপনি খুব বড় শিকারী, চিরকাল হিংস্র প্রাণিদের ধাওয়া করে এসেছেন। এই ধাওয়াকে আপনি বলেন স্পোর্ট, বলেন ফেয়ার চেজ, তাই না?’

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এলো জোব। এখনো কোনো ব্যথা অনুভব করছে না। সরীসৃপের ভঙ্গিতে এগোচ্ছে সে, কাত হয়ে, তবে এগোবার গতি আগের চেয়ে বেড়েছে। যে-কোনো মুহূর্তে ওদের কেউ ঘাড় ফেরালেই দেখতে পাবে তাকে।

অবশেষে ইকুইপমেন্টের স্তূপ জোবের নাগালের মধ্যে চলে এলো। পিস্তলের বাঁটা ধরলো সে। ব্যাগের পকেট থেকে বের করার জন্যে টান দেবে, কিন্তু হাতে কোনো জোর পেলো না। আঙুল থেকে ফস্কে গেলো পিস্তলের বাঁট, হাতটা মরা সাপের মতো পড়ে গেলো কষলের ওপর, পাশেই পড়লো পিস্তলটা। পিস্তলের সেফটি-ক্যাচ এনগেজড দেখে স্বস্তিবোধ করলো সে, অ্যাকশন-ও কক করা হয়েছে। লোড করে রেখেছে আলফনসো, প্রয়োজনের মুহূর্তে যাতে ব্যবহার করতে পারে।

রেডিও থেকে ভেসে আসছে জেনারেল চায়নার ভারি গলা, ‘পরিস্থিতি এখন উল্টো হয়ে গেছে, কর্নেল কোর্টনি। আপনি শিকার, আমি শিকারী। আমি জানি আপনি কোথায়, কিন্তু আপনি জানেন না আমি কোথায়। আপনি যতোটুকু সম্ভব বলে ভাবছেন তারচেয়ে অনেক কাছে রয়েছি আমি। বলুন তো কোথায়, কতো কাছে? আন্দাজ করুন, কর্নেল। আর হ্যাঁ, বাঁচতে হলে আপনাকে পালাতে হবে। দৌড়ান, দৌড়ান-তা না হলে আমি কিন্তু ধরে ফেলবো। আর একবার যদি ধরা পড়েন, সব শেষ। কান কাটা চায়না আপনার চামড়া তুলে লবণ মাখাবে। পালান, পালান!’

কষলে পড়ে থাকা পিস্তলের বাঁটা আবার ধরলো জোব। মনের সমস্ত জোর এক করে মুঠোর ভেতর ধরলো সেটা। সেফটি-ক্যাচের স্লাইডে বুড়ো আঙুলটা রাখলো। একটা আতঙ্ক তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হলো। আঙুলগুলো অসাড় লাগছে, এতো দুর্বল যে স্লাইডটা ঠেলে সরাতে পারছে না।







‘ওর ঋণ কোনোদিনই আমি শোধ করতে পারিনি,’ বললো শন। ‘শোধ করার আর সুযোগও পাবো না।’

কাজটা শেষ করলো ও, কমলে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে আছে জোব, বেরিয়ে আছে শুধু মাথাটা। নিজের ব্যাগের কাছে ফিরে এলো শন, পরিষ্কার একটা শার্ট বের করলো। জোবের মাথাটা শার্ট দিয়ে জড়ালো ও, চুমো খেলো তার কপালে, দু’হাত দিয়ে ধরে বুকে তুলে নিলো আবার, সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ‘চলো’, বললো মাতাউকে।

কাঁটাঝোঁপের কাছাকাছি পরিত্যক্ত একটা অ্যান্ট বিয়ার গর্তের কাছে ওদেরকে নিয়ে এলো মাতাউ। মুখটা বড় করতে কয়েক মিনিট সময় লাগলো, তারপর ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো জোবকে। মাতাউ সাহায্য করলো শনকে, দু’জনের চেঁচায় বসার ভঙ্গিতে স্থির করা হলো জোবকে, পূর্বদিকে মুখ করিয়ে। কবরটা ঢেকে দেয়ার আগে একটা গ্রেনেড বের করলো শন, সরু একটা ডাল ভেঙে আনলো, ফাঁদ তৈরি করবে।

কাজটা শেষ করে সোজা হলো শন, ক্লডিয়া’র দৃষ্টিতে প্রশ্ন লক্ষ্য করে বললো, ‘কাফন চোরদের জন্যে।’

গর্তের ভেতর, জোবের চাপাশে, ছোটো ছোটো নুড়ি পাথর ফেলা হলো, লাশটা যাতে কাত না হয়। গর্তের মুখটা বন্ধ করা হলো বড় আকারের পাথর সাজিয়ে। কাজটা শেষ হতেই ওখানে আর এক মুহূর্তেও দাঁড়ালো না শন। জোবকে আগেই বিদায় জানিয়েছে ও। পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসছে। কয়েক মুহূর্ত পর ওকে অনুসরণ করলো ক্লডিয়া।

বাকি রাতটা হাঁটার মধ্যে থাকলো ওরা, কোথাও থামলো না। এতে দ্রুত পা ফেলছে শন, শোক যেনো ওর প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগিতায় জিততে হবে ওকে। ওর পাশে থাকতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো ক্লডিয়া, তবু কোনো অভিযোগ করলো না। সূর্য ওঠার সময় হলো, ইতিমধ্যে ওরা জোবের কবর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে সরে এসেছে। ওদের সামনে উর্বর, কাদাময় প্রান্তর।

লম্বা কয়েকটা গাছের ছায়ায় থামলো ওরা। মাতাউকে সাথে নিয়ে খাবার তৈরি করতে বসলো ক্লডিয়া। বাইনোকুলার পিঠে ঝুলিয়ে লম্বা একটা গাছের মাথায় উঠলো শন, পকেটে ফিল্ড ম্যাপ। তীক্ষ্ণ, কর্কশ শব্দে প্রতিবাদ জানিয়ে বাসা ছাড়লো একটা শকুন, গাছটাকে ঘিরে চক্কর দিলো বারবার। শকুনের বাসায় একজোড়া সাদা ডিম দেখতে পেলো শন। শকুনের দিকে তাকিয়ে হাসলো ও, ‘ডিম চুরি করতে আসেনি, বোকা কোথাকার!’ জোব বিদায় নেয়ার পর এই প্রথম হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটে।

বাইনোকুলার চোখে তুলে খোলা প্রান্তরের ওপর চোখ বুলালো শন। একবার তাকালেই বোঝা যায়, ফসল ফলাবার মাঠ ওগুলো, খানিক দূর পর পর উঁচু ভিটে ও

জঙ্গল রয়েছে। ম্যাপে দেখা গ্রামগুলোরই অংশ ওগুলো। তবে খেতে বেশ কয়েকটা মওশুম লাঙল দেয়া হয়নি বা বীজ ফেলা হয়নি। খালি মাঠে বিস্তার আগাছা জন্মেছে, ঢাকা পড়ে আছে ধোপ-ঝাড়। ছাদহীন গ্রামগুলোর ধ্বংসাবশেষও অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো শন, কোনো কোনো দোচালার কাঠের ফ্রেম এখনো অটুট, শুধু বেড়াগুলো পুড়ে গেছে। মানুষজনের কোনো উপস্থিতি চোখে পড়লো না। খেতগুলোর মাঝখানে পায়ে চলা পথ, তা-ও ঢাকা পড়ে গেছে আগাছায়। গরু-ছাগল বা মুরগী, কিছুই চোখে পড়লো না। রেনামো বা ফেলিমোদের কাজ, ভাবলো শন, ধ্বংসযজ্ঞে কোনো খুত রাখেনি তারা।

পুবদিকে তাকালো শন। ওদিকে নীলচে পাহাড়। ম্যাপ খুলে পাহাড়গুলোর অবস্থান দেখলো, বের করে ফেললো নিজেদের পজিশন। ডানদিকের উঁচু পর্বতশ্রেণীর নাম চিমানিমানি, ওগুলো মৌজাম্বিক ও জিম্বাবুইয়ের মাঝখানে সীমান্ত রেখা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে কাছের চূড়া প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে।

ম্যাপে বড় একটা গ্রাম দেখলো শন, নাম ডমবি। ওর বাম দিকে, কয়েক মাইল সামনে থাকার কথা। ওটাও বোধহয় পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্রাম বা খাবার পাওয়ার কোনো আশা না করাই ভালো। অথচ ব্যাগ প্রায় খালি হয়ে এসেছে, কাল দুপুরের পর থেকে উপোস থাকতে হবে ওদেরকে। যদি ডমবিতে লোকজন থাকেও, হয় সেটা রেনামোদের নয়তো ফেলিমোদের ঘাঁটি হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। শন সিদ্ধান্ত নিলো, লোকবসতি এড়িয়ে চলবে ওরা। এমনকি আলফনসোও বলতে পারবে না কোনো এলাকা কাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নির্দিষ্ট একটা জায়গা যে-পক্ষই দখল করুক, প্রতি ঘন্টায় না হলেও প্রতি দিনই তার সীমানা বদলে যাচ্ছে।

সরাসরি দক্ষিণ দিকে তাকালো শন, ওই পথ ধরেই এগোবে ওরা। খোলা প্রান্তরে গাছপালা ছাড়া কিছুই মাথাচাড়া দিয়ে নেই। প্রান্তরটা ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। উঁচু পাহাড় বা গভীর উপত্যকা বাধা হয়ে নেই, ওদের গতি মছুর করার জন্যে আছে শুধু গভীর অরণ্য, জলাভূমি ও নদী। সবচেয়ে বড় নদীর সাবি, পর্তুগীজদের দেয়া নাম রিয়ো সেভ। চওড়া ও গভীর, পার হতে হলে নৌকো বা ভেলা দরকার হবে।

শেষ নদী লিমপোপো, ওদের পথে সর্বশেষ বাধা। সেটা এখনো তিনশো কিলোমিটার দক্ষিণে। নদীটার তীরে তিনটে দেশের সীমান্ত এক হয়েছে জিম্বাবুই, মৌজাম্বিক ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ওখানে একবার পৌঁছতে পারলে নাগালের মধ্যে চলে আসবে বিখ্যাত ভ্রুগার ন্যাশনাল পার্ক। অবশ্য ভ্রুগার ন্যাশনাল পার্কে দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক বাহিনীর কড়া পাহারা আছে। রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে ঢুকবে ওরা তিনজন — শন, মাতাউ ও আলফনসো। ক্রুডিয়া আমেরিকান নাগরিক, ওদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহযাত্রী, নিরাপত্তাহীনতায় বিচলিত হয়ে ওদের সাথে

রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলেই যে পাওয়া যাবে, ব্যাপারটা অতো সহজ না-ও হতে পারে।

পাখির ডাক শুনে বাস্তবে ফিরে এলো শন। নিচে তাকিয়ে দেখলো গাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মাতাউ, ওর কাছ থেকে ষাট ফুট নিচে। ‘ওনুন’, সাংকেতিক ভাষায় বললো মাতাউ। ‘বিপদ!’

পালস রোট বেড়ে গেলো শনের। শুধু সন্দেহবশত বিপদ-সংকেত দেয়ার লোক নহ্ন মাতাউ। কান খাড়া করলো ও। তবু আরো এক মিনিট অপেক্ষা করতে হলো শুকে, তারপর তনতে পেলো শব্দটা। শনের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এতো ভালো যে শব্দটোও প্রশংসা না করে পারে না, কিন্তু মাতাউর তুলনায় অন্ধ ও বধিরই বলা চলে শুকে।

শব্দটা কানে ঢুকতেই চিনতে পারলো শন, সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলো গায়ের রোম। এখনো অনেক দূরে, তার চিনতে ভুল করেনি ও। ক্রমশ কাছে সরে আসছে।

চোখে বাইনোকুলার তুলে তাকালো শন। বনভূমির মাথা ছুঁয়ে বিশাল একটা পোকাকর মতো ছুটে আসছে হিন্দ গানশিপ। এখনো কয়েক মাইল দূরে, তবে ছুটে আসছে সরাসরি শনের গাছটাকে লক্ষ্য করেই।

\* \* \*



দেখতে গেলো ও। রাগে ও আক্রোশে গরম হয়ে উঠলো শনের মুখ। ‘এই দানবটাকে শেষ করতে না পারলে মরেও আমি শান্তি পাবো না’, বিড়বিড় করে বললো ও।

হঠাৎ দিক বদলে আরেক দিকে ঘুরে গেলো হিন্দ, কয়েক মাইল এগিয়ে শূন্যে স্থির হলো, তারপর নিচে দিকে নেমে হারিয়ে গেলো গাছপালার আড়ালে।

গাছ থেকে নামল শন। হিন্দের আওয়াজ শুনেই চুলোর আগুন নিভিয়ে দিয়েছে মাতাউ। তবে ভুট্টার কেক আগেই তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল।

‘হাঁটতে হাঁটতে খাবো আমরা’, বললো শন। মৃদু শব্দে গুঙিয়ে উঠলো কুড়িয়া, তবে কোমরে হাত দিয়ে সিঁধে হলো। তার সারা শরীর ব্যথায় টন টন করছে।

‘দুঃখিত, সুন্দরী’, বলে তার কাঁধে একটা হাত রাখলো শন। ‘চায়না এখান থেকে মাত্র দু’মাইল পূবে ল্যাণ্ড করেছে। সম্ভবত ডমবি গ্রামে। ধরে নিতে পারো ওখানে তার ট্রপস আছে। বসে থাকার উপায় নেই আমাদের।’

\* \* \*

ডমবি গ্রামের একমাত্র রাস্তার ওপর নামলো হিন্দ। বিশ-পঁচিশটা পাকা দালান নিয়ে গ্রামটা, অনেকদিন থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। জানালার ফ্রেমে কাঁচ নেই, দেয়ালে প্লাস্টার খসে পড়েছে, প্রতিটি বাড়ির উঠান ঢাকা পড়ে আছে ঝোপ ও আগাছায়। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি দোকান ছিলো হিন্দু ব্যবসায়ীদের, এখন সেগুলো খালি, সাইনবোর্ডগুলোয় ধুলো জমেছে, কোনো কোনোটা বুলে পড়েছে একদিকে। হিন্দ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামলো জেনারেল চায়না, একটা দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে ঘুরলো সে। ইউনিফর্ম পরা রেনামো অফিসার তারা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দোকানগুলোর বারান্দায় সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজনকে দেখলো সে।

অফিসারদের সামনের স্যারি থেকে নিজেকে আলাদা করলো প্রকাণ্ডদেহী জেনারেল টিপপো টিপ, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে থপথপ করে হেঁটে এলো সে।

'জেনারেল চায়না, ভাই আমার!' অথচ পরস্পরের শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরম শত্রুও বটে তারা।

পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো তারা, তারপর চুমো খেলো। 'ওরা আমাকে বললো, জেনালে চায়না হিন্দ স্কোয়াড্রন ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি বললাম, জেনারেল চায়না সত্যিকার একজন বীর এবং আমার আপন ভাই', আলিঙ্গন মুখ হয়ে বললো টিপপো টিপ, তাকিয়ে আছে হিন্দ গানশিপের দিকে।

পাইলটের এদৃশ্যে হাত নেড়ে সংকেত দিলো জেনারেল চায়না। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে আবার শূন্যে উঠে পড়লো হিন্দু, গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আরো উঁচুতে উঠলো, তারপর বাক নিয়ে রওনা হলো দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো জেনারেল টিপপো টিপ। মনে মনে হাসলো সে। চায়নার তুরূপ ওটা, জানে সে। বেদখল হয়ে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেললো।

'ভাই টিপপো,' সহাস্যে বললো জেনারেল চায়না। 'তোমার খবর কি শোনাও আমাকে। আমিগুনলাম ফ্রেলিমোদের বিরুদ্ধে প্রতিটি লড়াই জিতছে তুমি। তোমার ভয়ে ওরা নাকি আর আক্রমণ করতেই সাহস পাচ্ছে না।'

সম্পূর্ণ মিথ্যে। ফ্রেলিমোদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে পিছিয়ে এসেছে জেনারেল, বলতে গেলে ডমবি গ্রামে লুকিয়ে আছে তারা। 'ওদেরকে আমরা ধরে ধরে খেয়ে ফেলছি বলে গুজব রটেছে,' বললো টিপপো টিপ। 'এ-থেকেই আন্দাজ করুন কতো লোক হারালে শত্রু শিবিরে এ-ধরনের গুজব রটতে পারে।'

'শুন খুশি হলাম,' হাঁটতে হাঁটতে জেনারেল স্টোর-এর বারান্দায় উঠে এলো ওরা, ছায়ায় দাঁড়ালো। 'তারমানে আমার কোনো সাহায্য আপনার দরকার নেই'

'ভাই সাহায্য করতে চাইলে তা কখনো প্রত্যাখ্যান করতে নেই,' সাথে সাথে মন্তব্য করলো জেনারেল টিপপো টিপ। 'বিশেষ করে সেই ভাই যদি বাজপাখিতে চড়ে আকাশটাকে দখল করে রাখে। এমন হতে পারে আপনার সাহায্যের বিনিময়ে আমিও কিছু উপকার করতে পারি আপনার।'

ব্যাটা জানে আমি সাহায্য চাইতে এসেছি তাবলো চায়না।

‘ফ্রেনিমোদের জন্যে একটা ফাঁদ পেতেছি, আমি,’ বললো টিপপো টিপ। ‘সেত ফরেস্ট থেকে পিছিয়ে এসে।’

আসলে মার খেয়ে পালিয়ে এসেছে সে। সেত বনভূমি সম্পদের একটা বিশাল ভাণ্ডার, সত্তর ফুট লম্বা গাছগুলোকে হাতির দাঁত বলা হয়। ওখানে যে মেহগনি পাওয়া যায় দুনিয়ার আর কোথাও তার অন্তিত্ব নেই। শুধু কাঠ বিক্রি করে মৌজামিক সরকার একশো বছর তার নাগরিকদের তরুণ-শোষণের ব্যবস্থা করতে পারবে। কিন্তু পোচররা যেমন সেত বনভূমি থেকে হাতি ও মোষ মেয়ে সাফ করেছে, তেমন সরকারী কর্মচারী ও গেরিলা দলগুলো সাফ করছে গাছগুলোকে।

‘খ্রিশ হাজার দাস এনেছে ওরা,’ চায়নাকে বললো টিপপো টিপ।

‘বলেন কি! এতো! ফ্রেনিমোদের আপনি সে-সুযোগ দিলেন?’

‘কেন দেবো না!’ হাসলো জেনারেল টিপ। ‘ওরা গাছ কাটছে, কিন্তু কাদের জন্যে কাটছে — নিজেদের জন্যে, নাকি আমার জন্যে? গাছ তো কাটছে, কিন্তু রাস্তা! ও রেললাইন মেরামত না হওয়া পর্যন্ত সরাবে কিতাবে রেললাইনের ধারে গুলো জড়ো করছে তারা। আমার লোকজন নজর রাখছে গুলোর ওপর। এতোদিনে আবার সেত ফরেস্টে ফিরে যাবার একটা তাগিদ অনুভব করছি আমি।’

‘কিন্তু আপনিই বা গুলো রক্ষতানি করবেন কিতাবে? একেকটা নগের গুলন হবে কম করেও একশো টন। কিনবেই বা কে?’

হাততালি দিয়ে, চিৎকার করে একজন সহকারীকে ডাকলো জেনারেল টিপপো টিপ। রাস্তার জটলা থেকে ছুটে এলো লোকটা, জেনারেলদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওদের পায়ের কাছে একটা ফিল্ড ম্যাপের ভাঁজ খুললো সে। চোয়ার থেকে ম্যাপটার দিকে ঝুঁকে পড়লো দুই বোনামো জেনারেল। ‘এই হলো বনভূমি।’

রিয়ো সেত আর লিমপোপো নদীর মাঝঝানের বিশাল এলাকাটা আঁখুল দিয়ে দেখালো টিপপো টিপ, ওদের পরিজ্ঞান থেকে সরাসরি দক্ষিণে ‘ফ্রেনিমোরা ওদের টিমবারইয়ার্ড তৈরি করেছে এখানে, এখানে আর এখানে।’

‘বলে যান,’ তাকে উৎসাহ যোগালো কমরেড চায়না।

‘সর্বদক্ষিণের টিমবারইয়ার্ডগুলো লিমপোপো নদীর উত্তর পাড় থেকে মাত্র খ্রিশ মাইল দূরে আর দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত থেকেও ওই খ্রিশ মাইল দূরে!’

বিপদের কথা নয়, যদি তারাই কটা তগাইগুলো কোনোর ব্যাপারে অগ্রহী হয়,’ হেসে উঠে বললো জেনারেল টিপ। এখানে আমরা যে প্রাকৃতিক সম্পদের কথা আলোচনা করছি তার দাম হাফ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ওরা বলছে, আমরা যদি ঠিকমতো ডেলিভারি দিতে পারি, তাহলে পরিবহনের সব ব্যবস্থা ওরাই করব, পেমেট দেবে জুরিখ বা লিসবনে।’ এক মুহূর্ত থেমে মুচকি হাসলো সে, তারপর আবার বললো, ‘ফ্রেনিমোরা কেটেছে, আমরা বিক্রি করবো।’

‘আর আমার নতুন হেলিকপ্টার ওগুলো দখল করার কাজে আপনাকে সাহায্য করবে?’

‘সাহায্য করতে চায় করুক, তবে আমার নিজের ফোর্স একাই কাজটা করতে পারবে।’

‘যদিও জয়েন্ট অপারেশন হলে কাজটা তাড়াতাড়ি সারা যাবে, সাফল্য সম্পর্কে আরও বেশি নিশ্চিত হওয়া যাবে,’ টিপপো টিপকে বললো চায়না।

‘আমার বাজপাখির সাহায্য পেলে জঙ্গল থেকে ফেলিমোদের তাড়াতে এক সপ্তাও লাগবে না আপনার।’

প্রস্তাবটা বিবেচনা করার ভান করলো টিপপো টিপ, তারপর বললো ‘অবশ্য সাহায্যের বিনিময়ে আপনাকে একটা উচিত ভাগ দেয়া আমার কর্তব্য।’

‘উচিত -এর বদলে ‘সমান’ শব্দটা বেশি পছন্দ আমার, দীর্ঘশ্বাস ফেললো জেনারেল চায়না।

তীব্র প্রতিবাদ জানালো টিপপো টিপ। এক ঘণ্টার ওপর তর্ক ও দর কষাকষি হলো। অবশেষে একটা সমঝোতায় পৌঁছুলো তারা। ত্রিশ হাজার শ্রমিক কয়েক মাস ধরে গাধার খাটনি খেটেছে, সম্পদটা গোটা জাতির কিন্তু ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে গেলো দু’জন অসৎ জেনারেলের মধ্যে।

জেনারেল টিপপো টিপ জানালো, শ্রিকিদের পেট ভরে খেতে দেয়া হচ্ছে না, অসুখে-বিসুখে ইদানীং রোজ প্রায় একশো শ্রমিক মারা যাচ্ছে। প্রথম দিকে যে হারে গাছ কাটা হতো এখন তার অর্ধেকও কাটা হচ্ছে না। নতুন শ্রমিকও যোগাড় করতে পারছে না ফেলিমোরা। ‘এখনই সময় হামলা করার, বললো সে। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই।’

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো জেনারেল চায়না। আর আধঘন্টা পর তাকে নিতে আসবে হিন্দ। আরেকটা ব্যাপার, হঠাৎ করেই প্রসঙ্গটা পাড়লো সে। তার গলার আওয়াজ বদলে যেতে শুনে সতর্ক হয় উঠলো টিপপো টিপ।

‘ছোট একদল ফেরারীকে ধাওয়া করছি আমি। মনে হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত পেরুবার চেষ্টা করবে তারা, সংক্ষেপে শনের দলের বর্ণনা দিলো সে। আমি চাই ডমপি ও লিমপোপোর মাঝখানে যেখানে যতো ঘাঁটি ও ফোর্স আছে আপনার, সবগুলোকে আপনি সতর্ক করে দেন, তারা যেনো ফেরারীদের এই দলটাকে ধরার চেষ্টা করে।’

‘ফর্সা?’ সাদা? শ্বোতঙ্গিনী? যুবতী?’ লোভে চকচক করে উঠলো জেনারেল টিপপো টিপের চোখ। সুন্দরী? ভারি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো! ভাই চায়না আমেরিকান যুবতীর প্রতি আমার আবার প্রচণ্ড দুর্বলতা।’

‘গুরুত্বপূর্ণ হলো, পুরুষটা, সে-ই লিডার। মেয়েটা আমেরিকান হলেও, তার খুব একটা মূল্য নেই।’

‘মেয়েমানুষ মাত্রই মূল্যবান, অন্তত আমার কাছে, বিশেষ করে সে যদি ফর্সা ও কচি হয়। আসুন, ভাই, আরেকবার দর কষি আমরা। ওদেরকে ধরার ব্যাপারে সাধ্যমতো সাহায্য করবো আমি। পুরুষটাকে আপনি পাবেন। কিন্তু মেয়েটাকে পাবো আমি। রাজি?’ চায়নার দিকে হাত বাড়ালো টিপপো টিপ।

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে তার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিলো জেনারেল চায়না। ‘রাজি। কিন্তু পুরুষটাকে, শন কোর্টনিকে, অক্ষত অবস্থায় চাই আমি।’

‘মেয়েটার ব্যাপারে আমারও সেই শর্ত, অক্ষত অবস্থায় চাই।’

সময় নষ্ট না করে মাপের ওপর আঙুল রাখলো জেনারেল চায়না। ‘আমার জানামতে তাদের সর্বশেষ পজিশন ছিলো এটা, রেললাইনের ঠিক উত্তরে। তবে সেটা তিনদিন আগের কথা। এই মুহূর্তে তারা এখানে কোথাও আছে’, ম্যাপের গায়ে আঙুল বুলালো সে। ‘দলের একজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, কাজেই খুব বেশি দক্ষিণে এখনো তারা পৌঁছুতে পারেনি। টহলবাহিনী পাঠিয়েছি আমি, প্রায় তিনশো লোক রেললাইনের দক্ষিণ দিকটা চষে ফেলছে, তাদের ছাপ দেখতে পেলেই রিপোর্ট করবে আমাকে। এবার বলুন, আপনি কতোজনকে লাগাতে পারবেন।’

‘এরইমধ্যে তিনটে কোম্পানীকে রিয়ো সেভ ফরেস্টে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি, লগগুলোর ওপর নজর রাখছে তারা। এদিকে, আরো উত্তরে, পাঁচটা কোম্পানী রয়েছে আমার। আপনার শত্রুরা যদি লিমপোপো সীমান্তে পৌঁছুতে চেষ্টা করে, আমার কোম্পানী ও ফ্রেলিমো গার্ডদের তৈরি লাইন ভেদ করে যেতে হবে তাদেরকে। আমি আমার কোম্পানী কমাগুরদের রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছি।’

‘প্রতিটি ট্রেইল কাভার দিতে হবে ওদের, কড়া নজর রাখতে হবে প্রতিটি নদীর ওপর। জঙ্গলের মধ্যে মনববন্ধন রচনা করা সম্ভব নয়, আমি বুঝি, তবু কোথাও কোনো ফাঁক রাখা চলবে না’, কর্তৃত্বের সুরে বললো জেনারেল চায়না। ‘আপনার সেকশন কমাগুরদের সতর্ক করে দিন, শন কোর্টনি একজন দক্ষ সামরিক অফিসার। জিম্বাবুইয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধে লড়েছে সে।’

‘শন কোর্টনি, নামটা আমার পরিচিত-স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সে-ই তো আপনার ট্রেনিং ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়েছিল, তাই না?’ চায়নার কানের দিকে একবার তাকালো টিপপো টিপ।

হাত দিয়ে কানটা ঢেকে মৃদু হাসলো চায়না। ‘হ্যাঁ। এর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে।’

দু'জনেই ওরা কান খাড়া করলো, ফিরে আসছে হিন্দ ।

'১১৮৪ এমএইচজেড-এ রেডিও যোগাযোগ বজায় রাখবো আমরা', টিপপো টিপকে বললো কমরেড চায়না । 'প্রতিদিন সকাল ছ'টায়, দুপুরে, আর সন্ধ্যা ছ'টায় ।'

হিন্দের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে জেনারেল টিপপো টিপ, অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকালো সে ।

হিন্দে চড়লো চায়না, পতুগীজ পাইলট এক নিমেষে হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উঠে এলো । 'জেনারেল', এয়ারফোনে পাইলটের গলা পেলো চায়না । 'আপনার টহল বাহিনীর একজন লিডার আপনাকে ডাকছে । লাল বাতি কল সাইন ব্যবহার করছে ওরা ।'

'ওড । ওদের ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করো আমাদের রেডিও ।'

খানিক পর মাইক্রোফোনে কথা বললো জেনারেল চায়না, 'লালবাতি, এখানে আমি, রণহুংকার ।'

সাথে সাথে টহল বাহিনীর লিডার সাড়া দিলো । 'রণহুংকার, এখানে আমি, লাল বাতি । আমরা ওদের সন্ধান পেয়েছি ।'

'তোমাদের পজিশন জানাও', নির্দেশ দিলো জেনারেল চায়না, ফিস্ত ম্যাপে চোখ রাখলো সেকশন লিডার পজিশন জানালো ।

ডমবি গ্রাম থেকে ত্রিশ মাইল উত্তর দিকে রয়েছে ওরা । 'হিন্দকে দেখতে পেলো লাল একটা ফ্লোর ছুঁড়বে আকাশে', সেকশন লিডারকে নির্দেশ দিলো সে ।

রেনামো গেরিলারা গাছপালা কেটে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে রেখেছে, সেখানেই ল্যাগ করলো হিন্দ । ককপিট থেকে লাফ দিয়ে নামলো জেনারেল চায়না, এগিয়ে এসে তাকে স্যালাউট করলো সেকশন লিডার । অস্ত্র, পানির বোতল ও অ্যামুনিশনে ঢাকা পড়ে আছে তার শরীর । 'কাল কোনো এক সময় এই পথ দিয়ে গেছে ওরা', রিপোর্ট করলো সে ।

রেনামো গেরিলারা গাছপালা কেটে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে রেখেছে, সেখানেই ল্যাগ করলো হিন্দ । ককপিট থেকে লাফ দিয়ে নামলো জেনারেল চায়না, এগিয়ে এসে তাকে স্যালাউট করলো সেকশন লিডার । অস্ত্র, পানির বোতল ও অ্যামুনিশনে ঢাকা পড়ে আছে তার শরীর । 'কাল কোনো এক সময় এই পথ দিয়ে গেছে ওরা', রিপোর্ট করলো সে ।

'ঠিক জানো, ওরাই?'

'দলে একজন সাদা মেয়ে আছে', মাথা ঝাঁকালো সেকশন লিডার । হাত তুলে সামনেটা দেখালো, 'ওখানে ওরা কিছু একটা পুঁতে রেখে গেছে । আমরা ছুঁইনি, তবে ধারণা করছি ওটা সম্ভবত একটা কবর ।'

‘চলো, দেখি’, সেকশন লিডারের পিছু পিছু কাঁটাঝোপে ঢুকলো জেনারেল।  
‘হ্যাঁ, করব বলেই মনে হচ্ছে। খোলো গুটা।’

অস্ত্র নামিয়ে রেখে রেনামো গেরিলারা পাতর সরাতে শুরু করলো। বারবার ভাগাদা দিলো জেনারেল চায়না, ‘হাত চালাও! হাত চালাও!’

‘ভেতরে একটা লাশ রয়েছে’, সেকশন লিডার পিছন ফিরে তাকালো চায়নার দিকে। জোবের কাপড় মোড়া মাথাটা দেখতে পেরেছে সে। হাত বাড়িতে মাথা থেকে শার্টটা খুলে নিলো।

‘ম্যাটাবেল গাধাটা’, চেহারা দেখেই জোবকে চিনতে পারলো জেনারেল চায়না। ‘এতো দূর হেঁটে আসতে পারবে বলে ভাবিনি আমি। বের করো, বের করো — হায়েনাদের খোরাক বানাও গুটাকে।’

কবরে নামলো দু’জন গেরিলা, কয়ল মোড়া কাঁধটা ধরে টান দিলো। চকচক করছে চায়নার চোখ, উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে শরীর। প্রাচীন আফ্রিকায়, কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে, শত্রুপক্ষের লাশ ছিন্নভিন্ন করার রীতি প্রচলিত ছিলো মনে করা হতো, শরীরটা ছিন্নভিন্ন করা হলে আত্মা পালিয়ে যাবে, তাহলে আর বিজয়ীর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না সে। কররের ওপর চোখ রেখে মনে মনে হাসলো কমরেড চায়না, সিদ্ধান্ত নিলো পরবর্তী রেডিও মেসেজে দৃশ্যটার বিশদ বর্ণনা দেবে সে, শন কোর্টনির কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখতে হবে তাকে।

হঠাৎ গাছের ছাল ও সরু একটা ডাল দেখতে পেলো সে, কয়ল মোড়া লাশের কাঁধে লেগে রয়েছে, খানিকটা বাঁকা হয়ে। ভুরু কুঁচকে উঠলো তার। হঠাৎ ডালটায় টান পড়লো, আরো একটু বাঁকা হলো সেটা, সেই সাথে মৃদু একটা শব্দ হলো শব্দটা চিনতে পেরে আতঙ্কে বিকৃত হয়ে উঠলো জেনারেল চায়নার চেহারা। চিৎকার করলো সে, ‘থ্রেনেড!’ ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়লো।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় মাটির ওপর বার কয়েক আছাড় খেলো কমরেড চায়না, ছুটে এসে কি যেনো লাগলো কপালে। শরীরটাকে একবার গড়িয়ে দিয়ে বসলো সে, চোখের সামনে কিছুই দেখতে পেলো না। অন্ধ হয়ে গেছি! ভাবলো সে। কিন্তু না, ধীরে ধীরে ফিরে এলো দৃষ্টি। অনুভব করলো, কপাল থেকে রক্তের একটা ধারা নামছে। মুখে হাত বুলিয়ে নাকের পাশেও একটা ক্ষত আবিষ্কার করলো সে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, তাকালো কবরের ভেতর। গেরিলাদের একজন কবরের ভেতর বসে আছে, বেরিয়ে পড়া নিজের নাড়িভুঁড়ি আবার জায়গামতো ঢোকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে লোকটা। দ্বিতীয় লোকটা সাথে সাথে মারা গেছে। সেকশন লিডার লাফ দিয়ে সোজা হলো, চায়নার সামনে এসে কপালের ক্ষতটা পরীক্ষা করছে। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো জেনারেল। ‘শন কোর্টনি, ইউ বাস্টার্ড! এর মূল্য তোমাকে দিতে হবে!’

আহত গেরিলা এখনো তার নাড়িভূঁড়ি হাতড়াচ্ছে, কিন্তু আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসছে সেগুলো। তার পেট ও মুখ থেকে ফুট-ফাট আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, জেনারেল চায়নার বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। ‘নিয়ে যাও ওকে! সরাও! চূপ করাও!’

আহত লোকটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছে জেনারেল। চারদিকে তাকালো সে, কার ওপর ঝাল ঝাড়বে বুঝতে পারছে না। ‘তোমরা! গেরিলারা!’ হুংকার ছাড়লো সে। ‘বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছো কি মনে করে! ছোরা বের করো, ছোরা!’ কয়েকজন গেরিলা সাথে সাথে তার নির্দেশ পালন করলো। ‘ম্যাটাবেল কুকুরটাকে গর্ত থেকে বের করো! হ্যাঁ। এবার কাজে নেমে পড়ো। চালাও ছোরা! কাটো! টুকরো টুকরো করো! আরো ছোটো, আরো ছোটো! থেমো না! মাংসের বল চাই আমি! ছোটো ছোটো বল! হায়েনারা যাতে সহজে গিলতে পারে! হ্যাঁ।’

\* \* \*

সারাটা সকাল পথ দেখিয়ে ওদেরকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে চললো মাতাউ। ফসলহীন খালি মাঠ ও পরিত্যক্ত গ্রামগুলোর ভেতর দিয়ে এগোলো ওরা। চাষবাস না হওয়ায় ঝোপ-ঝাড় জন্মেছে মাঠে, আড়াল হিসেবে কাজ করলো ওগুলো। তবে হাঁটার গতি মন্থর হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে ক্লডিয়ার। সহ্যক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে। এক সময় শনের পাশেই ছিলো, তারপর পিছিয়ে পড়লো, চেষ্টা করেও হাঁটার গতি বাড়াতে পারলো না। কাঁটাঝোপের গায়ে ঘষা খেয়ে হাত ও চামড়া ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এতো দুর্বল যে কথা বলার শক্তি নেই।

প্রায়ই দাঁড়িয়ে পড়লো শন, ক্লডিয়াকে এগিয়ে আসার সুযোগ দিলো। ‘দুঃখিত’, বিড়বিড় করলো ক্লডিয়া, চোখ বুলালো আকাশে।

‘হাঁটার মধ্যে থাকতে হবে আমাদের’, বললো শন। ক্লডিয়া টলছে দেখে কাঁধে একটা হাত রেখে সোজা থাকতে সাহায্য করলো তাকে।

দুপুরের খানিক পর আবার হিন্দের আওয়াজ পেলো ওরা। এঞ্জিনের অস্পষ্ট শব্দ উত্তরে সরে গেলো। আরো এক মাইলের মতো এগিয়ে থামার নির্দেশ দিলো শন, ক্লডিয়াকে ধরে গাছের ছায়ায় নিয়ে এলো। ঝোপের মাঝখানে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো ক্লডিয়া। ঘুমিয়ে পড়লো সাথে সাথে।

ঘুম ভাঙার পর ক্লডিয়ার মনে হলো, মিনিট পাঁচেক চোখ বুজে ছিলো সে। কিন্তু দেখলো, রোদের তাপ কমে গেছে, ছায়াগুলো লম্বা হয়েছে। তার মানে এখন বিকেল! উঠে বসলো সে। দেখলো, আশুন জেলে খাবার তৈরি করছে শন।

‘খিদে পেয়েছে?’ জিজ্ঞেস করলো শন।

‘প্রচণ্ড!’

‘ডিনার’, একটা প্লেটে করে খাবার নিয়ে এলো শন।

প্লেটের দিকে তাকিয়ে ভুরু কৌঁচকালো ক্লডিয়া। ‘কি ওগুলো?’ কালো সসেজ-এর স্তূপ, আকারে প্রতিটি তার কড়ে আঙুলের সমান।

‘জানতে চেয়ো না’, বললো শন। ‘খাও।’

প্লেটে থেকে একটু তুলে নিয়ে গন্ধ ঝঁকলো ক্লডিয়া। এখনো গরম গন্ধটা চিনতে পারলো না, তবে মাংসের মতোই লাগলো।

‘খাও!’ আবার বললো শন, ক্লডিয়ার প্লেট থেকে নিজেও খেলো একটা। ‘ভারি মজা।’

দেখাদেখি ক্লডিয়ার খেলো একটা। বেশ ভালোই লাগলো।

‘আরেকটা খাও।’

‘না, ধন্যবাদ।’

‘প্রোতিনে ভরপুর। খাও।’

‘অচেনা খাবার আমি খাই না।’

‘খালি পেটে হাঁটবে কিভাবে? নাও, হাঁ করো!’ ক্লডিয়াকে নিজের হাতে খাওয়ালো শন, নিজেও খেলো।

প্রেট খালি হবার পর ক্লডিয়া বললো, ‘এবার বলো, কী খেলাম।’ জবাবে নিঃশব্দে হাসলো শন, মাথা নাড়লো এদিক ওদিক, তারপর আলফনসোর দিকে তাকালো।

‘রেডিওটা অন করো হে’, বললো শন। ‘শোনা যাক চায়নার কি বলার আছে।’

ব্যাগ থেকে রেডিও বের করছে আলফনসো, নিঃশব্দে ক্যাম্পে ফিরে এলো মাতাউ। তার হাতে সরু একটা ডাল দেখলো ক্লডিয়া, শুধু ছাল রয়েছে ভেতরে কাঠ নেই। টিউবটার দুই মুখ ঘাস দিয়ে বন্ধ করা। শনের সাথে বিড়বিড় করে কথা বললো সে, থমথমে হয়ে উঠলো শনের চেহারা।

‘কী ব্যাপার?’ ফিসফিস করে জানতে চাইলো ক্লডিয়া।

‘সামনের দিকটায় প্রচুর ছাপ দেখতে পেয়েছে মাতাউ’, বললো শন। ‘অনেক লোক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। রেনামো নাকি ফেলিমো, বলতে পারছে না ও।’

খবরটা ভয় পাইয়ে দিলো ক্লডিয়াকে, শনের আরো কাছে সরে এলো সে, ওর কাঁধে হেলান দিলো। রেডিও অন করেছে আলফনসো, একসাথে অনেকগুলো গলা ভেসে আসছে স্পীকার থেকে, আফ্রিকার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে। ‘কিছু একটা ঘটছে বলে মনে হয়’, মন্তব্য করলো আলফনসো। ‘একটা পাঁচিল খাড়া করছে ওরা, আসা-যাওয়া বন্ধ করার জন্যে। প্রচুর লোক পাঠানো হয়েছে।’

‘রেনামো? জানতে চাইলো শন।

মাথা ঝাকালো আলফনসো। ‘মনে হলো জেনারেল টিপপো টিপের লোক ওরা।’

‘কি বলছে ও?’ জানতে চাইলো ক্লডিয়া।

‘কুটিন ট্রাফিক’, মিথ্যে বললো শন, চায় না ভয় পাক ক্লডিয়া।

ক্লডিয়ার পেশীতে ঢিল পড়লো, তাকালো মাতাউর দিকে। আগুনের ধারে উবু হয়ে বসেছে সে, টিউবটা আগুনের ওপর ঝাকালে ঘন ঘন। টিউবের মুখ থেকে কয়লার ওপর কি যেনো পড়ছে একটা দুটো করে। জিনিসগুলো চিনতে পেরে আঁতকে উঠলো ক্লডিয়া। ‘ওগুলো...!’ কথা শেষ করতে পারলো না, দেখলো একগাদা ঔয়্যোপোকা মোচড় খাচ্ছে লাল কয়লার ওপর, গায়ের কাঁটাগুলো পুড়ছে, ধোঁয়া উঠছে সেগুলো থেকে, ধীরে ধীরে কালো সসেজের আকৃতি নিচ্ছে। মুখে হাত চাপা দিয়ে আতর্নাদ করে উঠলো ক্লডিয়া। ‘আমি কি তাহলে...!’ হাঁপিয়ে উঠলো সে, আতঙ্কে নীল হয়ে গেলো চেহারা। ‘না, আমি ঝাইনি! ওগুলো আমি ঝাইনি! না-না! অসম্ভব...।’

‘অত্যন্ত পুষ্টিকর’, তাকে আশ্বস্ত করলো শন। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে কয়লা থেকে একটা ঔয়্যোপোকা তুলে ঘন ঘন হাত বদল করলো মাতাউ। সোজা হলো, এগিয়ে এসে বাড়িয়ে ধরলো ক্লডিয়ার দিকে। ‘খান, ডেন্ না, ভারি সুস্বাদু।’

‘আমি জ্ঞান হারাবো!’ চিৎকার করলো ক্লডিয়া। ‘আমার বমি পাচ্ছে!’ দু’হাতে পেটটা চেপে ধরলো সে।

এই সময় হঠাৎ রেডিওর দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলো শন। ওর ভুরু কুঁচকে উঠছে দেখে কান খাড়া করলো ক্লুডিয়ার, জানতে চাইলো, ‘কী ভাষা ওটা?’

‘আফ্রিকান’, সংক্ষেপে জবাব দিলো শন। ‘চুপ! শোনো!’ কিন্তু আওয়াজটা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে গেলো।

‘আফ্রিকান?’ জিজ্ঞেস করলো ক্লুডিয়া। ‘সাউথ আফ্রিকান ডাচ?’

‘হ্যাঁ’, মাথা ঝাঁকালো শন। ওর ধারণা, দক্ষিণ আফ্রিকার মিলিটারী ট্রান্সমিশন ছিলো ওটা, সম্ভবত লিমপোপো সীমান্ত থেকে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাচ্ছিল হেডকোয়ার্টারে। আলফনসোর সাথে আলোচনা করলো শন, তারপর ক্লুডিয়াকে বললো, ‘আলফনসোরও ধারণা, সাউথ আফ্রিকান বর্ডার পেট্রোল।’ হাতঘড়ি দেখলো শন। ‘আজ আর বোধহয় জেনারেল চায়না তার গান শোনাবে না। তৈরি হয়ে নাও, রওনা হবো আমরা।’

দাঁড়াতে যাচ্ছে শন, এই সময় আবার জ্যাক্ত হয়ে উঠলো রেডিও। এবার গলার আওয়াজটা এতো পরিষ্কার যে জেনারেল চায়নার শ্বাস টানার প্রতিটি শব্দ শুনতে পেলো ওরা। ‘গুড ইভনিং, কর্নেল কোর্টনি। দেরি করার জন্যে দুঃখিত। খুব জরুরী একটা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল কিনা। সাড়া দিন, প্রীজ, কর্নেল কোর্টনি।’

নিশ্চরতা নামলো। মাইক্রোফোনটার দিকে শন হাত বাড়ালো না।

‘এখনো বাকশক্তি ফিরে পাননি তাহলে?’ অপরপ্রান্ত থেকে হাসলো কমরেড চায়না। ‘বেশ। তবে আমি জানি আপনি শুনছেন, কাজেই আপনাকে অভিনন্দন জানানোর কাজটা আগে সেরে নিই। সত্যি, এতো অল্প সময়ের ভেতর এতোটা এগোতে পারবেন বলে ভাবিনি আমি। বিশেষ করে মিস মনটেরো যেখানে ব্রেক বা বাধা হিসেবে কাজ করছেন।’

‘হারামি লোক!’ তিস্তকণ্ঠে বিড়বিড় করলো ক্লুডিয়া।

‘সত্যি কথা বলতে কি, কর্নেল কোর্টনি, আপনি আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। আপনাকে ওয়েলকাম জানানোর জন্যে স্টপ লাইনটা আরো দক্ষিণে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছি আমরা।’

আলফনসো ও শন দৃষ্টি বিনিময় করলো।

হঠাৎ বদলে গেলো গলাটা, শব্দগুলো যেনো চিবাচ্ছে জেনারেল চায়না। ‘আপনারা ম্যাটাবেল কুকুরটার কবর আমরা খুঁজে পেয়েছি।’ ক্লুডিয়া অনুভব করলো, তার পাশে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো শন। ‘লাশটা আমরা কবর থেকে তুলে পরীক্ষা করেছি। পচনের মাত্রা দেখে বুঝতে পেরেছি কতোক্ষণ মাটির সংস্পর্শে ছিলো ওটা।’ একটু একটু কাঁপছে শন। ‘পচলে ম্যাটাবেলরা আরো বেশি গন্ধ। ভালো কথা, তার মাথার পিছনে বুলেট কি আপনিই চুকিয়েছেন? অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ। ম্যাটাবেল কুকুরটা এমনিতেও বাঁচতো না।’

শনের দিকে তাকাতে ভয় পেলো ক্লুডিয়া।

‘ও, ভালো কথা, ফাঁদটা কোনো কাজে আসেনি’, বলে চলেছে জেনারেল চায়না, বলার ফাঁকে হাসছে। ‘খুবই কাঁচা হাতের কাজ ছিলো ওটা। ম্যাটাবেনটাকে নিয়ে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি করবেন না, মেজর। হায়েনাদের জন্যে কাজটা আমি সহজ করে দিয়েছি। দু’জন লোককে লাগিয়ে দিয়েছিলাম, ছোরা দিয়ে টুকরো টুকরো করেছে তারা।’

ইশ-জ্বান হারিয়ে ফেললো শন, ছোঁ দিয়ে মাইক্রোফোনটা তুলে নিয়ে চিৎকার করলো, ‘ইউ সোয়াইন! ইউ ব্লাডি অ্যানিমেল! প্রার্থনা করো, আমার হাতে যেনো তোমাকে পড়তে না হয়!’ থামলো শন, হাঁপাচ্ছে।

‘খন্যবাদ’, কর্নেল’, জেনারেল চায়নার কণ্ঠস্বরে হাসির ভাব। ‘একা একা কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।’

জবাব দেয়ার ঝাঁকটা অতি কষ্টে দমন করলো শন, হাত ঝাপটা দিয়ে বন্ধ করলো রেডিওটা। ‘প্যাক আপ!’ রাগে এখনো কাঁপছে ওর গলা। ‘তুল করেছে, তার খেসারত দিতে হবে। আমি কথা বলায় চায়না এখন জানে কোথায় আমরা রয়েছে। খুব জোরে হাঁটতে হবে আমাদের।’

তবু আজ রাতে ওদের এগোবার গতি বাড়ানো গেলো না। মাঝরাতের আগে দু’বার ওদেরকে থামার সংকেত দিলো মাতাউ, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সতর্ক করে দিলো, সামনে বিপদ। দু’বারই সামনের পথে ফাঁদ দেখতে পেলো সে, ওদের জন্যেই পাতা হয়েছে। দু’বারই ওরা ঘুরপথে ধরে, ধীরে ধীরে এগোতে বাধ্য হলো।

‘জেনারেল টিপপো টিপের লোক ওরা’, বিড়বিড় করলো আলফনসো। ‘এই এলাকা ওদের দখলে রয়েছে। টিপপো টিপ নিশ্চয়ই সাহায্য করছেন জেনারেল চায়নাকে। সামনের সব ক’টা পথে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে রেনামো গেরিলারা।’

তবে মাঝরাতের খানিক পর ওদের ভাগ্য খানিকটা প্রসন্ন হলো। একটা পথ দেখতে পেলো মাতাউ, প্রায় সরাসরি দক্ষিণ দিকে এগিয়েছে। বেশিক্ষণ হয়নি, এই পথ দিয়ে একদল লোক হেঁটে গেছে—যেদিকে ওরা যাচ্ছে সেদিকেই। সুযোগটা কাজে লাগালো শন। ‘ওদের ছাপে পা ফেলবো আমরা, পিছনে আমাদের আলাদা কোনো ছাপ থাকবে না।’ মাতাউকে সামনে থাকতে বললো ও, অন্ধকারেও দেখতে পায় সে। রেনামো গেরিলাদের ছাপের ওপর পা ফেললো মাতাউ, মাতাউর ছাপের ওপর পা ফেললো আলফনসো, তারপর শন, তারপর ক্লুডিয়া। হাঁটার গতি বেড়ে গেলো ওদের, তারপর এক সময় সামনে গেরিলা দলটার আওয়াজ পেলো মাতাউ। তার সংকেত পেতে সতর্ক হয়ে গেলো সবাই, হাঁটার গতি কমিয়ে আনলো।

ভোর হবার খানিক আগে রেনামো টহলবাহিনী ওদের সামনে থামলো। নিঃশব্দ পায়ে, ভূতের মতো, একাই এগোলো মাতাউ। ঝোপের আড়াল থেকে দেখলো, পথের দু’পাশেই ওদের জন্যে ফাঁদ পাতছে গেরিলারা। অ্যামবুশ পার্টি তাদের কাজ

শেষ করেনি, শনের কাছে ফিরে এলো মাতাউ। টহলবাহিনীকে পাশ কাটিয়ে এলো ওরা, তাদেরকে পিছনে ফেলে চলে এলো সেই একই পথে, অনেকটা সামনে।

‘প্রায় পঁচিশ মাইল এগিয়েছি আমরা’, আকাশের গায়ে ভোরের প্রথম আলো দেখতে পেয়ে বললো শন। ‘কিন্তু দিনের আলোয় হাঁটার ঝুঁকি নেয়া যাবে না। চারদিকে গিজগিজ করছে রেনামোরা। মাতাউ, গা ঢাকার জন্যে একটা জায়গা খুঁজে বের করো।’

সেভ নদী খুব বেশি দূরে নয়! ওদেরকে পথ দেখিয়ে লম্বা ঘাসের রাজ্যে নিয়ে এলো মাতাউ। প্রথমে কাদা, তারপর পানির স্পর্শ পেলো ওরা। মাঝে মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেলো পানিতে। অগভীর লেগুন, বেশ লম্বা, পেরিয়ে এলো অনায়াসে। পা ফেলার সাথে সাথে মেঘের আকৃতি নিয়ে মাথাচাড়া দিলো ঝাঁক ঝাঁক মশা। পানিতে ওদের ছাপ পড়ছে না, দলের পিছনে রয়েছে শন, সযত্নে ফাঁক হওয়া ঘাসের বন জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছে।

পথটা ছেড়ে মাত্র কয়েকশো গজ এগিয়েছে ওরা, সামনে পড়লো শুকনো একটা ছোট্ট দ্বীপ। সবার আগে দ্বীপে পা রাখলো মাতাউ, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠলো ঘাসবনে, প্রকাণ্ড কি যেনো একটা তীর বেগে ছুটলো। ভয়ে চিৎকার করলো ক্রুডিয়া, তার বিশ্বাস রেনামোদের অ্যামবুশের মধ্যে পড়েছে তারা। ঝট করে কোমর থেকে চুরিটা বের করলো মাতাউ, রণহংকার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘাসের ওপর। ঘাসের ভেতর ধস্তাধস্তি শুরু হলো, বোঝা গেলো নিজের চেয়ে দ্বিগুণ আকৃতির কোনো প্রাণির সাথে লড়াই করছে মাতাউ। ইতিমধ্যে তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে গেছে শন। দু’জন ধরাধরি করে তুললো ওটাকে, আতঙ্কে ধরধর করে কেঁপে উঠলো ক্রুডিয়া। শন ও মাতাউর হাতে মোচড় খাচ্ছে ওটা একটা বিশাল গিরগিটি, প্রায় সাত ফুট লম্বা।

খিকখিক করে হাসছে মাতাউ, কালবিলম্ব না করে গিটবহুল ছাল ছাড়াতে বসে গেলো সে। লেজের এক ফালি মাংস কেটে ক্রুডিয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরলো শন। ঘৃণায় মুখ কুঁচকে এক পা পিছিয়ে এলো ক্রুডিয়া। ‘তোমরা কি! ও গোবর সব খেতে হবে?’

‘কে বলছে কথটা? যে নিয়মিত মোপানি গুয়োপোকা খায়?’

‘শন, আমি পারবো না, গ্লীজ! কাঁচা মাংস...ওয়াক...’, বমি পেলো ক্রুডিয়ার।

‘আগুন জ্বালার মতো কাঁঠ নেই’, বললো শন। ‘তাছাড়া, ভূমি স্বীকার করেছে, জাপানী “সামি” একবার হলেও খেয়েছে।’

‘সেটা কাঁচা মাছ, কাঁচা গিরগিটি নয়!’

‘একই কথা। কাঁচা তো, মাংস হোক বা মাছ।’ ক্রুডিয়ার হাত ধরে ঘাসবনে বসালো শন, নরম সুরে বারবার সাধলো। অগত্যা, শনের অনুরোধ রক্ষার জন্যে, মাংসের ফালিতে ছোট্ট একটা কামড় দিলো সে। সাথে সাথে খিদেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। খেতে মজাই লাগলো জিনিসটা।

পানির কোনো অভাব নেই। মিষ্টি, সাদা মাংসে পেট ভরে গেলো সবার। যে যার কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো ওরা। ঘাসবনের নিচে রোদ নামতে পারছে না, মাটির কাছাকাছি বাতাস ঠাণ্ডা। ঘুমিয়ে পড়লো ক্লডিয়া।

দুপুরে ঘুম ভাঙার পর ক্লডিয়া দেখলো, ওর পাশেই শুয়ে রয়েছে শন। চোখ মেলে হিন্দের আওয়াজ শুনলো ওরা। ‘আমাদের সামনে নদীর কিনারা, চায়না ওখানে আমাদের খুঁজছে’, বিড়বিড় করে বললো শন। হিন্দের আওয়াজ একবার দূরে সরে গেলো, তারপর আবার কাছে সরে এলো, একটা প্যাটার্ন ধরে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। তারপর এক সময় আর শোনা গেলো না আওয়াজটা।

‘চলে গেছে’, ক্লডিয়াকে আলিঙ্গন করলো শন। ‘এবার ঘুমোও।’

দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙলো ক্লডিয়ার প্রচণ্ড আতঙ্কের সাথে। কে যেনো তার মুখে হাতচাপা দিয়েছে। চোখ দুটো ঘোরাতে দেখলো, ওর কাছেই রয়েছে শনের মুখ। ‘চুপ!’ তার কানে নিঃশ্বাস ছাড়লো শন। ‘কোনো শব্দ নয়!’

মাথা ঝাঁকালো ক্লডিয়া, তার মুখ থেকে হাত সরালো শন। ঘাসবনের ফাঁক দিয়ে দূরে তাকালো ও, দেখাদেখি ক্লডিয়ার।

প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না সে। তারপর শুনতে পেলো কে যেনো গান গাইছে। ভারি মিষ্টি গলা, যেনো কোনো কিশোরী মেয়ের। শাস্তানি ভাষায় গাইছে, যেনো কোনো প্রেমের গান। তারই সাথে লেগুনের পানিতে ছপ ছপ আওয়াজ হলো, কে যেনো এদিকেই এগিয়ে আসছে। শনের গায়ের সাথে সঁটে এলো ক্লডিয়া, দম বন্ধ করে ভাকিয়ে থামলো ঘাসের ফাঁক দিয়ে।

তারপর হঠাৎ করেই ফাঁকটায় দেখা গেলো মেয়েটাকে। রোগা, একহারা, ভালগাছের মতো লম্বা, এবং আশ্চর্য সুন্দরী। কিশোরী সে, এখনো যৌবন পূর্ণতা পায়নি। ডালিমের মতো একজোড়া স্তন। চোখ দুটো টানা টানা, চঞ্চল, মায়াজ্ঞা। শেষ বিকেলের রোদে তার তামাটে রঙ চকচক করছে। পরনে নেংটি ছাড়া কিছুই নেই। দেখামাত্র মেয়েটাকে ভালোবেসে ফেললো ক্লডিয়া।

মেয়েটার ডান হাতে একটা কোচ রয়েছে। লেগুনের পানিতে ধীরে ধীরে পা ফেলছে সে।

হঠাৎ স্থির হলো মেয়েটা, থেমে গেলো গান, পরমুহূর্তে নাচের ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেলো শরীরটা। কোচ ছুঁড়লো সে, ছলাৎ করে উঠলো লেগুনের পানি, কোচের মাথাটা তার হাতের মুঠোয় কাঁপতে লাগলো। উল্লাসে হেসে উঠলো কিশোরী, কোচের ডগাটা পানি থেকে তুললো। ডগায় একটা মাগুর মাছ গাঁথা রয়েছে, খাবি খাচ্ছে ঘন ঘন, লেজটা ঝাঁপটাচ্ছে অনবরত।

কোচ থেকে মাছ ছাড়িয়ে কোমরে বাঁধা বুড়িতে ফেললো কিশোরী। আবার কোচটা তুলে নিয়ে বাগিষে ধরলো, পানিতে পা ফেলে এগিয়ে এলো ওদের দিকে।

এতো কাছে, মুখ ফেরালেই ওদেরকে দেখতে পাবে সে, কিংবা দ্বীপে পা দিলেই হেঁচট খাবে ওদের গায়ে। আরো এক পা এগোলো সে। তারপরই

ঘাসবনের ফাঁক দিয়ে সরাসরি কুড়িয়ার চোখে তাকালো। মাত্র এক সেকেণ্ড তারপরই ত্রুস্তা হরিনীর মতো ছুটলো মেয়েটা। ছেড়ে দেয়া স্প্রিংয়ের মতো লাফ দিলো শন, ওপাশ থেকে মাতাউ আর আলফনসোও।

চারদিকে পানি ছিটিয়ে ছুটছে মেয়েটা, তাকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেললো ওরা। পালাবার পথ না পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। ভয় পেলেও হাতের কোচটা বাগিয়ে ধরে আছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত, হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। তার দিকে এক পা এগোলো মাতাউ, ঝট করে সেদিকে ফিরলো কিশোরী। এই সুযোগে লাফ দিয়ে সামনে বাড়লো শন, কোচটা কেড়ে নিলো হাত থেকে, দু'হাতে ধরে তুলে নিলো হালকা শরীরটা, কাঁধে ফেলে ঘুরে দাঁড়ালো।

হাত-পা ছুঁড়ছে মেয়েটা, দ্বীপে তুলে এনে কুড়িয়ার পাশে তাকে নামিয়ে দিলো শন। নরম সুরে কথা বললো ও, কিন্তু মেয়েটা কোনো জবাব দিলো না এরপর আলফনসো তার সাথে শাস্তানি ভাষায় কথাবললো চেহারা থেকে ভয়ের ভাব খানিকটা দূর হলো, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো সে। কয়েকটা প্রশ্ন করলো আলফনসো। বিড়বিড় করে জবাব দিলো কিশোরী।

‘কি বলছে ও?’ জানতে চাইলো কুড়িয়া।

‘ঘাসবনে লুকিয়ে আছে সে, গেরিলাদের ভয়ে,’ বললো শন। ‘রেনামোরা তার মাকে মেরে ফেলেছে। ফেলিমোরা ধরে নিয়ে গেছে বাবাকে, গাছ কাটার জন্যে। কোনো রকমে পালিয়ে এসেছে সে।’

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে জেরা করা হলো তাক্ক। নদী এখান থেকে কতো দূরে? পারপারের কি ব্যবস্থা? সেখানে গেরিলাদের সংখ্যা কতো? ফেলিমোরা কোথায় গাছ কাটছে?

কুড়িয়া যে তার জন্যে উদ্বিগ্ন, সহানুভূতিশীল, বুঝতে পারলো মেয়েটা। তার গায়ের কাছে সরে এলো সে। তারপর সবাইকে প্রায় চমকে দিয়ে ইংরেজিতে বললো, ‘মিস, আপনার কথা আমি বুঝবো।’

‘তুমি ইংরেজি শিখলে কোথেকে?’ কিশোরীর একটা হাত ধরলো কুড়িয়া।

‘মিশনে। গেরিলারা তখনো আসেনি, নানরা খুন হয়নি।’

‘তোমার নাম কি?’

‘মিরিয়াম, মিস।’

‘তুমি খুব ভালো মেয়ে...’

‘বেশ লাই দিয়ো না’, সাবধান করলো শন।

‘চুপ করো তো!’ বললো কুড়িয়া। ‘ওর মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারো?’

‘মেয়েটাকে এখানে ছেড়ে যাবো আমরা।’ শন বললো। কিন্তু ওর গলার স্বরে কিছু একটা টের পেয়ে গেলো কুড়িয়া। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ওর পাশে বসে রয়েছে মিরিয়াম। কিন্তু তার পিছনে মাতাউ-এর উদ্দেশ্যে ভালো নয়। ডান হাতে একটা ছুরি তার।

রাগে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো ক্লডিয়ার।

‘শন!’ গলা কেঁপে গেলো ওর। ‘কি করবে মেয়েটাকে নিয়ে?’

‘ওটা নিয়ে ভেবো না,’ কর্কশ কণ্ঠে প্রতুত্তর করে শন।

‘মাতাউ!’ এবারে ফিরে দাঁড়ালো ক্লডিয়া। ‘তুমি মেরে ফেলতে চাও...’

সোয়াহিলি ভাষায় সায় দিলো মাতাউ, ‘কুফা!’

‘শন মেয়েটাকে মেরে ফেলবে তুমি?’

‘দ্যাখো ক্লডিয়া! ওকে ছেড়ে দেওয়া মানে আত্মহত্যা করা। রেনামোদের কাছে সমস্ত খুলে বলবে সে।’

‘তাই বলে মার্ডার? তুমি কি মানুষ? তুমি রেনামো বা জেনারেল চায়নার চেয়েও খারাপ!’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার কাছে ভালো কোনো উপায় আছে? বলো, সেটাই রাখবো!’

‘চায়নার রেডিও শিডিউল মিস করেছি আমরা। এবার রওনা হতে হয়, মেয়েটাকে ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব।’ আলফনসোর দিকে তাকালো ও।

ক্লডিয়া বললো, ‘ছেড়ে যাওয়া যদি সম্ভব না হয়, আমাদের সাথে যাবে ও।’

‘ঠিক আছে,’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো ও। দেখলো, এরই মধ্যে নিজের অতিরিক্ত শার্টটা বের করে মিরিয়ামকে পরিয়ে দিয়েছে ক্লডিয়া।

‘থ্যান্ক ইউ, ডোন না!’ হেসে উঠলো মিরিয়াম।

‘ঠিক আছে, ফ্যাশন শো শেষ করো। চলো এবার।’

মিরিয়ামের হাত ধরলো আলফনসো।

তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, এতোকক্ষে বুঝতে পারলো মেয়েটা। রাগে, ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিলো সে।

‘সর্বনাশ!’ বিস্ফোরিত হলো শন।

‘কি হলো আবার?’ জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া।

‘মিরিয়াম একা নয়!’

‘কিন্তু ও-ই না বললো ওর মা-বাবাকে মেরে ফেলেছে গেরিলারা!’

‘ওর ছোটো ভাই আর বোন নখখাণ্ডার বনে লুকিয়ে আছে। এতো ছোটো যে নিজেদের খাবার যোগাড় করতে পারবে না। এবার কি করা হবে?’ অসহায় দেখালো শনকে।

‘কি আবার করা হবে!’ বাচ্চাগুলোকে খুঁজে বের করি চলো। ওদেরকেও সাথে করে নিয়ে যাবো আমরা।’

‘তুমি কি পাগল হলে? নাকি এতিমখানা খুলে বসেছো?’

শনের কথায় কান দিলো না ক্লডিয়া, মিরিয়ামের হাত ধরে টানলো। ‘চলো, নিয়ে আসি ওদের। তোমার সবাইকে আমরা দেখবো।’

ঘাসবনের ভেতর দিয়ে এগোলো ওরা, ওদের পিছু নিলো বাকি সবাই।

পাশের একটা ছোট্ট দ্বীপে, নলখাগড়ার বনে লুকিয়ে রয়েছে বাচ্চা দুটো। ছেলেটার বয়স হবে পাঁচ, মেয়েটার চার। মেয়েটাকে কোলে তুলে নিলো ক্লডিয়া। এর দেখছি গা পুড়ে যাচ্ছে! সত্যি তাই, থরথর করে কাঁপছে বাচ্চাটা। ‘ম্যালেরিয়া! চিন্তার কিছু নেই, আমাদের কাছে ক্লোরোকুইন আছে,’ মেডিক প্যাকটার দিকে হাত বাড়ালো সে।

‘ক্লডিয়া, এ তোমার স্রেফ পাগলামি!’ প্রতিবাদ করলো শন। উদ্বিগ্ন দেখালো ওকে। ‘ওরা সাথে থাকলে এগোতেই পারবো না আমরা। গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে দু’স্বপ্নের মতো লাগছে।’

‘তুমি থামবে? ধমক দিলো ক্লডিয়া। ‘ক্লোরোকুইন কতোটা দেবো বলো তো? এখানে লেখা রয়েছে, বাচ্চার বয়স ছ’বছরের কম হলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে হবে। দুটো ট্যাবলেট খাইয়ে দিই, কি বলো?’

হাল ছেড়ে দিয়ে কাধ ঝাঁকালো শন।

‘এদের নাম কি? মিরিয়ামকে জিজ্ঞেস করলো ক্লডিয়া। নাম শুনে বললো, ‘উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যাবে। দরকার নেই, আমি ওদের নাম রাখছি মিকি ও মিনি।’

ওয়াল্ট ডিজনি মামলা ঠুকবে,’ ব্যঙ্গ করলো শন।

গ্রাহ্য করলো না ক্লডিয়া, নিজের চাদর দিয়ে মিনিকে জড়ালো সে, শনকে বললো, ‘মিনিকে তুমি বইবে।’

‘কিন্তু যদি পেশাব করে দেয়, আমি ওর ঘাড় মটকাবো!’ প্রতিবাদ করলো শন।

‘আর আলফনসো নেবে মিকিকে।’

ক্লডিয়ার মাতৃস্নেহ উথলে উঠেছে, বুঝতে পারলো শন। চাদরে জড়িয়ে মিনিকে পিঠে তুলে নিলো ও, ওর পিঠে বোঝার মতো ঝুলে থাকলো বাচ্চাটা, চাদরের দুই প্রান্ত এক করে দলার কাছে বেঁধে নিলো ও। এভাবে পিঠে ঝোলার অভ্যেস আছে, আরাম পেয়ে শান্ত হলো মিনি। পিঠের চামড়ায় আঁচ অনুভব করলো শন, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা।

‘এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না এ-সব আমার কপালে ঘটছে। কখনো ভাবিনি বিনা বেতনে নার্সের কাজ করতে হবে আমাকে,’ গজগজ করতে করতে শুকনো দ্বীপে থেকে পানিতে নেমে পড়লো শন।

মাঝরাতের আগেই মিরিয়াম প্রমাণ করলো, সে-ও ওদের উপকারে লাগবে। এলাকাটা ওর চেনা, সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথগুলো জানা আছে। মাতাউর সাথে সামনে থাকলো সে। লেগুন আর দ্বীপের গোলক ধাঁধার ভেতর দিয়ে ওদেরকে পথ দেখালো। মিরিয়ামের সাহায্য না পেলে পথ হারাতো ওরা, নদীর তীরে পৌঁছবার আগে অন্তত কয়েকটা ঘন্টা তো অপচয় হতোই।

মাঝরাতের খানিক পর রিয়ারসোসেভ নদীর তীরে পৌঁছুলো ওরা। সামনে হাত বাড়িয়ে নদীর অগভীর অংশটুকু দেখালো মিরিয়াম। জানালো, কোথাও কোথাও পানি বুক সমান হলেও, হেঁটেই পার হওয়া যাবে।

বিশ্রাম নিতে বসলো ওরা। মেয়েরা বাচ্চাগুলোর যত্ন নিলো। গিরগিটির মাংস খাওয়ানো হলো ওদের। ওষুধ ধরেছে, মিনির জ্বর এখন অনেক কম। খাওয়াদাওয়া সেরে নলখাগড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলো পুরুষরা। নদীর পানি কালো, তারার ছবি ফুটেছে গায়ে। ‘এটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা,’ ফিসফিস করলো শন। ‘কাল সারাদিন নদীর কিনারায় হিন্দ নিয়ে টহল দিয়েছে চায়না। ভোরে আলো ফোটান সাথে সাথে ফিরে আসবে সে। এখানে সময় নষ্ট করা বোকামি হবে। সূর্য ওঠার আগেই ওপারে যাওয়া দরকার।

আলফনসো স্নান কর্তে বললো, ‘ওপারে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে গেরিলারা।’

‘তা করছে,’ বললো শন। ‘তবে আমরা জানি, ওখানে ওরা আছে।’

‘আপনার প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করুন, কর্নেল।’

‘মেয়েরা থাকুক, ওপারে গিয়ে তীরটা দখল করি আমরা। গুলি করা যাবে না, আমরা শুধু তার এবং ছোরা ব্যবহার করবো।’

ব্যাগ খুলে নিজের তারটা বের করলো শন, হারকিউলিস বিমানের উইঞ্চ কেবল থেকে সংগ্রহ করা। তাদের দু’মাথায় দুটো কাঠের বোতাম লাগিয়ে দিয়েছিল জোব, ধরে যাতে সুবিধে হয়।

কাপড়চোপড় খুলে তিনজনই ওরা বিবস্ত্র হলো, ভিজে কাপড়ে থাকলে তীরে ওঠার সময় শব্দ হবে। প্রত্যেকের ছোরা কর্ড-এর সাথে গলায় ঝুলছে পানিতে নামার আগে ক্রুডিয়ার কাছে ফিরে এলো শন, চুমো খেলো তাকে।

‘তান্ডাভাড়ি ফিরে এসো’, ফিসফিস করলো ক্রুডিয়া।

‘নিজের দিকে খেয়াল রেখো’, পরামর্শ দিলো শন।

নলখাগড়ার বন থেকে নিঃশব্দে পানিতে নামলো ওরা। তারার আলোয় চকচক করছে শনের নগ্ন শরীর। পানির তলায় হাত দিয়ে মুঠো মুঠো কাদা তুলে মুখে মাখুলো ও। ‘রেডি?’

অগভীর পানি কেটে হাঁটছে ওরা, পানির ওপর শুধু মুখ ভেসে আছে। উত্তর তীর থেকে রওনা হয়ে দক্ষিণ তীরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। দক্ষিণ তীরে নলখাগড়া বা জলাভূমি নেই, পাড় শুকনো খটখটে, কিনারা থেকেই শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল। মাঝখানে রয়েছে শন, ওর দু’পাশে মাতাউ ও আলফনসো। গাছপালা ঢাকা তীর কাছে চলে এলো।

রেনামোদের দেখতে পাবার আগে তাদের গন্ধ পেলো শন। তামাক ও ঘামের গন্ধ। স্থির হলো ও, সমস্ত মনোযোগ এক করে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলো। ওর সামনের অন্ধকার থেকে একজন লোক মৃদু কেশে গলা পরিষ্কার করলো।

আওয়াজটা শুনে তার অবস্থান আন্দাজ করলো শন। ধীরে ধীরে নিচু হলো ও, সামনের দিকে ঝুঁকে মাটি স্পর্শ করলো, আঙুলের ডগা দিয়ে সামনে থেকে সরিয়ে দিলো শুকনো পাতা ও ডাল, তারপর এক পা এগোলো। এভাবে প্রচুর সময় নিয়ে খানিক দূর এগোবার পর আকাশের গায়ে রেনামোর গেরিলার মাথাটা দেখতে পেলো ও। একটা আরপিডি মেশিন-গানের পিছনে বসে রয়েছে লোকটা, তাকিয়ে আছে নদীর দিকে।

নড়লো না শন, অপেক্ষায় থাকলো। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেলো, তারপর দশ মিনিট। প্রতিটি মিনিট যেনো একটা করে যুগ। ধৈর্য ধরায় কাজ হলো লোকটার বাম দিক থেকে আরেকজন হাই তুললো সশব্দে, সাথে সাথে তৃতীয় একজন সাবধান করে দিলো তাকে চাপা গলায়।

তিনজনের অবস্থান মনে গোঁথে নিলো শন, নিঃশব্দে পিছিয়ে এলো বনভূমির কিনারায়। আগেই ফিরেছে আলফনসো, ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। এক মিনিট পর ফিরলো মাতাউ।

‘তিনজন’, ফিসফিস করলো আলফনসো।

‘হ্যাঁ, তিনজন’, সমর্থন করলো শন।

‘চারজন’, বললো মাতাউ। ‘পাড়ের নিচে আরো একজন আছে।’

মাতাউর চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়, তার রিপোর্ট মেনে নিলো শন। মাত্র চারজন রেনামো ওত পেতে আছে, মনে মনে স্বত্তিবোধ করলো ও। ওর আশঙ্কা ছিলো আরো বেশি লোক থাকবে। তারমানে নদীর দক্ষিণ তীর অনেক দূর পর্যন্ত কাভার দিচ্ছে জেনারেল চায়না, খানিক পর পর ছড়িয়ে আছে তারা।

‘কোনো শব্দ নয়’, সাবধান করলো শন। ‘একটা গুলি হতে যা দেরি, চারপাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসবে রেনামোরা। মাতাউ, পাড়ের নিচে তুমি যাকে দেখেছো। আলফনসো, যে-লোকটা কথা বললো। মাঝখানের বাকি দু’জন আমার।’ বাঁ কজিতে জড়ানো তারটা খুললো ও। ‘আমার এক নম্বর লোক দীর্ঘশ্বাস না ফেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তোমরা।’ কথা শেষ করে ওদের দু’জনের কাঁধ ধরে মৃদু চাপ দিলো। তিনজনই আবার পিছু হটে পানিতে নামলো।

মেশিনগানারকে সেই একই জায়গায় পেলো শন। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরপথের তার পিছনে চলে আসছে, হালকা মেঘে ঢাকা পড়ে গেলো তারাগুলো, অপেক্ষা করতে বাধ্য হলো ও। যতোই দেরি করবে ততোই শত্রুর চোখে ধরা পড়ার ঝুঁকি বাড়বে, শনের ঝোঁক চাপলো অন্ধকারে স্পর্শের সাহায্যে কাজটা সারে। কিন্তু নিজেকে দমন করলো ও। মেঘ সরে যাবার পর ধৈর্য ধরার জন্যে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠলো মন। মাথার ক্যাপ নামিয়ে মাথা চুলকাচ্ছে সেন্দ্রি, এই অবস্থা গলায় তার পরাতে চেষ্টা করলে বার্থ হতো ও। চিৎকার করতো সে, গুলি হতো, নদীর কয়েক মাইল কিনারা ধরে ছড়িয়ে থাকা রেনামোরা ছুটে আসতো শিকারী কুকুরের মতো।

মাথা চুলকানো শেষ করে হাত নামালো সেন্দ্ৰি, হাত বাড়িয়ে তার গলায় লুপটা পরিয়ে দিলো শন। কাঠের বোতাম মুঠোর ভেতর, টান দিলো সজোরে একই সময়ে লোকটার শিরদাঁড়ার ওপর একটা হাঁটু চেপে ধরলো। শত্রুর মাথা সামনের দিকে বুলে পড়লো। তারটা খুলে নিলো শন। খোলা উইণ্ডপাইপ দিয়ে ফোঁস করে বেরিয়ে এলো ফুসফুসে আটকে থাকা বাতাস, দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনালো। এই শব্দের জন্যেই মাতাউ ও আলফনসোকে অপেক্ষা করতে বলেছে শন। ও জানে, এই মুহূর্তে ওরাও তাদের প্রতিপক্ষকে খতম করছে।

দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা শনের দ্বিতীয় শিকার, রেনামো সেন্দ্ৰিকে সতর্ক করে তুললো। একমাত্র সে-ই এখনো বেঁচে আছে। ‘কি ব্যাপার, হারারি? কি করছো তুমি?’

আওয়াজটা পথ দেখালো শনকে, খাপ থেকে হাতে বেরিয়ে এসেছে ছোরা। পিছন থেকে তাকে গাঁথলো ও, বাম হাত দিয়ে, ডান হাতটা চেপে ধরলো মুখে।

ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে শেষ হলো শনের কাজ। লাশটা ছেড়ে দিয়ে সোজা হলো ও, এরই মধ্যে ওর পাশে চলে এসেছে মাতাউ। নিজের কাজ শেষ করে শনকে সাহায্য করতে এসেছে সে।

পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করলো ওরা, কান পেতে থাকলো কোনো শব্দ হয় কিনা শোনার জন্যে। এমন কি মাতাউরও ভুল হতে পারে, আশপাশে আরো সেন্দ্ৰি থাকা অসম্ভব নয়। তবে নদীর কিনারা থেকে ব্যাণ্ডের ডাক ছাড়া আর কোনো আওয়াজ হলো না। ‘ওদেরকে সার্চ করো’, নির্দেশ দিলো শন। ‘কিছু জিনিস কাজে লাগবে আমাদের।’

সব জিনিস এক জায়গায় জড়ো করা হলো। বাছাই করা হলো একটা রাইফেল, সমস্ত অ্যামুনিশন, ছ’টা গ্রেনেড, কিছু কাপড় ও সমস্ত খাবার বাতিল জিনিসগুলো কাদার নিচে চাপা দেয়া হলো, লাশগুলো ভাসিয়ে দেয়া হলো শ্রোতের সাথে, ভারি মেশিনগানটা ফেলা হলো পানিতে।

হাতঘড়ি দেখলো শন। ‘সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে আমাদের। ওদেরকে এবার এপারে আনতে হয়। সূর্য ওঠার আগে নদী থেকে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে। আলো ফোটার সাথে সাথে ফিরে আসবে চায়না।’

\* \* \*







‘ফুয়েল নিয়ে পোর্টাররা আমাদের ফরওয়ার্ড বেসে পৌঁছুবে কাল সকালে। রাতে এঞ্জিনিয়াররা ওটার ওপর কাজ করতে পারবে। কিন্তু আজ সারাটা দিন, সন্ধ্যা পর্যন্ত, ওটাকে প্রস্তুত অবস্থায় চাই আমি। কালপ্রিটরা ধরা পড়লে যেতে হবে আমাকে।’

কাঁধ ঝাঁকালো পাইলট। আপনি যদি এঞ্জিনটার ওপর ভরসা রাখেন, আকাশে উঠতে আমার কোনো আপত্তি নেই।’

‘রেডিও শুনুন’, নির্দেশ দিলো জেনারেল চায়না। ‘ভাগ্য ভালো হলে আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে সব মিটে যাবে।’

\* \* \*





















‘ফেলিমো!’ শনের কনুই ধরে টান দিলো মাতাউ, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে।  
‘ফেলিমো!’

এতোক্ষণে বুঝলো শন। রেনামোদের সাথে ওদের গুলি বিনিময় হয়েছে, সেই শব্দই টেনে এনেছে ফেলিমোদের বিশাল একটা বাহিনীকে। আশপাশেই ছিলো তারা, সম্ভবত সেভ রিভার লাইন আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

পঞ্চাশজন রেনামোকে এখন কয়েক হাজার ফেমিলোর সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

বনভূমির কিনারা ধরে পালাচ্ছে রেনামোরা। তাদের লক্ষ্য করে শনও এক পশলা গুলি করলো। বোধহয় ফেলতেও পারলো একজনকে।

তারপর ওর নজর পড়লো ফেলিমো পদাতিক বাহিনীর ছোট্ট একটা দলের ওপর। ওর বাম দিক থেকে ছুটে আসছে তারা। ক্যামোফ্লেজড ফিল্ড ড্রেস পূর্ব জার্মানী থেকে পেয়েছে তারা, সবুজ ও খয়েরি রঙের।

রেনামো বা ফেলিমো, দু’দলই ওদের জন্যে বিপজ্জনক। নিজের পাশে ক্লডিয়াকে টেনে নিলো শন। ‘নড়ো না। আমরা এখানে আছি ফেলিমোরা সম্ভবত জানে না। রেনামোদের তাড়া করছে, আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। সুযোগ একটা পেতেও পারি আমরা।’

তারস্বরে চিৎকার করছে মিনি, গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়েছে। মিরিয়ামকে ধমক দিলো শন, ‘চুপ করাও ওকে! থামাও!’ ব্যস্ত হাতে মিনির মুখ চেপে ধরলো মিরিয়াম।

গর্তের চৌকি থেকে একটা চোখ তুলে তাকালো শন। ফেলিমো পদাতিক বাহিনীর দলটা ওদের কাছে চলে এসেছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গর্তটাকে পাশ কাটাতে তারা। ছুটতে ছুটতে এখনো কোমরের কাছ থেকে গুলি করছে লোকগুলো যে-কোনো মুহূর্তে দেখে ফেলবে ওদের। হাতের একেএমটা তুললো শন। উদ্ধার পাবার আসলে কোনো আশা নেই, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে রেনামোদের বদলে মরতে হবে ফেলিমোদের হাতে।

ফেলিমো ট্রুপারদের দিকে লক্ষ্যস্থির করছে শন, গোটা দলটা ভোজবাজির মতো মাটি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। লক্ষ্যস্থির করায় মগ্ন ছিলো শন, বিস্ফোরণের শব্দটা ভালো করে শুনতেই পায়নি। লোকগুলো প্রথমে ঢাকা পড়লো ঘন ধোঁয়া ও ধুলোয়। আকাশ থেকে আবার গর্জে উঠলো ভারি ১২.৭ এমএম কামান। আরো বাম দিকে দেখা গেলো ফেলিমোদের আরো একটা দল বনভূমির কিনারা থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসছে। দ্বিতীয় শেলটা বিস্ফোরিত হলো তাদের মাঝখানে।

আকাশে, মাথায় ওপর তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলো শন। হিন্দ গানশিপ ওদের একশো ফুট ওপরে স্থির হয়ে রয়েছে। নেহাতই ভাগ্যগুণে ঠিক সেই মুহূর্তে বাতাসের সাথে ভেসে এলো বিস্ফোরণের ধোঁয়া, ঢাকা পড়ে গেলো ওরা। একটু পরই ফেলিমোদের খোঁজে মাথার ওপর থেকে সরে গেলো হিন্দ।

এরপর দিশেহারা হয়ে পড়লো যুদ্ধরত দুই পক্ষ। বনভূমির ভেতর কে কোনো দিকে ছুটেছে নিজেরাও জানে না। ঘন ঘন বিস্ফোরিত হলো রকেট, ছুটে গেলো শেল, আকাশ থেকে আগুনের গোলা ছুঁড়লো হিন্দ গানশিপ। উদভ্রান্ত সৈনিকরা অনবরত গুলি ছুঁড়লো।

মাতাউর কাঁধে চাপড় দিলো শন। ‘আলফনসোকে ডেকে আনো।’ চোখের পলকে ধোঁয়া ও গোলাগুলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো খর্বকায় নদোরবো, ফিরে এলো এক মিনিট পরই, পিছনে প্রকাণ্ডদেহী আলফনসোকে নিয়ে।

‘আরেকবার ছোট্টার জন্যে তৈরি হও’, নির্দেশ দিলো শন। ‘ওখানে রেনামো আর ফেলিমোরো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, এসো চেষ্টা করে দেখি হিন্দ দেখে ফেলার আগে আমরা সরে যেতে পারি কিনা...’, হঠাৎ থামলো শন, নাক কুঁচকে বাতাস টানলো, তারপর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে পিছনে তাকালো।

এরইমধ্যে ওদের চারপাশের বাতাস নোংরা কালো হতে শুরু করেছে। এঞ্জিনের আগুয়াজ, গোলাগুলির শব্দকে ছাপিয়ে উঠলো আরেকটা শব্দ, অস্পষ্ট হলেও শুনতে পেলো শন-কি যেনো ফুটছে। কাঠ পুড়লে এ-ধরনের শব্দ হয়। ডালপালায় আগুন লাগলে।

‘আগুন!’ আঁতকে উঠলো শন। ‘আমাদের পিছনে, যদিও থেকে বাতাস আসছে!’

সম্ভবত বিস্ফোরিত কোনো রকেট জড়ো করা শুকনো ডালপালায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঘন মেঘের মতো কালো ধোঁয়া ঢেকে দিচ্ছে বনভূমির মাথার ওপর গোটা আকাশ। ওদের নিরাপদ আশ্রয়ে গর্তটাও এক নিমেষে ঢাকা পড়ে গেলো। হু হু করে জ্বলে উঠলো চোখ, কাশতে শুরু করলো সবাই।

‘এখন আর কোনো উপায় নেই — হয় ছোটো নয়তো পুড়ে মরো!’ আগুনের শব্দ এতো দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে দেখে দিশেহারা বোধ করলো শন। শুকনো কাঠ পোড়ার আগুয়াজে চাপা পড়ে গেলো যুদ্ধের সমস্ত শব্দ। ধীরে ধীরে বাড়লো শিখার শৌ শৌ গর্জন। গায়ে আগুন নিয়ে কাছেই কোথাও চিৎকার করছে সৈনিকরা, অথচ ওদের কানে অস্পষ্টভাবে পৌঁছলো সে-চিৎকার।

‘চলো যাই!’ হেঁা দিয়ে মিনিকে পিঠে তুলে নিলো শন। চাদর দিয়ে তাকে বাঁধার সময় নেই, বাচ্চাটাও যেনো তা বুঝতে পারলো, দু’হাত দিয়ে শনের গলাটা জড়িয়ে ধরলো সে। ক্লডিয়াকে টেনে দাঁড় করালো শন। আলফনসো ইতিমধ্যে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে মিকিকে, মিকির পা দুটো ঝুলছে ভারি রেডিও প্যাকের ওপর। আলফনসোর আরেক দিকে রয়েছে মিরিয়াম, সেদিকের কাঁধে রাইফেলটা ঝুলিয়ে নিয়েছে আলফনসো।

বিশাল ঢেউ-এর মতো ওদের দিকে ছুটে আসছে ধোঁয়া, তেলের মতো ঘন। বাতাসের সাথে ছুটেছে ওরা, একসাথে জড়ো হয়ে। ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ফুসফুস, তেকে দিচ্ছে আকাশ, জঙ্গলের ভেতর ওদের চারপাশে যুদ্ধরত সৈনিকদের দৃষ্টি

থেকে আড়াল করে রাখছে ওদেরকে। হিন্দের গানারও ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ধৈর্যে আসছে আগুন। বাতাসের গতি ওদের চেয়ে অনেক বেশি, আগুন আর বাতাসের গতি প্রায় সমান। ছুটছে ওরা, কিন্তু পিছিয়ে পড়ছে, হেরে যাচ্ছে প্রতিযোগিতায়। প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসছে সর্বশেষ শিখা।

আগুনের প্রচণ্ড আঁচ ওদেরকে উন্মাদ করে তুললো। দৌড়ালো ওরা, জীবনে এতো জোরে কখনো দৌড়ায়নি। নগ্ন ঘাড়ের আগুনের ঝাপটা অনুভব করলো শন, ছুটন্ত ফুলকি মুখে লাগায় কঁকিয়ে উঠলো মিনি। বাতাসের অভাবে হাঁপালো ক্লডিয়া, হোঁচট খেয়ে মাটিতে হাঁটু গাড়লো। টান দিয়ে তাকে তুলে নিলো শন, টেনে নিয়ে চললো সামনের দিকে।

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়বে ওরা, বুঝতে পারলো শন। পুড়ে মরার আগেই জ্ঞান হারাবে। বাতাসে টানলেই নাকের ডগা থেকে ফুসফুস পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে। আর বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। প্রচণ্ড উত্তাপ সেন্স করছে ওদেরকে, গায়ের রোম পুড়ে যাচ্ছে, উড়ন্ত আগুনের ফুলকি লেগে ফোঁসকা পড়ছে চামড়ায়। ওদের চারপাশে শুধু কালো ধোঁয়া আর লাল আগুনের ফুলকি। শনের পিঠে যন্ত্রণায় ছটফট করছে মিকি, ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছির মতো আগুনের কণা ঘিরে ফেলছে তাকেও। শনের গলাটা ছেড়ে দিলো সে, পড়ে যাচ্ছে পিঠ থেকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে তাকে ধরে ফেললো শন, ভাঁজ করা হাতের কোণে আটকে নিয়ে ছুটলো।

হঠাৎ করে আরো একটা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো ওরা। ওদের চারপাশে শুধু মরা গাছের গুঁড়ি। পায়ের নিচে নরম বেলে মাটি এলোমেলো হয়ে আছে।

‘শোও!’ ধাক্কা দিয়ে কডিয়াকে মাটিকাকে মাটিতে ফেলে দিলো শন, তার হাতে, ধরিয়ে মিনিকে। বাচ্চাটা ধস্তাধস্তি করছে। ‘শক্ত করে ধরো ওকে!’ চিৎকার করলো শন, গায়ের শার্টটা খুলে ফেলেছে ইতিমধ্যে। ‘মাটিতে, মুখ ঠেকিয়ে তুলে থাকো!’ নির্দেশ দিলো ও। বাধ্য মেয়ের মতো শরীরটা গড়িয়ে উপুড় হলো ক্লডিয়া, শরীরের নিচে আড়াল করে রেখেছে মিনিকে। তাদের দু’জনের মাথাই শার্টটা দিয়ে জড়ালো শন, ধোঁয়া ও আগুনের ফুলকি থেকে বাঁচানোর জন্যে। বোতল থেকে পানি ঢেলে শার্টটা ভিজিয়ে দিলো ও।

এখনো ধস্তাধস্তি করছে মিনি, তবে ক্লডিয়া তাকে শরীরের নিচে সশক্ত করে চেপে রেখেছে। ওদের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো শন, আলগা বালি তুলে ঢেকে দিলো ওদেরকে। মাটি ও বালির নিচে চাপা পড়ে গেলো ওরা, বাইরে থাকলো শুধু কাপড় জড়ানো শাখার পিছনটা। মাটির কাছাকাছি ধোঁয়া খানিকটা হালকা, শ্বাস নিতে পারছে ওরা। ওদিকে বসে নেই আলফনসোও, শনের দেখাদেখি সে-ও মিরিয়াম ও মিকিকে বালি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে।

শন অনুভব করলো, চিড়বিড় শব্দ করে কুঁকড়ে যাচ্ছে ওর দাড়ি। আগুনের ফুলকি পুড়িয়ে দিচ্ছে চামড়া, যেনো কাঠপিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। পানির শেষ বোতলটা নিজের গায়ে খালি করলো ও। খালি করলো ক্যানভাস ব্যাগটা, মাথায় পড়লো

সেটা। মাটিতে পিঠ দিয়ে তুলো, পাশ থেকে বালি তুলে ছড়িয়ে দিলো গায়ের ওপর।

মাথাটা মাটির কাছাকাছি থাকায় শ্বাস নিতে পারা গেলো, সচেতন থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনটুকু পাচ্ছে শন। তবে আগুনের আঁচে বাঁ বাঁ করছে মাথা, আচ্ছন্নবোধ করছে ও। মাথার ওপর ক্যানভাসটা কুঁকড়ে ছোটো হয়ে যাচ্ছে, পোড়া গন্ধ ঢুকলো নাকে। বালির পুরু স্তর ঢেকে রেখেছে শরীর, সেই বালি গরম হয়ে পোড়াতে শুরু করলো। আগুনের গর্জন এমনই বেড়ে উঠলো, মিকির চিৎকারও শনের কানে ঢুকলো না। শুকনো ডালগুলো রাইফেলের মতো শব্দ করে ফাটছে। ওদের চারপাশে শুকনো ডালপালার পাহাড়, সবগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাতাসের সাথে ছুটে চলেছে আগুন।

ওদেরকে পিছনে ফেলে সামনে চলে গেলো আগুন। ধীরে ধীরে গর্জন থামলো। তারপর এক মুহূর্তের জন্যে ধোঁয়ার মেঘ সবে গেলো, ফুসফুসে সামান্য একটু মিষ্টি বাতাস পেলো ওরা। কিন্তু ওদের চারপাশে উত্তাপ এতো প্রবল যে গা থেকে বালি সরাবার সাহস হলো না শনের।

ধীরে ধীরে উত্তাপ কমলো, ঠাণ্ডা হলো চারদিক, ঘন ঘন মিষ্টি বাতাস পেলো ওরা। বসলো শন মাথা থেকে ব্যাগটা নামালো। জ্বালা করছে চামড়া, যেনো অ্যাসিড ছিটানো হয়েছে গায়ে। ছোটো ছোটো ফোঁসায় ভরে গেছে গা। এরপর কড়িয়া ও মিনির গা থেকে বালি সরালো ও।

পোড়া, কালচে মাটির ওপর দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে এগোলো দলটা। এখনো বেঁচে আছে, কেউই বিশ্বাস করতে পারছে না। মাঝে মাঝেই কালো ধোঁয়া ঢেকে ফেলছে ওদেরকে। বুটের নিচে গরম হয়ে রয়েছে মাটি। বাচ্চাগুলোকে কাঁধে-পিঠে নিয়ে এগোচ্ছে ওরা। কাউকে কিছু বলতে হলো না, সবাই জানে ধোঁয়া সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবার আগে যতোটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে ওদের।

দু'বার হিন্দের আগুয়াজ পেলো ওরা। গোটা আকাশ এখনো ঢাকা পড়ে আছে কালো ধোঁয়ায়। ধোঁয়া সরে গেলে মুহূর্তের জন্যে নীল আকাশ চোখে পড়লেও, হিন্দটাকে ওরা দেখতে পেলো না। পিছু নিয়ে কেউ আসছে না — না রেনামো, না ফেলিমো! দুটো দলই আগুনের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে।

‘মাথামোটা গর্দভটার পায়ে অ্যাসবেসটস আছে,’ বিড়বিড় করলো শন, হালকা ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে নাচতে নাচতে ছুটছে মাতাউ, খালি পয়ে। কান্না থেমেছে মিনির এখন শুধু ফোঁপাচ্ছে সে। প্রথমবার বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থেমেই তাকে আধখানা অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খাওয়ালো শন। ‘আর পানি নেই, সব বোতল খালি।

খানিক পর সন্ধ্যা নামলো। অন্ধকারে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকলো ওরা। এতোই ক্লান্ত সবাই, পাহারা দেয়ার কথা মনেই থাকলো না কারো।



‘এখানেই আছে, জেনারেল,’ এঞ্জিনিয়ার বললো। ‘আজ রাতেই ওটা আমি বদলাবো।’

‘কাল ভোরে আকাশে উঠতে হবে আমাকে।’

‘ততোক্ষণে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। কথা দিচ্ছি, জেনারেল।’

‘ভেরি গুড। কয়েক মিনিটের মধ্যে ল্যাণ্ড করবো আমি। সাথে সাথে কাজ শুরু প্রস্তুতি নিন।’ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলো চায়না।

শনের নির্দেশে আরো কিছুক্ষণ রেডিও খোলা রাখলো আলফনসো। দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক বাহিনীর বার্তা বিনিময় শুনলো কিছুক্ষণ। আগের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো লাগলো কানে। কয়েক মিনিট পর রেডিও বন্ধ করলো শন, আলফনসোকে বললো, ‘পাহারা দিতে হবে, প্রথমে তোমার পালা। যাও!’

\* \* \*

আকাশে হিন্দ না থাকায় দিনেও হাঁটলো ওরা। দক্ষিণ দিকে যতোই এগোলো, ক্রীতদাস কার্টুরেদের ফেলে যাওয়া চিহ্ন ততোই বেশি করে দেখতে পেলো ওরা। আশুন লাগার তিনদিন পর, মাতাউ, ওদেরকে ঘুরপথ ধরে নিয়ে এলা। জঙ্গলের কিনারা থেকে আবার ওরা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলো, মাইলের পর মাইল কোনো গাছ নেই, আছে শুধু গাছের কটা গুঁড়ি। সেদিন বিকেলে লেবার ক্যাম্পকে পাশ কাটিয়ে এলো ওরা। সন্ধ্যায় খেতে বসে রেডিও অন করলো আলফনসো। জেনারেল চায়নার গলা পাওয়া গেলো না, কি কাজে ব্যস্ত কে জানে। অনেকক্ষণ ধরে গভীর মনোযোগের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক বার্তা বিনিময় শুনলো শন। তারপর ওদের ফ্রিকোয়েন্সিতে, ইংরেজিতে, নিজের মেসেজ পাঠালো শন।

‘কুডু, ! কুডু! ডু ইউ রিড মি? দিস ইজ মোসি।’

দশ মিনিট ধরে একই মেসেজ বারবার পাঠালো শন। কুডু হলো দক্ষিণ আফ্রিকান সেনাবাহিনীর গোপন কোড, শুধুমাত্র জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য। সেই বুশওয়ারের সময় মোসি কলসাইন ব্যবহার করতো শন।

পনেরো মিনিট পর সাড়া পাওয়া গেলো। ‘কুডু স্টেশন কলিং মোসি’, গলার আওয়াজে রাজ্যের সন্দেহ। ‘আপনার কলসাইন জানান।’

‘মোসি, মোসি। আমি আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক ডেপুটি মিনিস্টার জেনারেল ডে লা রেই-এর কাছে একটা বার্তা দিতে চাই।’

সত্তরের দশকে লোথার ডে লা রেই ছিলো শনের কন্ট্রোল। কুডু কলসাইন শুনতে পেলো নিশ্চই উত্তর দেবেন তিনি।

প্রায় এক ঘন্টা পর কুডু স্টেশন আবার সাড়া দিলো। ‘মোসি, কুডু স্টেশন কলিং। ডে লা রেইকে পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের নাগালের বাইরে তিনি।’

‘কুডু, এটা জীবন-মরণ সমস্যা। আপনারা যেভাবে পারেন ডে লা রেইকে খুঁজে বের করুন। আমি ছ’ঘন্টা পরপর রেডিও শুনবো।’

\* \* \*

‘বুঝতে পারছি না কার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছো?’ ক্লডিয়া বললো।  
‘দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত রক্ষীদের সাথে।’  
‘ওরা সাহায্য করবে আমাদের?’ ক্লডিয়ার গলায় আশাবাদ।  
‘জানি না। আমার পরিচিত একজন আছে ওখানে। হয়তো উনি সাহায্য করলেও করতে পারেন।’  
‘কে তিনি?’  
‘বুশ ওয়ারের সময় যদিও রোডেশিয় বাহিনীতে ছিলাম। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গেও যোগাযোগ ছিলো।’ শন বলে।  
‘গুপ্তচর?’  
‘ঠিক তা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা আর রোডেশিয়া মিত্রদেশ। কাজেই, আমি না বিশ্বাসঘাতক, না গুপ্তচর— কারণ আমি একজন দক্ষিণ আফ্রিকান।’  
‘তবে তো ডাবল এজেন্ট!’ একটু মজা করে বলে ক্লডিয়া।  
‘যা ইচ্ছে বলতে পারো। কিন্তু বুশ ওয়ারের পরেও নিয়মিত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে ডে লা রেই কে সাহায্য করে এসেছি আমি।’  
‘তবে উনি তো তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।’  
‘আরো একটা কারণ আছে। উনি আমার দাদীর দিকের আত্মীয়।’ থেমে যায় শন, ‘দ্যাখো, কে এসেছে— মিনি মাউস স্বয়ং!’  
বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে ক্লডিয়া বলে। ‘কি মনে হয়— বেঁচে ফিরতে পারলে ওকে দস্তক নিতে দেবে আমাকে?’  
এতোকাল দায়িত্বের কথা শুনলে জ্বর চলে আসতো শনের। পালিয়ে বাঁচতো ও। কিন্তু আজ, কেনো যেনো ক্লডিয়ার এই প্রশ্নটা খারাপ লাগলো না ওর।

\* \* \*

পোর্টেবল হোণ্ডা জেনারেটর যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলছে। খুঁটির মাথায় জ্বলছে কয়েকটা বালব, হিন্দ গানশিপের পাশেই। হিন্দের এঞ্জিন হ্যাচগুলো খোলা, টারবো ইনটেক থেকে সরানো হয়েছে ডেব্রিস সাপ্রেসর।

মাঝরাত্ত্রেও জেনারেল চায়নার চোখে ঘুম নেই। কাল ভোর থেকে সারাটা দিন আকাশেই ছিলো সে, শুধু ফুয়েল নেয়ার দরকার হলে ল্যাণ্ড করেছে হিন্দ। যে-কোনো সাধারণ লোক অনেক আগেই ক্লাস্তির চরম সীমায় পৌঁছে যেতো, কিন্তু শন কোর্টনিকে ধরতে না পারায় জেনারেল চায়নার শক্তি ও উদ্বেজনা ক্রমশ যেনো বাড়ছে পর্ভুগীজ পাইলট মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে তার তাঁবুতে, চায়না নিজেহর তাঁবুর সামনে পায়চারি করছে, ভয়ানক অস্থির। ভোরেই আবার হিন্দকে চাই আমি,' মনে করিয়ে দিলো গ্রাউণ্ড এঞ্জিনিয়ারকে, এবার নিয়ে সম্ভবত বিশ বার।

তাঁবুতে ফিরে ম্যাপের সামনে দাঁড়ালো জেনারেল চায়না। জেনারেল টিপপো টিপ তাকে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছিল, শন কোর্টনি ও তার দল আঙনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। লাশ অনেকগুলোই পাওয়া গেছে, কিন্তু সেগুলোর একটাও চেনার উপায় ছিলো না। যে-কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেয়া জেনারেল চায়নার একটা নীতি ও স্বভাব। অগ্নিদগ্ধ বনভূমি ঠাণ্ডা হবার সাথে সাথে হিন্দ থেকে নিজের ট্র্যাকারদের ছাইয়ের ওপর নামিয়ে দিয়েছিল সে। আঙনের আঁচ থেকে বাঁচার জন্যে নিজের লোকজনদের বালির নিচে কবর দিয়েছিল শন কোর্টনি, সেই জায়গাটা খুঁজে পায় তারা। সেখান থেকে দলের ছাপ সোজা চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ দিকে, সব সময় দক্ষিণ দিকে।

খবর পাবার পর নিজের অ্যাসল্ট ট্রপকে নির্দেশ দিয়েছে জেনারেল চায়না, লিমপোপো নদীর কাছাকাছি নতুন পজিশনে চলে গেছে তারা। কাজেই, অস্থির হবার কিছু নেই। শন কোর্টনিকে ধরা পড়তেই হবে। আর ধরা পড়লে...আরম্ভ করা হবে মেয়েটাকে দিয়ে, অবশ্যই। টিপপো টিপ তার মনের সাধ মেটাবার পর মেয়েটাকে চায়না তুলে দেবে পুরুষ পাষাণগুলোর হাতে। এই সাদা উপহার ওদের প্রাপ্য। তারপর লাইন দিয়ে দাঁড়াবে কুৎসিতদর্শন কিছু লোক, রোগাক্রান্ত কেউ কুষ্ঠরোগী, কেউ সিফিলিসে ভুগছে। সবশেষে সুযোগ পাবে এইডস-এর জীবাণুবাহী লোকেরা। হ্যাঁ, দারুণ একটা খেলা হবে বটে। চায়না ভাবলো, আমেরিকান মেয়েটা কতোটুকু শক্তিশালী? প্রথমে শরীরটা অচল হবে, নাকি মগজটা? ও, হ্যাঁ গোটা নাটকের প্রতিটি মুহূর্ত দেখতে বাধ্য করা হবে শন কোর্টনিকে।

মেয়েটা খতম হবার পর শন কোর্টনিকে নিয়ে শুরু হবে তার খেলা। এখনো সে ঠিক করেনি কি করা হবে তাকে নিয়ে। তবে অনেকগুলো সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে তার মাথায়। লোকটা কঠিনপাত্র, আশা করা যায় কয়েকটা দিন টিকবে, এমন কি কয়েক সপ্তাও টিকে যেতে পারে।

মিটি মিটি হাসতে হাসতে ক্যানভাস চেয়ারে বসলো কমরেড চায়না। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙলো তার। চোখ মেলে চায়না দেখলো, ভোর হয়ে গেছে। ‘রেডিও আপনাকে ডাকছে, জেনারেল!’ রেনামো সৈনিক বেরিয়ে গেলো তাঁবু থেকে।

বাইরে বেরিয়ে এসে চায়না দেখলো, খুঁটির ওপর এখনো বালব জ্বলছে। তাঁবুর সামনেই টেবিল, টেবিলের ওপর রেডিওটা জ্যান্ত। ‘কনট্যাক্ট! কনট্যাক্ট। জেনারেল চায়না, ওদেরকে আমরা জ্যান্ত পেয়েছি!’ গলাটা চিনতে পারলো চায়না। লিমপোপো নদীর কাছাকাছি পাহাড়ে যাদেরকে পজিশন নিতে বলেছিল তাদেরই একজন সেকশন লিডার।

টলতে টলতে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো চায়না। মাইক্রোফোন তুললো সে। ‘রণহংকার বলছি। তোমার পজিশন ও স্ট্যাটাস জানাও।’

শন কোটনি ও তার দল সেকশন লিডারের তৈরি স্টপ লাইন-এ পৌঁছেছে, ঠিক যেখানে তাদেরকে দেখা যাবে বলে আন্দাজ করেছিল জেনারেল চায়না। সামান্য গোলাগুলি হয়েছে, ছোট্ট একটা পাহাড়ের মাথায় আশ্রয় নিয়েছে দলটা। কাছেই নদী। সবশেষে সেকশন লিডার জানালো, ‘আমি মর্টার আনতে লোক পাঠিয়েছি। পাহাড়ের মাথা থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো ওদের।’

‘নেগেটিভ’, হংকার ছাড়লো জেনারেল চায়না। ‘আই রিপিট, নেগেটিভ। মর্টার ব্যবহার করবে না। কোনো রকম হামলা করবে না। ওদেরকে আমি জীবিত ধরতে চাই। পাহাড়টা ঘিরে ফেলো। আমি আসছি।’

রেডিও বন্ধ করে হেলিকপ্টারের দিকে তাকালো কমরেড চায়না। টাইটানিয়াম এঞ্জিন হ্যাচগুলো জায়গামতো বসানো হয়েছে। ফুয়েল ভরার কাজ তদারক করছে পর্ভুগীজ এঞ্জিনিয়ার। এক লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পোর্টাররা, প্রত্যেকের মাথায় পঁচিশ লিটারের একটা করে ড্রাম। চিৎকার করে এঞ্জিনিয়ারকে ডাকলো চায়না। তারপর বললো, ‘এখুনি টেক-অফ করতে চাই আমি।’

‘আধ ঘন্টার মধ্যে রিফুয়েলিংয়ের কাজ শেষ করবো আমি।’

‘অতো সময় দেয়া যাবে না। এই মুহূর্তে হিন্দে কি পরিমাণ ফুয়েল আছে?’

‘অক্সিলারি ট্যাংক ভরাই আছে...।’

‘বাস-বাস, ওতেই চলবে। পাইলটকে ডাকুন। বলুন, এখুনি টেক-অফ করতে হবে।’

‘কিন্তু আমার একটা কাজ বাকি রয়েছে যে! টারবো ইনটেক-এর ওপর ডেব্রিস সাপ্রেসর লাগাতে হবে।’

‘সময় লাগবে কি রকম?’

‘আধ ঘন্টার বেশি নয়।’

‘দরকার নেই, অতো সময় দেয়া যাবে না!’ উত্তেজনার চিহ্নকার করছে জেনারেল চায়না। নিজের তাঁবু থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এলো পাইলট, ফ্লাইং জ্যাকেটটা পরছে, হেলমেটের ফ্ল্যাপগুলো কানের কাছে লতপত করছে। তাদের দেখে ঝেঁকিয়ে উঠলো চায়না। ‘জলদি, জলদি! স্টার্ট দিন!’

‘কিস্ত সাপ্রেসর?’ এঞ্জিনিয়ার জানতে চাইলো।

‘শুটা ছাড়াও উড়তে পারবো আমরা, তাই না?’

‘তা পারবেন, কিস্ত...।’

‘কোনো কিস্ত নয়!’ লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো জেনারেল চায়না। ‘অপেক্ষা করার সময় নেই আমার।’ হিন্দে চড়ার জন্যে ঘুরলো সে।

\* \* \*

চড়া থেকে সামান্য নিচে, দুটো বড় আকারের পাথরের মাঝখানে উপড় হয়ে শুয়ে রয়েছে শন, মোপানি জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে দূরে। ওটা দক্ষিণ দিক, ঘাড় সবুজ লেখাটা অনিশ্চিত আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। সবুজ রেখা, একসারিতে অনেকগুলো গাছ। লিমপোপো নদীর চিহ্ন। ‘এতো কাছে’, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো শন। ‘প্রায় পৌছেই গিয়েছিলাম!’

প্রাণ নিয়ে এতো দূরে পালিয়ে এসেছে, এই তো বেশি। অনেক আগেই তো মরে ভূত হয়ে যাবার কথা ছিলো ওদের। প্রায় তিনশো মাইল হেঁটে এসেছে ওরা। সারাক্ষণ তাড়া খেয়েছে। গোটা এলাকাই তো ছিলো রণক্ষেত্র। পালিয়ে এলো ঠিকই, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। একেই বোধহয় বলে, তীরে এসে তরী ডোবা!

পাহাড়ের ঢাল থেকে এ/কে রাইফেলের গুলি হলো।

কয়েকটা পাথরের আড়ালে, কাছাকাছি, শুয়ে রয়েছে মাতাউ। এখনো নিজেকে তিরস্কার করছে সে। ‘আমি বুড়ো হয়ে গেছি, বাওয়ানা। আমাকে এবার আপনার বাদ দেয়া উচিত। অল্প বয়েসী একজনকে বেছে নিন, আমার মতো যে অন্ধ নয়, বয়েসের ভারে নুয়ে পড়েনি!’

শনের ধারণা, পাহাড়শ্রেণীর মাঝখানে খোলা কোনো মাঠ পেরুবার সময় রেনামো অবজারভেশন পোস্ট দেখে ফেলে ওদেরকে। না, টের পায়নি ওরা। শত্রুরা ওদের পিছুও নেয়নি। এমনকি কোনো ফাঁদও পাতেনি। বিনা নোটিসে মোপানি ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে রেনামোরা, রণহংকার ছাড়তে ছাড়তে।

ওরা শুধু বাচ্চাগুলোকে ছোঁ দিয়ে তুলে নেয়ার সময় পেলো। কাছাকাছি কোনো আড়াল ছিলো না, বাধ্য হয়ে ঢাল বেয়ে উঠে আসতে হয়েছে পাহাড়টায়। ঢাল বেয়ে ওঠার সময় রেনামোরা গুলি করলো বটে, কিন্তু একটাও ওদের কাছাকাছি এলো না। কারণটা আন্দাজ করতে পারে শন — জেনারেল চায়নার নির্দেশ, ওদেরকে জ্যান্ত ধরতে হবে।

শন ভাবলো, এই মুহূর্তে কি করছে চায়না? কোথায় রয়েছে সে? কাছাকাছি কোথাও থাকার কথা তার, হিন্দ নিয়ে পৌছে যাবে যে-কোনো মুহূর্তে। লিমপোপো নদীর দিকে আবার তাকালো শন। হতাশায় দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। এতো কাছে অখচ কতো দূরে।

‘আলফনসো’, ডাকলো শন। ‘রৈডিওটা খোলো।’ জেনারেল ডে লা রেই-এর সাথে যোগাযোগ ঘটার কোনো আশা নেই, এ শুধু কিছু একটা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা। কাল রাতে দু’বার কুডু স্টেশনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে ও। একবার অস্পষ্টভাবে শুনতেও পেয়েছে, ‘কুডু স্টেশন কলিং মোসি।’ কিন্তু ব্যাটারি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, তারপর আর কিছুই শুনতে পায়নি।

‘এরিয়াল তোলায় চেষ্টা করলে রেনামোরা আমার বিচি উড়িয়ে দেবে’, পাথরের আড়াল থেকে গম্ভীর সুরে বললো আলফনসো।

ক্রল করে আলফনসোর পাশে চলে এলো শন। রেডিওটা টেনে নিলো নিজের দিকে। এরিয়োল লম্বা করে চাপ দিলো নবে। কুডু স্টেশন, দিস ইজ মোসি। কুডু স্টেশন, দিস ইজ মোসি কলিং! থামছে না শন, বারবার ডাকছে। ‘কুডু স্টেশন, ডু ইউ হিয়ার মি? দিস ইজ মোসি!’

মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বুলেট ছুটে গেলো।

ক্লডিয়া ও মিরিয়াম, বাচ্চাদের কোলো নিয়ে, তাকিয়ে আছে শনের দিকে।

‘কুডু, দিস ইজ মোসি।’

এবং তারপর, অবিশ্বাস্য হলেও, অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলো শন, ‘মোসি, দিস ইজ ওউবাস!’

‘ওউবাস, ওহ্ গড!’ ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো শন। ‘ওউবাস, দিস ইজ মোসি।’ ওউবাস জেনারেল ডে লা রেই-এর কোড নেম।

‘আমরা এখানে মারা যাচ্ছি। সব মিলিয়ে সাতজন-পাঁচজন বড়, দু’জন বাচ্চা। আমাদের পজিশন...’, ম্যাপে চোখ রেখে পজিশন জানালো শন। ‘নিমপোপো নদী থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার উত্তরে একটা পাহাড়ের মাথায় আটকা পড়েছি। চারদিকে রেনামো। ডু ইউ হিয়ার মি, ওউবাস?’

‘শুনতে পারছি, মোসি। তোমার দাদীর প্রথম নাম কি, বলো?’

‘ওহ্!’ বুঝতে পারলো শন। লোথার ওর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছে। ‘আমার দাদীর নাম ছিলো সেনটেইন দি থাইরি; আর তিনি তোমারও দাদী ছিলেন-লোথার, ব্যাটা উল্লুক!’

‘ঠিক আছে, মোসি। আমি একটা পুমা হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছি। এক ঘন্টা ধরে রাখো।’

ব্যাটারি প্রায় শেষ, কোনো জবাব এলো না।

বারবার ডাকলো শন, ‘ওউবাস, ডু ইউ হিয়ার মি?’

কোনো সাড়া নেই। তারপর, শনের মনে হলো, ডে লা রেই কথা বলছেন। এতো অস্পষ্ট, কথাগুলো বোঝা গেলো না। আবার সাড়া পাবার চেষ্টা করলো শন, কিন্তু বৃথাই।

রেডিও বন্ধ করে দিলো ও, কডিয়ার দিকে ফিরে স্নান হেসে বললো, ‘ওরা আমাদের নিতে আসছে। যে-কোনো মুহূর্তে পৌছে যাবে একটা পুমা হেলিকপ্টার।’

ধীরে ধীরে শনের মুখ থেকে মিলিয়ে গেলো হাসিটা। ও একা নয়, সবাই ওরা উত্তর দিকে তাকালো। শব্দটা চিনতে ভুল হয়নি কারো। এখনো অনেক দূরে, আবছামতো শুনতে পেলো ওরা। ওদের মৃত্যু শব্দ।

\* \* \*



‘যা বলছে করো’, আলফনসোকে নির্দেশ দিলো শন। ওর কথায় কান না দিয়ে রাইফেল নতুন ম্যাগাজিন ভরছে আলফনসো।

‘কি বললাম তোমাকে? রাইফেল ফেলে দাও! আমার একটা প্ল্যান আছে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।’

তবু ইতস্তত করছে আলফনসো। হঠাৎ গর্জে উঠলো হিন্দের গাটলিং-ক্যানন। পাহাড়চূড়ার একটা পাথুরে অংশ চোখের পলকে ধুলোর পরিণত হলো, ধোয়ান ঢাকা পড়ে গেলো ওরা সবাই।

‘ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে রাজি নই আমি, কর্নেল কোটনি’, গমগম করে উঠলো জেনারেল চায়নার গলা। ‘আপনার লোকদের মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াতে বলুন।’

‘যা বলছে করো!’ আবার নির্দেশ দিলো শন। প্রথমে মাতাউ, তারপর আলফনসো, ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়ালো।

‘এক পাক করে ঘুরতে বলুন সবাইকে। নিশ্চিত হতে চাই, ওদের সাথে আমাকে বিস্মিত করার কোনো উপকরণ নেই।’

তার নির্দেশ পালন করলো মাতাউ ও আলফনসো।

‘এবার পরনের কাপড় খুলে ফেলো, তোমরা সবাই।’

ধীরে ধীরে কাপড় খুললো মাতাউ ও আলফনসো। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো।

‘ঠিক আছে। এবার খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসো, চাল বেয়ে খানিকটা নিচে নামো।’

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, চাল বেয়ে খানিকটা নিচে নেমে থামলো।

‘এবার মেয়েরা!’

‘সাহস হারিয়ে না’, ক্রুডিয়ার কানে কানে ফিসফিস করলো শন। ‘এখনো আমাদের সুযোগ আছে।’

ধীরে ধীরে দাঁড়ালো কডিয়া।

‘মিস মনটেরো’, জেনারেল চায়নার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর নিচের বনভূমি থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো। ‘আপনার পরনের কাপড়গুলো খুলবেন কি, গ্লীজ?’

‘খোলো, ইতস্তত করো না’, নির্দেশ দিলো শন।

ছেঁড়া শার্টের বোতাম খুললো কডিয়া। এলোমেলো চুলের ওপর দিয়ে শার্টটা তুলে আনলো সে। সকালের রোদে সাদা দেখালো তার স্তন জোড়া।

‘এবার ট্রাউজার।’

চেইন টেনে ট্রাউজার খুললো কডিয়া, পায়ের ওপর জড়ো হলো সেটা, লাখি মেরে সরিয়ে দিলো।

‘বাহ, ভারি সুন্দর। এবার বাকি কাপড়!’



শন, তারপর পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকা করে হেনেডটা ছুঁড়ে দিলো ওপর দিকে। ঠিক সেই সময় ওর দিকে ফিরলো জেনারেল চায়না।

ইনটেক-এর কিনারায় লাগলো হেনেড। বাড়ি খেলো। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, গর্তের ভেতর না ঢুকে নিচে খসে পড়তে যাচ্ছে। সাহায্য করলো ঘুরন্ত রোটর ব্লেডের তৈরি বাতাস, স্যাঁৎ করে টেনে নিলো ওটাকে। পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো হেনেড।

এক নিমেষে হিন্দের এঞ্জিন টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। প্রচণ্ড একটা ঝাঁক দিয়ে উল্টে গেলো সেটা। ধোঁয়ার সাথে ইস্পাতের টুকরো বৃষ্টির মতো পড়তে লাগলো চারদিকে।

পাহাড়ের ঢালে পড়লো গানশিপ। রেনামোরা উঠে আসছিল, ডিগবাজি খেতে খেতে তাদেরকে নিয়ে নিচে নেমে গেলো। জঙ্গল থেকে যারা বেরিয়ে আসছিল, ছুটলো তার দিগ্বিদিক।

জঙ্গলের কিনারায় স্থির হলো হেলিকপ্টার। স্বচ্ছ ফুয়েল ঝর্ণার মতো বেরিয়ে আসছে মেইন ট্যাংক থেকে। উইপনস ককপিটের বৃদ্ধবৃদ্ধ ডিমের খোসার মতো খুলে গেলো, বাইরে উঁকি দিলো জেনারেল চায়নার প্রকাণ্ড মুখ। লাফ দিয়ে ককপিট থেকে জঙ্গলে নামলো সে, বৃষ্টি মতো ফুয়েল পড়লো তার সারা গায়ে, ভিজে গেলো কাপড়চোপড়।

জঙ্গলের ভেতর দশ কদমও এগোয়নি কমরেড চায়না, আশুন ধরে গেলো হিন্দে। লাফ দিয়ে মাঝখানের ফাঁকটা পেরুলো আশুন, দপ করে জ্বলে উঠলো জেনারেল। ঠিক যেনো একটা মশাল।

একটা ঝোপের সামনে পড়লো চায়না। পাহাড়ের মাথা থেকেও তার আতর্নাদ শুনতে পেলো ওরা। অনেকক্ষণ ধরে জ্বললো মশালটা। তারপর ধীরে ধীরে নিভে গেলো আশুন। কালো একটা বস্তুর মতো পড়ে থাকলো লাশটা কয়লা বললেই হয়।

‘পিছিয়ে যাও!’ চিৎকার করে নির্দেশ দেয় শন। ক্রুডিয়াকে টেনে তুলে, মিনিকে কোলে নিয়ে ছুটলো ও।

ছোট্ট পাহাড়ের সাড়ির আড়ালে লুকিয়েছে ওরা, এই সময় বিশ্ব্যাত রেনামো কপ্টার যেনো মরণ কান্না জুড়ে দিলো। ওটার দক্ষ দেহ থেকে ছিটকে আসতে লাগলো তরল আশুন।

ক্রুডিয়ার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে শন। আরেক হাতে ধরেছে মিনিকে। বাতাস দিক বদলাতে নতুন একটা শব্দ ঢুকলো ওদের কানে। ঘাড় ফেরালো ওরা। দক্ষিণ থেকে, লিমপোপো নদীর দিক থেকে আসছে আওয়াজটা। দূর আকাশের গায়ে পুমা হেলিকপ্টারটা এখনো ছোট্ট একটা বিন্দুর মতো। এঞ্জিনের শব্দ ধীরে ধীরে বাড়ছে।

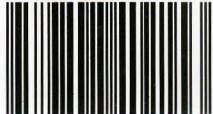
‘এইবেলা কাপড় পরে নাও, প্রিয়,’ ক্রুডিয়াকে একটু কাছে টেনে নেয় শন। ‘দেখে মনে হচ্ছে পুরো এক বাহিনী সৈন্য নামতে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই!’

(শেষ)

শন কোর্টনি- অকুতভয় শিকারী, আফ্রিকা মহাদেশের মতোই দুরন্ত, বন্য, অসম সাহসী এক যুবা যার রক্তে বইছে অভিযান আর শিকারের অদম্য স্পৃহা। তার সঙ্গী কর্নেল রিকার্ডো মনটেরো বিশাল ধনকুবের, জীবনে কতো টাকা কামিয়েছেন- তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এবারে সবচেয়ে বড়ো ট্রফি চাই তার- আফ্রিকার কিংবদন্তি হাতির দাঁত। রিকার্ডো জানেন, ক্যাসারে মরার আগে এই তার শেষ শিকার। জানে তার মেয়ে অপরাধী ক্লডিয়াও। জানে না শুধু শন। আরো জানে না, প্রবল প্রকৃতি আর হিংস্র শত্রুর বিরুদ্ধে কেমন করে লড়ে জিতবে ও।

এ খেলায় হার মানেই মরণ। বিশ্বখ্যাত ঔপন্যাসিক উইলবার স্মিথের অমর সৃষ্টি, শিকারী শন কোর্টনি আপনাকে নিয়ে যাবে আফ্রিকার গহীন বনে, যেখানে একটা আইনই চলে- মারো, অথবা মরো!

ISBN: 989-70112-0041-5



High Quality Aohor Arsalan Scan



scan with  
canon



Aohor Arsalan

ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY  
LATEST, RARE & TOP COLLECTION

Visit Us Now

[WWW.BANGLAPDF.NET](http://WWW.BANGLAPDF.NET)